পাণ্ডু পাণ্ডু • নারায়ণ সান্যাল

পরিণতি

পাষণ্ড-পণ্ডিত

পরশুরাম

সমকাল প্রকাশনী
১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলি-৬

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৬১

প্রকাশক :

প্রসূন কুমার বসু

সমকাল প্রকাশনী

১এ, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট

কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদপট :

অলোকশংকর মৈত্র

মুদ্রাকর :

মানসী প্রেস

৭৩ মানিকতলা স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০০০৬

খুকু আপন মনে খেলা করছিল।

পরিবেশটা খেলার উপযোগী মোটেই নয়। না স্থান, না কাল—কিন্তু পাত্র যে নাছোড়বান্দা। তার খেলারই বয়স। কেওড়াতলার শ্মশানঘাটে আদিগঙ্গার ঘাটে পাষাণ রানার উপর বসে পোড়া একটা কাঠ-কয়লা দিয়ে খুকু আপন মনে ভুতুমামার ছবি আঁকবার চেষ্টা করছে। মাথার ধূসর চুলগুলোয় চিরুনি পড়েনি বেশ কিছুদিন—রুক্ষ চুলগুলো জটা পাকিয়ে উঠেছে। জুতোমোজার বালাই নেই, এমনকি পরনের ফ্রকটাও রীতিমত ময়লা। দু' হাতে দু' গাছি কাঁচের চুড়ি। পোড়া কাঠ-কয়লার টুকরো দিয়ে সিঁড়ির ধাপে ছবি আঁকবার অবকাশে টেরিয়ে টেরিয়ে দেখছিল কাতুদিদির দিকে, শুনছিল তার ইনিয়ে-বিনিয়ে কান্না। খুকু বুঝতে পারে না, এমন করে কেন কাঁদছে কাতুদিদি। দু-একবার বুড়ির আঁচলটা টেনে তার পিচুটি-পড়া চোখ দুটো মুছিয়ে দিয়ে বলছিল: ছি! কাঁদে না, লক্ষ্মী মেয়ে, চুপ কর, লজেঞ্জুষ দেব।

কাত্যায়নী কর্ণপাত করে না। গলা ছেড়ে সে আর কাঁদছে না, সুর টেনে টেনে অনর্গল বক্‌বক্‌ করে চলেছে। কান্নার ভাষা না গানের ভাষা সহজে ঠাওর হয় না। আর এই শ্মশানপাড়ার মানুষ এতে এতই অভ্যস্ত যে, কান করে কেউ শোনেই না তার বাক্যবিন্যাস। কাতুবুড়ির কান্নার মূল ধুয়োটা হচ্ছে: ওরে তুই আজ কী হারালি, তা যে জানতেও পারলি না!

তা ঠিক। খুকুর বয়স পাঁচ। মৃত্যুকে সে চেনে না, জানে না। এখানে যে বিয়োগান্ত নাটকটা অভিনীত হচ্ছে তার প্রতি কোন আগ্রহ নেই খুকুর। তাকে এই কাতুবুড়ির জিম্বায় বসিয়ে রেখে বাবা কোথায় গেছে, এটুকুই সে জানে।

কাতুবুড়ির গা ঘেঁষে শুয়েছিল একটা লেড়ি কুকুর। বুড়ি চোখে ভাল দেখে না। সে টের পায়নি। না হলে এমন ঘনিয়ে এসে শোওয়ার বাসনা সে ঘুচিয়ে দিত ঐ লেড়ি কুত্তার।

ওপাশে লাল চেলি-পরা সিঁদুরের ফোঁটা কাটা এক সন্ন্যাসী বসে আছেন উদাস দৃষ্টি মেলে। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, পাশে একটা পুঁটুলি আর কমণ্ডলু। মাঝে মাঝে গগনবিদারী হাঁক পাড়ছেন: তারা, ব্রহ্মময়ী, মাগো!

কাতুবুড়ির কান্নার গান থমকে থেমে যাচ্ছে সে আর্তনাদে। অবশ্য ক্ষণিক বিরতি। পরক্ষণেই সে শুরু করছে: ওরে, মা যে পিরথিবির সবচে

দুর্লভ ধন। ওরে, এতটুকু মেয়েকে ফেলে কেমন করে তুই সগ্‌গে চলে গেলি গো। ওরে তোর তিনকাল গে এককালে ঠেকেছে, তুই এমন সর্বনাশ কেন করলি।

একজন প্রৌঢ়া অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছিল কাতুবুড়িকে। তার কান্নার পারম্পর্য সে বুঝে উঠতে পারছিল না। বুড়ি যে কাকে সম্বোধন করে কোন কথাটা বলেছে তা বোঝা যায় না। এবার সাহস করে এগিয়ে এসে বলে, তোমার বউ, না বেটি?

কাতুবুড়ি কান্না থামিয়ে আঁচল দিয়ে মুখটা মোছে। ঘোলা দুটি চোখ তুলে আগন্তুকাকে একনজর দেখে নেয়, তারপর বলে, আমার কেউ নয়।

প্রৌঢ়া প্রায় ধমকে ওঠে, কেউ নয় তাহলে অমন ভেবড়ি ছেড়ে কাঁদছ কেন গা?

কাতুবুড়িও উল্টে ধমক লাগায়, কাঁদবনি? তুমি বলছ কি গো ভাল-মানুষের মেয়ে! এই একরত্তি মেয়েটাকে ফেলে তুই যে এমন ড্যাংডেঙিয়ে সগ্‌গে চলে গেলি, এখন এটাকে দেখে কে?

প্রৌঢ়া পাঁচ বছরের খুকুর দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে বলে, এর মা?

—না তো বলছি কি গো? লক্ষ্মীর পিতিমে গো, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর পিতিমে। এই কি তোর সগ্‌গে যাবার বয়েস?

প্রৌঢ়া অবাক হয়ে বলেঃ এই যে বলছিলে তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে।

কাতু খেঁকিয়ে ওঠেঃ আমি কী বলি আর তুমি কী শোন। তার কথা বলব কেন? বলছি এর বাপের কথা। বুড়ো বয়সে পোড়ারমুখো মিন্‌সের ভীমরথি হল—কী বিত্তান্ত? না, বংশ রক্ষা করতে হবে। কেন? বয়েসকালে সে কথা খেয়াল ছেলনি? নাও। এখন বংশ ধুয়ে জল খাও।

—আর ছেলেপুলে নেই?

—হবে কোত্থেকে? হবার কি সময় ছেল? মাত্তর সাত বছর তো বে হয়েছে। এই একটি মাত্তর পিদিম্ টিম্‌টিম্ করছে;—এখন তুই কেমন করে পিদিম্ জ্বালিয়ে রাখিস্ দেখব আমি।

—কী করে ওর বাপ?

—করবে আবার কী, চেতলার ওদিকে কোন ধ্যাড়ধ্যাড়ে ইস্কুলের থার্ড পণ্ডিতগিরি। কিন্তু মেজাজ যেন ভাটপাড়ার মওপাধ্যায়। চোপার চোটে কেউ তিসীমানায় ভেড়ে না। ঠোঁটকাটা মিন্‌সের স্যাঙাৎ জুটল না গা এ্যাদ্দিনেও। জুটবে কোত্থেকে? দুনিয়াভোর মানুষের ভুল ধরে বেড়ানোই যে কাজ। ওরে আমার নিব্‌ভুল বেদব্যাসরে! পাষণ্ড! পাষণ্ড! মহা-পাষণ্ড!

প্রৌঢ়ার বোধ করি নিজের তাড়া ছিল; অথবা কৌতূহল অবশিষ্ট ছিল না

তার। গঙ্গার দিকে উদ্দেশ্যে এবার যুক্তকর মাথায় ঠেকিয়ে সে নিজের পথ ধরে। তবে যাবার সময় ছোট্ট একটি মন্তব্যও করে যায়, বলে : মরণ!

তা মরণ নিয়েই তো শ্মশানের কারবার। জীবনকে এখানে পৌঁছে কে? ঐ বুঝি আবার একদল এল মরণের জয়বার্তা ঘোষণা করতে করতে :

—বল হরি, হরিবোল!

কাতুবুড়ি হাত দুটো কপালে ঠেকায়।

শান্ত সন্ন্যাসী আর একবার চীৎকার করে ওঠেন : তারা, ব্রহ্মময়ী মাগো!

কুকুরটার গায়ে বোধহয় কার পা পড়েছে, ক্যাঁক করে ওঠে সেটা।

পিছনে শ্মশানের উঁচু পাঁচিলের ওপার থেকে একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠল। খুকি কাঠ-কয়লাখানা ফেলে দিয়ে সেটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। এবার কাতুবুড়ির কাছে ঘনিয়ে এসে বলে, এত ধোঁ কেন রে দিদি?

কাতুবুড়ি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে। ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠে তার।

একজন ক্যামেরাওয়ালা, বোধ করি শ্মশানের ফটোগ্রাফার, কাতুবুড়িকে প্রশ্ন করে : ফটো তোলাবেন না মা? একখানা শেষ ফটো!

কাতুবুড়ি মাৎ মাৎ করে ওঠে। লোকটা পালাবার পথ পায় না।

ওপাশ থেকে শ্মশান-যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসেন প্রশান্ত ভট্টাচার্য। চেতলার ওদিকে কোন এক স্কুলের থার্ড পণ্ডিত। বয়স পঞ্চাশের নিচে হলেও খুব নিচে নয়। রুক্ষ চুল, রুক্ষ বাস, বাজে-পোড়া তালগাছের মত চেহারা। দীর্ঘদেহ, অল্প একটু ঝুঁকে চলেন সামনে। গালে-মুখে সাতদিনের না-কামানো দাড়ি—সাদায় কালোয়। চুলগুলো কদমফুলের মত খোঁচা খোঁচা, মাথার সামনে ও পিছনে এক মাপের। সেই সাম্যবাদী মস্তকের পিছন দিকে একচ্ছত্র নায়কের মত একটি দীর্ঘ অর্কফলা, তার প্রান্তে একটি রক্তকরবীর ফুল। চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যেন ঐ অর্কফলাটুকুতেই এসে গেমেছে। উর্ধ্বাঙ্গ নিরাবরণ, আজানুলম্বিত সামবেদী উপবীতে একটি চাবি বাঁধা। খালি পা, ধুলো কাদায় মাখামাখি। কাপড়টা হাঁটুর অল্প একটু নিচে—কাছার কাছে অনেকটা ছিঁড়েও গেছে। মুখ-চোখ বসে গেছে বেচারির।

শ্মশান-যাত্রীদের মুখপাত্র ছোকরাটি আসছিল পাশে পাশে। চোঙদার একটা কালো প্যাণ্ট। উর্ধ্বাঙ্গে হাতকাটা গেঞ্জি। মাথার চুলগুলো পাখির বাসার মত। গলায় একখানা লাল গামছা টাইয়ের মত বাঁধা। মুখে বসন্তের দাগ। দাঁতগুলো ছোপধরা। বিনীতভাবে গলাটাকে যথাসম্ভব নরম করে বললে, পণ্ডিতমসাই, শ্মশানে এসে একেবারে সুধু মুখে থাকতে নেই, গোটা পাঁচেক্ টাকা দিন; মিষ্টি কিনে আনি।

প্রশান্ত পণ্ডিত থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। কী যেন ভাবেন; তারপর বলেন : আমি কিছু খাব না বাবা সকল, তোমরা খেতে চাও, যাও খেয়ে এস। পাঁচ টাকা আমার সামর্থ্যের অতিরিক্ত; এই লও, দুইটা টাকা দিচ্ছি।

কাছার খুঁট থেকে খুলে দুটি এক টাকার নোট মেলে ধরেন।

—দু ট্যাকা তো লাস্য পণ্ডিতমসাই, আমরা ছ-ছটি কেস্‌টের জীব!

—আমাকে মার্জনা করতে হবে বাবা সকল। আর একটি টাকা অবশিষ্ট আছে আমার কাছে। আমার কন্যাটির জন্য রাত্রে কিছু আহার্য—

বাধা দিয়ে ছেলেটি বলে ওঠে: বেস, বেস, তাহলে ঐ একটা ট্যাকাই ছাড়ুন। তিন ট্যাকা না হলে ছ-ছটি কেস্‌টের জীবের যে গলাটাই ভিজবে না।

—গলা ভিজবে না! কী বলছ তোমরা? এই যে বললে, মিষ্টিমুখ করবে?

ওপাশ থেকে আর একটি ছেলে এবার এগিয়ে আসে, বলে, পণ্ডিতমসাই, এসব ব্যাপার নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না। তিনটে ট্যাকা ছাড়বেন বলছেন, তাই ছাড়ুন বরং। ভদ্দরলোকের এক কথা। সীতে হাত-পা কালিয়ে গেল মসাই, গা গতর সব টনটন করছে, টাকা দিন মালের জোগাড় দেখি—

—মাল! কী বলছ তোমরা? ভাষার একটা শ্রী থাকবে তো!

এবার আর বোধকরি ভদ্রতা রক্ষা করা সম্ভবপর হয় না। ছেলেটি মুখভঙ্গি করে বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ সার, মাল! খাঁটি দেসি মাল। বোতলে ভর্তি করে বেচে, দেখেননি? আপনি বৈষ্ণব মানুস্‌ কিনা তাই তেনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় নেই। সাক্তরা একে বলেন কারণবারি! তবে আপনি পণ্ডিত মানুস্‌, সোমরস কথাটা সুনে থাকবেন! সসানে এসে—

পণ্ডিত অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেন: বার বার 'সসান সসান' বলছ কেন? 'শ্মশান' বলতে পার না? তালব্য শ'য় ম'য় উচ্চারণ করতে পার না?

এরপর ছেলেটি নিজমূর্তি ধরে, সাধ করে স্লাকে সবাই পাসণ্ড পণ্ডিত বলে—

তাকে থামিয়ে দিয়ে এগিয়ে আসে প্রথম মস্তান, বলে: আবে চুপ যা স্লা!...

পণ্ডিতের দিকে ফিরে হাত দুটি জোড় করে অতি বিনয়ের সঙ্গে বলে, ঠাকুরমসাই, ও সালার কথা কানে তুলবেন না। হারামজাদা আমার সঙ্গে মাসে বিসদিন সসানে আসে তবু 'সসান' কথাটা উচ্চারণ করতে পারে না। সুপুরি খেয়ে খেয়ে সালার জিব্‌ভাটার ও-কম্মো হয়ে গেছে! দিন স্যর, যা বলেছেন তাই দিন। তিনটে ট্যাকাই ছাড়ুন।

প্রশ্রান্ত পণ্ডিতেরও বোধহয় সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হয়েছিল। শেষ এক টাকার নোটখানাও ওর প্রসারিত করে সমর্পণ করে ঘুরে দাঁড়ান।

কাতুদিদির কোলের মধ্যে খুকু এতক্ষণ চুপ করে শুয়ে পড়েছে।

ঘেয়ো কুকুরটা উঠে গেছে ওখান থেকে। আর তিনটে কুকুরের সঙ্গে শ্মশানের প্রান্তে তার ঝগড়া বেধেছে। তীব্র তীক্ষ্ণ সারমেয় শীৎকারে শ্মশান-

প্রাঙ্গণ সচকিত হয়ে উঠেছে। কাতুদিদি একটা দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে বসেছে। কান্নার উৎসও বোধকরি শেষ হয়ে গেছে তার। পাড়ার লোক সে, পণ্ডিতের পাশের ঘরে থাকে। একই বস্তিতে। নেহাত বুড়ো প্রশান্ত পণ্ডিতের কচি বৌটাকে ভালবাসত, আর ঐ একরত্তি মেয়েটা ওর ন্যাওটা হয়ে উঠেছিল, তাই এই ভোগান্তি। বাতে পঙ্গু তিনভাঙা দেহটাকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে এই কেওড়াতলা শ্মশানঘাট পর্যন্ত এসেছে। অমন সোনার প্রতিমা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে অথচ তার জন্য কেউ এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবে না, এ অঘটন কাতুবুড়ির বোধকরি বরদাস্ত হচ্ছিল না। হোক না কেন এয়োস্ত্রী মানুষ,—স্বামীর পায়ে মাথা রেখে, একমাথা সিঁদুর পরে, আলতা পায়ে এমন ড্যাং-ডোঙিয়ে স্বর্গে যাওয়া হোক না কেন ভাগ্যের কথা—তবু মরেও কোন মানুষ শান্তি পায় না, যদি না সে চিতায় পুড়তে পুড়তে দেখতে পায় তার জন্য এই ফেলে-যাওয়া দুনিয়ায় কেউ চোখের জল ফেলছে। ঐ দু-ফোঁটা চোখের জলই যে তার শেষপাড়ানির কড়ি গো। যুক্তিটা কাতুবুড়ির এই রকম। তা এ হতভাগীর জন্য কাঁদবে কে বল? তিনকুলে তার কে আছে যে কাঁদবে? বাপ নেই, মা নেই, বোন নেই—থাকার মধ্যে ভাই আর ভাজ। তারা তো কোনদিন উঁকি মেরেও দেখল না, বোনটা মরল না বাঁচল। আর থাকার মধ্যে আছে ঐ বাজে-পোড়া তালগাছের মত এক সোয়ামী! কাঠ-পাষাণ। তার চোখে তো কেউ কোনদিন জল ঝরতে দেখেনি। বউ মরছে আর জলজ্যান্ত মানুষটা অং বং করে মন্তর পড়ছে। বানিয়ে বলছে না, এ একেবারে কাতুবুড়ি নিজের চোখে দেখেছে। পেত্যয় না হয়, বল, কাতুবুড়ি ঐ গঙ্গার দিকে মুখ করে স্বীকার যাবে। আর কে কাঁদবে? হ্যাঁ কাঁদে, পেটের মেয়েও কাঁদে—তার যে নাড়ির টান! দশ মাস যে সে বাস করে এসেছে ঐ সোনার অঙ্গে, যা আজ পুড়ে ছাই হয়ে গেল; কিন্তু কী করবে বল—ও যে দুধের বাছা! ও কি ছাই বুঝতে পারল, কত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল তার? তাই কাতুবুড়ি এসেছিল সঙ্গে। পিসি পিসি করে মেয়েটা দ্যাখ-না-দ্যাখ ছুটে আসত। ও পিসি, একটু আমসত্ত্ব এনেছি চেখে দেখ, ও পিসি, তোমার ভাইপো আজ বাজার থেকে একটা পাকা পেঁপে এনেছিলেন, এই রেখে গেলাম দু-টুকরো, মুখে দিও! আহা, সেই সোনার পিতিমে আজ শেষ হয়ে গেল! তাই তার এত কান্না! নাতনি কোলে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বুড়ির এতক্ষণে একটু ঝিমুনি এসেছে। দেওয়ালটায় ঠেস্ দিয়ে ঝিমাচ্ছে সে। মুখটা হাঁ হয়ে গেছে।

প্রশান্ত পণ্ডিত উদাস দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিলেন শ্মশানের ঐ বেলগাছটার দিকে। জীবন-মৃত্যুর অজ্ঞাত রহস্যের কথাই চিন্তা করছিলেন হয়তো। শ্মশান-বন্ধুর দলের সকলেই ওঁর অপরিচিত। এটা ওদের ব্যবসা। খবর পেয়ে দাহ করতে এসেছে। মালের সন্ধানে তারা অনেকক্ষণ চলে গেছে। কুকুরগুলোও ঝগড়া-বিবাদ থামিয়েছে। একটা নৈঃশব্দ ঘনিয়ে এসেছে হঠাৎ। বেলগাছের

মগডাল থেকে পণ্ডিতের দৃষ্টি নেমে আসে শ্মশানের উঁচু পাঁচিলটার উপর। চুনকাম করা প্রাচীরে কালো কয়লায় লেখা অসংখ্য স্বাক্ষর। নাম, নাম আর নাম ; আর ঠিকানা। কেউ কেউ দু-এক লাইন পদ্যও লিখেছে। বিষয় শ্মশানবৈরাগ্য। এ মহাশ্মশানে যুগ যুগ ধরে যত মানুষ এসেছে তারা যেন স্বাক্ষর রেখে গেছে ওখানে। হঠাৎ নাসারন্ধ্র কুঞ্চিত হয়ে ওঠে পণ্ডিতের। প্রাচীরের ওপর একটি লেখায় দৃষ্টি আটকে যায় তাঁর—'চীরঞ্জীব সরকার, বাঞ্ছারাম অক্রুর দত্ত লেন।'

পণ্ডিত নিচু হয়ে কুড়িয়ে নেন এক খণ্ড কাঠকয়লা। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে 'চী'-টাকে কেটে লেখেন 'চি'।

পাঁচিলের ওপার থেকে এবার এগিয়ে আসেন একজন শ্মশানপুরোহিত। গায়ে নামাবলী, তাঁরও অর্কফলায় বাঁধা একটি রক্তকরবী। বলেন, ও কি করছেন ন্যায়রত্নমশাই, বুড়ো বয়সে শেষকালে আপনিও দেওয়ালে নাম লিখছেন ?

একটু লজ্জা পেলেন প্রশান্ত পণ্ডিত। কুণ্ঠিত হয়ে বলেন, না, না নিজের নাম লিখছি না। একটা অনড়বান, নিজের নামের বানানটা পর্যন্ত জানে না। বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করে দিচ্ছিলাম মাত্র। পিতামাতায় নামকরণ করেছিলেন 'চিরঞ্জীব'—তবু শ্মশানে এসে সে চিরজীবী হয়ে থাকতে চায়। আর দুর্ভাগ্য দেখুন, নিজ নামের বানানটা সে গর্দভ লিখেছে 'চীরঞ্জীব'। চীর মানে তো জানেনই, ছিন্নবস্ত্র।

পুরোহিতমশাই একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন প্রশান্ত পণ্ডিতের দিকে। কে বলবে, এঁর সদ্য স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে। আর সেই স্ত্রীর চিতাটা এখনও জল ঢেলে নিবিয়ে দেওয়া হয়নি। পুরোহিত অবশ্য পণ্ডিতকে চিনতেন। কথা না বাড়িয়ে বলেন, যাক ওসব, আসুন, শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান এখনও কিছু বাকি আছে।

—চলুন !

ঃ বলহরি ! হরিবোল !

আবার একটা এল বোধহয়।

চিতাভস্মের ভিতর থেকে অস্থির অন্তিম অংশ নাভিকুণ্ডলীটুকু দুটি কাঠের সাহায্যে তুলে নিয়ে পুরোহিতের সঙ্গে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসেন জলের কাছে। সব ক'টি ধাপ অতিক্রম করে এসে দাঁড়ান এক কোমর জলে, পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করতে থাকেন। অস্থি বিসর্জনের শেষ মন্ত্র।

মনটা একাগ্র করে প্রশান্ত পণ্ডিত স্ত্রীর শেষ দেহাবশেষ গঙ্গায় বিসর্জন দেবার জন্য প্রস্তুত হন। ধর্মসঙ্গিনীর প্রতি শেষ ধর্মাচরণ। মাত্র সাত বছর সে এসেছিল পণ্ডিতের ঐ অভাবের সংসারে। শাঁখা পরা দুটি হাতে সে ঐ পণ্ডিতের মরু জীবনের মাঝখানে গড়ে তুলেছিল এক মরুদ্যান। নিরলস সেবায়

আন্তরিক ভালবাসায় সে পাষাণের মাঝখানে টেনে এনেছিল এক পার্বত্য স্রোতস্বিনীকে। ন্যায়রত্নের জীবনদর্শনেই আনতে শুরু করেছিল এক বিচিত্র পরিবর্তন। কিন্তু তার আরব্ধ সাধনা সমাপ্ত হল না। অকালেই সে চলে গেল। পণ্ডিত মনে মনে বললেন—এই পর্যন্তই তোমার হাত ধরে এগিয়ে দিতে পারি প্রতিমা, এরপর তোমাকে যেতে হবে একলা চলার পথে। আমার যে এখনও ভোগান্তি শেষ হয়নি, আমাকে ফিরে যেতে হবে এখান থেকে, সংসারের আবর্তে। তুমি এগিয়ে যাও তোমার পথ ধরে, এরপর তোমার পাথেয় শুধু তোমার পুণ্য, তোমার ধর্ম।

কিন্তু মনকে কি একাগ্র করার উপায় আছে? পাশ থেকে শ্মশান পুরোহিত ক্রমাগত ভুল উচ্চারণে মন্ত্রপাঠ করে চলেছে। দাঁতে দাঁত দিয়ে সহ্য করছিলেন এতক্ষণ, শুধুমাত্র প্রতিমার মুখ চেয়ে। তার আত্মাকে এ সময়ে বিঘ্নিত হতে দেবেন না। কিন্তু আর সহ্য হল না পণ্ডিতের। খেঁকিয়ে ওঠেন তিনি, কী যা তা বকছেন? 'জান্তি' নয়, ওটা 'যান্তি'। অন্তস্থ 'য' উচ্চারণ হয় না আপনার?

পুরোহিতেরও বোধহয় সহ্যের শেষ সীমা পার হয়ে গিয়েছিল। দ্বিগুণ জোরে খেঁকিয়ে ওঠেন তিনি, কেমনতর মানুষ মশাই আপনি? অমন সোনার প্রতিমা পুড়ে ছাই হয়ে গেল, আর এখনও আপনি এইসব ছেঁদো কথা চিন্তা করছেন?

সোনার প্রতিমা!

পণ্ডিত সামলে নিলেন নিজেকে। বিশুদ্ধ উচ্চারণে বললেন:

'বিমুখা বান্ধবাঃ যান্তি, ধর্মস্তিষ্ঠতি কেবলম্।'

পুরোহিতের তখনও রাগ পড়েনি। আপন মনেই গজগজ করতে থাকেন, এই জন্যেই লোকে আপনার নামে পাঁচ কথা বলে। কোথায় দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলে মনটা হাল্কা করবেন, তা নয়, ক্রমাগত তখন থেকে আমার উরুশ্চারণ শুধরে চলেছেন।

সত্যিই চোখের জল তাঁর ফেলা উচিত ছিল। কিন্তু কিছুতেই লোক-দেখানো কান্নাটা আসছে না চোখে। অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে তাই পণ্ডিত শুধু বলেন, তা ঠিক, কিন্তু কথাটা উচ্চারণ, উরুশ্চারণ নয়।

পুরোহিত চম্‌কে ওঠেন। হঠাৎ ঘুরে হাত দুটি জোর করে বলেন, পেন্নাম আপনাকে—না না, পেন্নাম নয়, প্রণাম, প্রণাম। ঢের ঢের পণ্ডিত দেখেছি মশাই, কিন্তু বউয়ের মুখে আগুন দিতে এসে শ্মশানের দেওয়ালে বানান শুধরে দিতে কাউকে দেখিনি।

পণ্ডিত একেবারে মরমে মরে যান। কুণ্ঠিত স্বরে বলেন, দেবভাষা তো!

—আরে শুন মশাই আপনার দেবভাষা! স্ত্রীর ভালবাসার চেয়ে ভাষাটাই বড় হল আপনার কাছে? নিন, নাভিকুণ্ডলীটা আর ধরে রেখেছেন কেন?

গঙ্গায় ঝেড়ে দিন। স্ত্রীকে তো মুক্তি দিয়েইছেন, এবার আমাকেও মুক্তি দিন।

পণ্ডিত এ তিরস্কারে কর্ণপাত না করে মনকে আবার একাগ্র করেন। প্রতিমার শেষ দেহাবশেষ আদি গঙ্গার জলে বিসর্জন দিতে উদ্যত হলেন। কিন্তু এ কী! সম্মুখেই গঙ্গার জলে বিষ্ঠা ভাসছে! নাসারন্ধ্র কুঞ্চিত হয়ে গেল পণ্ডিতের। কোথায় বিসর্জন দেবেন প্রতিমার শেষ চিহ্ন? ঐ বিষ্ঠার উপর?

এমন যে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা, তাকেও কলকাতা শহর ক্লেদাক্ত করে ফেলেছে।

ঘুমন্ত শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে পণ্ডিত বাড়ির পথ ধরেছেন। বাতে পঙ্গু দেহটাকে টানতে টানতে কাতুদিদিও চলেছে পিছন পিছন। বেশি দূর যেতে হবে না। কালীঘাটের একটা বস্তিতে প্রশান্ত পণ্ডিতের এক কামরার ঘরখানা। কাত্যায়নীও থাকে ঐ বাড়িতে, পাশের দু কামরার খাপরাটায়। পথে কথা-বার্তা হচ্ছে না কিছু। কাত্যায়নীর আর কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না। বুড়োর উপর রাগ হয়েছে তার। হয়তো তার চোখে এক ফোঁটা জল ঝরল না দেখে, অথবা হয়তো পুরোহিতের সঙ্গে বুড়োর বচসাটুকু কানে গিয়েছিল বুড়ির।

পণ্ডিত পথ চলতে চলতে ভাবছিলেন ঐ পুরোহিতের একটা কথা, 'অমন স্ত্রীর ভালবাসার চেয়ে ভাষাটাই বড় হল আপনার কাছে?'

কথাটায় বড় বেজেছে পণ্ডিতের। অনেক দিন আগেকার একটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে তাঁর। তা প্রায় বছর পাঁচেক আগেকার কথা। প্রতিমার পিতৃকুলে বিশেষ কেউই ছিল না। বাবা-মা বিয়ের আগেই গত হয়েছিলেন; তাই বোধহয় পণ্ডিতের মতো মধ্যবয়সী পাত্রের হাতে ভগ্নীকে সমর্পণ করতে সম্মত হয়েছিল প্রতিমার দাদা! তা সে যাই হোক; সন্তান-সম্ভাবনা দেখা দেবার পর সেই দাদার সংসারেই আশ্রয় নিয়েছিল প্রতিমা, শেষ দুই মাস। বিবাহের পর সেই তার প্রথমবার বাপের বাড়ি যাওয়া। দাদাই এসে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে পৌঁছে প্রতিমা নির্বিঘ্নে পৌঁছানোর সংবাদটা জানিয়ে পণ্ডিতকে একখানা চিঠি লিখেছিল। ঐ একবারই মাত্র স্ত্রীর কাছ থেকে পণ্ডিত চিঠি পেয়েছেন। সেই প্রথম এবং সেই শেষ। তারপর দীর্ঘ তিন মাস প্রতিমা দাদার কাছে ছিল। কিন্তু আর দ্বিতীয় পত্র লেখেনি। পণ্ডিত পর পর তিনখানি পত্র লিখেও আর জবাব পাননি। খুকিকে নিয়ে ফিরে আসার পর এ প্রসঙ্গটা উত্থাপন করেছিলেন পণ্ডিত; তার জবাবে ঠিক ঐ জাতীয় কী একটা কথা সেদিন বলেছিল প্রতিমা। প্রশান্ত পণ্ডিত আজও বুঝে উঠতে পারেন না, তাঁর অপরাধটা কী হয়েছিল। স্ত্রীর পত্রের উত্তর দেওয়ার সময় তার বর্ণাশুদ্ধিগুলি সংশোধন করে সে কাগজখানাও খামে ভরে ফেরত পাঠানোর মধ্যে অন্যায়টা কী হল? এই 'অনুপপত্তির' বিষয়ে একটা মীমাংসা করার উদ্দেশ্যে

প্রসঙ্গটা চন্দ্রকান্তবাবুর কাছে একবার উত্থাপন করেছিলেন। চন্দ্রকান্তবাবু চেতলা স্কুলের ইংরাজি শিক্ষক, পণ্ডিতের সহকর্মী। এই একটি মানুষের সঙ্গেই সামান্য হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল পণ্ডিতের। এঁর সঙ্গে তবু দু-চারটে প্রাণের কথা হত। আর কেউ এই 'পাষণ্ড পণ্ডিতের' ত্রিসীমানায় ঘেঁষত না।

বৃত্তান্তটা আদ্যোপান্ত শুনে চন্দ্রকান্তবাবু বলেন, স্ত্রীর পত্রে বর্ণাশুদ্ধিগুলিই শুধু সংশোধন করেছিলেন, না ভাষাগত ত্রুটিও সংশোধন করেছিলেন?

—না ভাষায় তেমন কিছু ভ্রান্তি ছিল না, দু-চারটি ক্রিয়াপদের গুরুচণ্ডালি দোষ ছিল শুধুমাত্র।

—বুঝলাম। সম্বোধনে পাঠ কি ছিল মনে আছে?

—'শ্রীচরণকমলেষু',—তিনি অবশ্য ভ্রমক্রমে দন্ত্য স'য়ে হ্রস্ব-উ লিখেছিলেন। সেটা ঠিক করে দিয়েছিলাম আমি।

চন্দ্রকান্তবাবু গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, বুঝেছি। তা আপনার স্ত্রী সব শুনে কী বললেন, কেন তিনি দ্বিতীয়বার চিঠি লেখেননি?

—সেটাই তো সমস্যা। তিনি কোনই হেতু প্রদর্শন করেননি।

চন্দ্রকান্তবাবু বলেছিলেন, দেখুন পণ্ডিতমশাই, সকলকে সব কথা বুঝবার ক্ষমতা তো ভগবান দেন না; এ এমন একটা দাম্পত্য অনুভূতির সূক্ষ্ম ব্যাপার যে, আপনাকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না।

পণ্ডিত অর্কফলাসমেত কদমফুলছাঁট মাথাটা নেড়েছিলেন শুধু।

এ অনুপপত্তির সমাধান আজও হয়নি ন্যায়রত্নের।

কালীঘাটের একটা এঁদো গলির মধ্যে মাটির দেওয়াল ঘেরা খাপরার ঘরে পণ্ডিত প্রশান্তকুমার ভট্টাচার্য ন্যায়রত্ন মশায়ের এককামরার সংসার। শ্মশান থেকে দাহকার্য সমাধা করে ফিরে এসেছেন কন্যাকে নিয়ে। খুকি এখনও ঘুমোচ্ছে। শ্মশানে সেই যে ঘুমিয়ে পড়েছে এখনও তার ঘুম ভাঙেনি। চৌকির উপরে বিছানাটা পাতাই ছিল। শুইয়ে দিয়েছেন ঘুমন্ত মেয়েটাকে। লোহা ছুঁইয়ে নিমপাতা খাইয়ে আরও কী কী সব অনুষ্ঠান শেষ করে কাত্যায়নী গিয়ে ঢুকেছে তার নিজের ঘরে। বিকালে জল ধরার কাজটা বুড়ির করা হয়নি বলে পুত্রবধূর গাল শুনতে হল। তারপর সেসব ঝামেলাও মিটে যায়। সন্ধ্যাহ্নিক আজ নেই। পণ্ডিত দ্বার বন্ধ করে নিজেও শুয়ে পড়েছেন নিদ্রিত কন্যার পাশে গিয়ে। ছোট ঘর; কোনক্রমে একখানি মাত্র চৌকি পাতা গিয়েছে। সেটিতেই শয়ন করতেন পণ্ডিত কন্যাকে নিয়ে; প্রতিমা মাটিতেই ঘুমাত। দিনের বেলা ঐ অংশটুকুতেই রান্নার কাজ সারতে হত প্রতিমাকে।

আজ প্রায় বছর পনের আছেন এখানে। কলকাতার দক্ষিণ দিকে জয়নগর মজিলপুরের কাছাকাছি কোন এক অজ পাড়াগাঁয়ে পণ্ডিতের আদি বাস। সোনারগাঁ জায়গার নাম। গ্রামের জমিদারের সঙ্গে সামান্য কারণে ঝগড়া-বিবাদ

করে সব ছেড়েছুড়ে চলে এসেছিলেন একদিন। আশ্রয় নিয়েছিলেন এই অগতির-গতি কলকাতা শহরে। সাত-পুরুষের সে ভিটেখানা এতদিন টিকে আছে কিনা তাই খবর রাখেন না। বছরপাঁচেক আগে, খুকু যেবার হয়, গ্রামের রাখহরি রোষের সঙ্গে হাজরা রোডের মোড়ে হঠাৎ ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে যায়। তার মুখে তখন শুনেছিলেন পুব-দুয়ারি ঘরখানা গেছে, উত্তরমুখী মণ্ডপটাও ভেঙে পড়েছে। একমাত্র দক্ষিণ-দুয়ারি চালাখানা তখনও টিকে ছিল। তারপর আরও পাঁচ-পাঁচটা বর্ষা গেছে অনাদরে অবহেলায়। সেখানাও এতদিনে নিশ্চয় ভূতলশায়ী হয়েছে। নেহাত ব্রহ্মোত্তর ভূখণ্ড বলে বেড়ার পাঁচিল ভেঙে পড়া সত্ত্বেও প্রতিবেশীরা জমিটা বে-দখল করেনি। গ্রামের মানুষ ব্রহ্মশাপকে আজও ভয় করে। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের বংশ। কিন্তু গ্রাম্য আগাছার বোধহয় সে ভয় নেই। আশশ্যাওড়া, কালকাসুন্দি অথবা শেয়ালকাঁটার দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ছেয়ে গেছে সেই ছোট্ট ভূখণ্ড, এককালে যেখানে তর্করত্ন, তর্কপঞ্চাননের পদধূলি পড়ত। একটা বেল আর একটা ঘোড়ানিম গাছ দিব্যি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে উঠানে। তা সে পৈত্রিক ভিটার কথা ভেবে কী হবে? পণ্ডিত তো আর কোনদিন সোনারগাঁয়ে ফিরে যাবেন না। পৈত্রিক ভিটা থেকে জন্মের মত চলে এসেছেন। একটা ভাইপো-ভাগ্নে থাকলেও না হয় লেখাপড়া করে জমিটা হস্তান্তর করতেন—আর কিছু নয়, অন্ততঃ সন্ধ্যাবেলায় ভিটেয় তাহলে একটা প্রদীপ জ্বলত; কিন্তু ভগবান সে সুখও লেখেননি কপালে। তিন কুলে পণ্ডিতের কেউ নেই।

পিতা এবং পিতামহের বৃত্তি ছিল—অধ্যয়ন-অধ্যাপন, যজন-যাজন কুলাচার শিখে ন্যায়ের উপাধি গ্রহণ করেছিলেন প্রশান্তকুমার। পিতার দেহান্তের পর নিজের পুব-দুয়ারি ঘরখানায় একটি পাঠশালা খুলে বসেছিলেন। সোরভির মা ঘরের যাবতীয় কাজ করে দিয়ে যেত—মায় গরু দোহানো পর্যন্ত। স্বপাক আহার করতেন। পাঠশাল নিয়েই দিন কেটে যেত তাঁর। পূর্ব যুগে এটি ছিল চতুষ্পাঠী। শিশুকালে প্রশান্ত পণ্ডিত নিজেও দেখেছেন পিতৃদেবের চতুষ্পাঠীতে গুটি তিন-চার ছাত্র থাকত। তারা গুরুগৃহেই বাস করত, সংসারের যাবতীয় কাজ করত, ভিটে-সংলগ্ন জমিতে। তারপর সংস্কৃত পড়তে আসার রেওয়াজ গেল। এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেও ও অঞ্চলে যজন-যাজনের বৃত্তিটার একটা মর্যাদা ছিল। সমাজের একটা বাঁধন ছিল তখন। ক্ষমতাও ছিল ব্রাহ্মণ সমাজের। অদূরবর্তী জয়নগরমজিলপুরের স্বয়ং শিবনাথ শাস্ত্রীকেও সে সমাজ এই ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করায় সহ্য করেনি। অর্থ ছিল না, কিন্তু সম্মান নিয়ে বাস করে গেছেন পিতা-পিতামহ। তারপর পশ্চিমাগত হঠাৎ-আলোর ঝলকানিতে ধাঁধিয়ে গেল দেশটা। সংস্কৃত পড়ার আগ্রহ স্তিমিত হয়ে এল মানুষের। পূজার চাল-কলা-নৈবেদ্যে পেটও ভরে না, জাতও যায়। এ বৃত্তিতে আর সম্মান থাকল না। পৈতৃক চতুষ্পাঠী উঠে

গেল। প্রশান্তকুমার চতুষ্পাঠী তুলে দিয়ে পাঠশালা খুলে বসলেন। শুধু সংস্কৃত নয়, ইংরাজিও পড়াতে শুরু করলেন সেখানে। 'ঈশাবাস্যমিদংসর্বম্' কমিয়ে দিয়ে বাড়িয়ে দিলেন—'এ স্লাই ফক্স মেট এ হেন।' সারা দেশেই যে 'ঈশ'র স্থান গ্রহণ করছিল ঐ 'স্লাই ফক্স'। নগদ বৃত্তি কেউই দিত না, তবে চিরকালের প্রথানুসারে সিধা পেতেন ছাত্রদের কাছ থেকে। চালটা, কলাটা, মুলাটা দিয়ে যেত গ্রামের মানুষ। গাছের প্রথম এঁচড়, অথবা মোচা-থোড়-চালকুমড়া দিতে এলে পণ্ডিত হেসে বলতেন, স্বপাক রন্ধন করি আমি। একার সংসারে এসব কী হবে বাবা সকল?

গ্রামবাসী হয়তো লজ্জা পেত। হাল ছাড়ত না। গাছের প্রথম ফলটা পাঠিয়ে দিত কোন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের বাড়ি। কোন সাত্ত্বিক বিধবা হয়তো রান্না করতেন সেই তরকারী, নিমন্ত্রণ করে যেতেন পণ্ডিতকে। ওদের মনে আঘাত করতে মন সরত না নব্যনৈয়ায়িকের। আহার্য গ্রহণ করতেন প্রতিবেশীর বাড়িতে।

এমনিভাবেই দিন চলে যেত মন্দাক্রান্তা ছন্দে। জীবনে একটি জিনিসকেই ভালবেসেছিলেন—অধ্যয়ন। কতকগুলি হাতে-লেখা পুঁথি, আর কতকগুলি জরাজীর্ণ গ্রন্থই ছিল ওঁর সবচেয়ে প্রিয়বস্তু। তাদের আঁকড়েই জীবন কাটাতেন। আর একটি বাসনা ছিল মনে—কয়েকটি ছাত্রকে মানুষ করে যাবেন। তাদের কীর্তির মাঝখানেই বেঁচে থাকবেন তিনি। পণ্ডিত নয়, বিদ্বান নয়, প্রকৃত মানুষ গড়ার স্বপ্ন ছিল তাঁর।

কিন্তু সব স্বপ্ন ধূলিসাৎ হল একদিন। এত সুখ সইল না তাঁর বরাতে। অতি সামান্য কারণে তিনি স্থানীয় জমিদার সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বিরাগভাজন হয়ে পড়লেন। সোনারগাঁর জমিদারও ব্রাহ্মণ, শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ। জমিদার তাঁর একমাত্র পুত্রটির উপনয়ন উপলক্ষে পণ্ডিতকে একদিন ডেকে পাঠালেন তাঁর খাস-কামরায়।

ঘরে তখন চার পাঁচজন মোসায়েব শ্রেণীর লোক উপস্থিত। সুরেন্দ্রনাথ ফরাসের উপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। হাতে তাঁর ফরাসির নল। কয়েকটি পানপাত্র ইতস্ততঃ ছড়ানো।

প্রশান্তকুমারের আগমনমাত্র রক্তিম দুটি চোখ তুলে সুরেন্দ্রনাথ বললেন, আসুন, আসুন ন্যায়রত্নমশাই। ওরে কে আছিস, একখানা চেয়ার এনে দে। এ চৌকিতে বসলে ওঁকে আবার এই অবেলায় স্নান করতে হবে।

পণ্ডিতের নজর হল শুধুমাত্র পানীয় নয়, আহার্যও দেওয়া হয়েছে কাঁচের প্লেটে, বোধকরি নিষিদ্ধ মাংস!

পৃথক আসনে বসলেন প্রশান্তকুমার। বত্রিশ বছরের নব্য পণ্ডিত তখন তিনি। এমন ঝুঁকে পড়েননি সামনের দিকে। মেরুদন্ড সোজা রেখেই বসলেন।

সুরেন্দ্রনাথ রসিকতা করে বললেন, ন্যায়রত্নমশাই, ভবেনের গলায় এক গাছা দড়ি পরিয়ে দেবার আয়োজন করেছি। বকলেস না হলে ওকে আর বেঁধে রাখা যাচ্ছে না। বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করে হেসে ওঠেন।

অবশ্য মোসায়েবের দলও যোগ দেয় সে হাসিতে।

মুখটা মুছে নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ পাদপূরণ করেন, আগামী বাইশে বৈশাখ ওর উপনয়ন দেব স্থির করেছি; আমার অনুরোধ, আপনি ওর দীক্ষা-আচার্য হন।

প্রশান্ত পণ্ডিত অনেকক্ষণ কোন জবাব দিতে পারেননি।

ভবানন্দ জমিদারের একমাত্র পুত্র। তাঁরই পাঠশালায় এককালে পড়ত। না, পড়ত না, তাঁর পাঠশালায় যাতায়াত ছিল ছেলেটির। পড়াশুনায় তার একেবারে মন নেই দেখে বাধ্য হয়ে পণ্ডিত গিয়ে অভিযোগ করেছিলেন—আপনার ছেলেটির অধ্যয়নে একেবারেই মন নেই। সে কুসঙ্গে পড়েছে। তাকে শাসন করা দরকার। সুরেন্দ্রনাথ হেসে বলেছিলেন, পড়াশুনা না করতে চায় নাই করল, দুদিন যাতায়াত করুক না। তাতে প্রবল আপত্তি করেছিলেন পণ্ডিত, না, তাতে অন্যান্য ছাত্রদের ক্ষতি হবে। অগত্যা ভবানন্দ পণ্ডিতের পাঠশালা ছেড়ে চলে এসেছিল। সুরেন্দ্রনাথ তার প্রাইভেট টিউটার রেখেছিলেন। তাঁরা বেতনই নিতেন শুধু, পড়াতেন না—দোষ তাঁদেরও নেই, ভবানন্দকে পড়ানোর উপায় ছিল না। বাপ-মায়ের অতি আদরে ছেলেটি একেবারে বিগড়ে গিয়েছিল। ছেলেটির সম্বন্ধে প্রশান্তকুমার বিলক্ষণ খবর রাখেন। মাত্র ষোল-সতের বছর বয়স, কিন্তু এরই মধ্যে যাবতীয় পাপ-কার্যে হাত পাকিয়েছে। প্রকাশ্যে মাতলামি করতে তার সংকোচ নেই। জমিদারমশাই এসব ভ্রূক্ষেপ করতেন না; কেউ অনুযোগ জানাতে এলে হেসে বলতেন, মদ্যপান আমিও করে থাকি, আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেবও করতেন। ওটা আমাদের বংশের ধারা। তবে হ্যাঁ, ও বেটা আমাদের সকলকে হারিয়ে দিয়েছে! ভবেনটা যে বয়সে এতে হাত পাকিয়েছে সে বয়সে ওগুলো শুরু করতেই সাহস পাইনি আমরা। তবে শাস্ত্রেই তো বলেছে, শিষ্য এবং পুত্রের হাতে পরাজয় কাম্য।

প্রশান্ত পণ্ডিতকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে সুরেন্দ্রনাথ একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, আপনি আমার কথার জবাব দিলেন না যে?

প্রশান্ত পণ্ডিত কুণ্ঠিত স্বরে বলেছিলেন, আপনি মার্জনা করবেন, অন্য কাহাকেও এ দায়িত্ব দিন বরং—গ্রামে বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ তো আরও অনেক আছেন—

সুরেন্দ্রনাথ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, গাঁয়ে বামুন ক'ঘর আছে সে-হিসাব আপনার চেয়ে আমি ভাল জানি। সেকথা ভাবতে হবে না আপনাকে। আপনার আপত্তিটা কোথায়? পাঁচ বিঘে ভাল লাখেরাজ জমি

আপনাকে ব্রহ্মোত্তর দিচ্ছি। এক বস্তা ধান, গরদের জোড়, পাদুকা, ছাতা এবং নগদ একটি গিনি।

পণ্ডিত মৃদু হেসে বলেছিলেন, তবেই দেখুন, উপযুক্ত আচার্য পেতে এ ক্ষেত্রে আপনার কোন অসুবিধা হবে না—

সুরেন্দ্রনাথ মদের পাত্রটা হাতে তুলে গম্ভীরকণ্ঠে বলেছিলেন, সেকথা আলোচনা করবার জন্যে তো আপনাকে ডাকিনি ন্যায়রত্নমশাই। আপনার আপত্তিটা কোথায় সত্যি করে বলবেন কি?

প্রশান্ত পণ্ডিত ধীর সংযত কণ্ঠে বলেছিলেন, মিথ্যাভাষণ আমি করি না, আপনি তা জানেন; কিন্তু অপ্রয়োজনে কিছু রূঢ় এবং অপ্রিয় কথাই বা আমাকে বলতে বাধ্য করছেন কেন?

মোসায়েব শ্রেণীর যে ক'টি জীব সে-ঘরে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন ব্রাহ্মণের এই অসমসাহসিকতায়। জমিদার সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে গ্রামে না চেনে কে? কত লোককে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করেছেন তিনি, তার হিসাব তো অজানা থাকার কথা নয় প্রশান্ত পণ্ডিতের। তাঁর একটিমাত্র মুখের কথায় মহেশ সর্দার গোটা গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে—এ খবর কে না জানে?

সুরেন্দ্রনাথ পানীয়টা গলাধঃকরণ করে বলেন, না আমি আপনার কৈফিয়ৎটা জানতে চাই!

—কৈফিয়ৎ! কৈফিয়ৎ কিসের? আমি তো অপরাধ কিছু করি নাই যে, তার কৈফিয়ৎ দেব!

—অপরাধ করেছেন কি করেননি সে বিচার করব আমি। আপনি কেন ভবানন্দের দীক্ষাগুরু হতে অস্বীকার করছেন, তার কারণটা আমাকে বলুন।

প্রশান্ত পণ্ডিত বলেছিলেন, কারণ অবশ্য একাধিক বর্তমান। তার ভিতর একটি হচ্ছে এই যে, ভবানন্দের জিহ্বার আড়ষ্টতাই যায়নি। এখনও সে মূর্ধন্য 'ণ' উচ্চারণ করতে পারে না, তার সংস্কৃত পাঠে আপনি বিন্দুমাত্র যত্ন গ্রহণ করেন নাই; ফলে গায়ত্রী মন্ত্র বর্তমানে তার পক্ষে উচ্চারণ করা অসম্ভব।

পণ্ডিতের স্পর্ধায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ, বলেছিলেন—ন্যাকামি করবেন না পণ্ডিতমশাই! বামুনের ছেলে গায়ত্রী জপ করতে পারবে না? কী বলছেন আপনি?

—আজ্ঞে না। কারণ, 'বামুনের ছেলের' জন্য গায়ত্রী মন্ত্রটা সৃষ্ট হয় নাই, মন্ত্রটা ব্রাহ্মণের অধিকারভুক্ত। বামুনের ঘরে জন্মালেই সে অধিকার জন্মায় না, ব্রাহ্মণত্ব তাকে অর্জন করতে হয়।

সুরেন্দ্রনাথ গর্জন করে উঠেছিলেন, আপনার খুব তেল হয়েছে দেখছি! আপনার মত পণ্ডিতমন্য বামুনকে কী করে শায়েস্তা করতে হয়, তা আমি জানি।

প্রশান্ত পণ্ডিত তাঁর প্রশান্ততা হারাননি। ধীর সংযত কণ্ঠে বলেছিলেন, আপনার উচ্চারণও বিশুদ্ধ নয়, শব্দটা 'পণ্ডিতম্মন্য', পণ্ডিতমন্য নয়।

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। হাঁক দিয়ে উঠেছিলেন, মহেশ!

লাঠিয়াল মহেশ ঘোষ তেলপাকা লাঠিখানা হাতে নিয়ে দ্বারের প্রান্তে এসে লম্বা সেলাম দিয়ে দাঁড়ায়। বাইশ বছরের উঠতি জোয়ান।

নব্য নৈয়ায়িকও তাঁর ঋজুগঠন বলিষ্ঠ দেহখানি নিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ান। আত্মসম্মান রক্ষা করবার মত বল তখন তাঁর বাহুতে ছিল। ঐ দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল মহেশকে প্রতিহত করবার মত দৈহিক ক্ষমতা অবশ্য ছিল না নিরস্ত্র পণ্ডিতের। কিন্তু এটুকু আত্মবিশ্বাস তাঁর ছিল যে, ঐ লোকটা তাঁর প্রাণটাই শুধু নিতে পারে—মানটা নয়।

সুরেন্দ্রনাথ কোন হুকুম জারি করার আগেই মোসায়েব শ্রেণীর একজন বলে ওঠে, কর্তা শুভদিনে ব্রহ্মরক্তপাত করবেন না—ওঁরা বাক্‌সিদ্ধ!

সুরেন্দ্রনাথ সম্বিত ফিরে পান।

দ্বারের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে প্রশান্তকুমারকে শুধু বলেন, বেরিয়ে যান।

প্রশান্ত পণ্ডিত বিনা বাক্যব্যয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ঘর ছেড়ে। মাথা সোজা রেখেই। শুধু ঐ ঘর নয়, পক্ষকালের মধ্যে তাঁকে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল জমিদারের অত্যাচারে; কিন্তু মাথা সোজা করেই গ্রাম ছেড়েছিলেন। ভবানন্দের শুভ উপনয়নের দিন যখন দূর-দূরান্ত থেকে গ্রামে নানান জাতের মানুষ আসছিল, তখন একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত চলেছিলেন বিপরীত দিকে। শহর কলকাতার দিকে।

সে আজ পনের বছর আগেকার কথা।

আশ্রয় নিয়েছিলেন কালীঘাটের এই এক-কামরা খাপরার ঘরে। এঁদো বস্তীতে। গ্রাম থেকে এসেছিলেন সামান্য কয়েকটি তৈজস, কিছু বস্ত্র এবং খানকতক প্রিয় গ্রন্থ নিয়ে। এখানেও স্বপাক রন্ধনের আয়োজন। কাজ জুটিয়ে নিয়েছিলেন কাছের একটা স্কুলে। চেতলায় কাছাকাছি। বাঁধা নিয়মে কাজ করে গেছেন। কখন নিজের অজান্তেই জীবন থেকে ঝরে পড়েছে পনেরটি বছর।

কিন্তু সেখানেই কেন শেষ হল না প্রশান্ত পণ্ডিতের ইতিকথা? একা এসেছিলেন একদিন এই দুনিয়ায়, সব ছেড়ে-ছুড়ে দিকে একাই আবার চলে যাবেন এই দুনিয়া ছেড়ে। সেই তো মানুষের নিয়তি। তাহলে কেন এভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন সংসারের জালে? কেন ঘরে ডেকে আনলেন দোসরকে? সাতটি বছরে ঐ মেয়েটি, ঐ প্রতিমা, এসে সব তছনছ করে দিয়ে গেল। যে নিশ্চিন্ত নির্ভরতার কথা, যে সমন্বয় সহানুভূতির কথা চিন্তাই করেননি কখনও তাতেই যে অভ্যস্ত হয়ে পড়লেন। রন্ধনের কথা আর চিন্তা করতে হত না, সময়ে আহার্য উপস্থিত হত সম্মুখে। ঘর-দ্বার সব সময়েই

ঝক্‌ঝক্‌ তক্‌তক্‌ করত। পরিচ্ছন্নতাকে ভালবাসতেন, কিন্তু তার পিছনে যে গ্লানিকর পরিশ্রমের প্রয়োজন, প্রাক্‌বিবাহ-জীবনে সেটা গ্রন্থপাঠে বিঘ্ন সৃষ্টি করত—প্রতিমা তাঁকে সে সমস্যা থেকে মুক্তি দিয়েছিল। বিনা বাধায় তিনি শাস্ত্রালোচনা করতেন; সংসার কিভাবে চলত খবরই রাখতেন না। কিন্তু সাত বছরে পণ্ডিতের একক জীবনের অভ্যাসটাকে বিনষ্ট করে দিয়ে হঠাৎ প্রতিমা একদিন পালাল। প্রতিমা থাকল না। প্রতিমা থাকে না। শাস্ত্রেরও তাই নির্দেশ। আবাহন-আরাধন-বিসর্জন। এই তো প্রতিমার নিয়তি, মৃন্ময় প্রতিমার। তাঁর জীবনের প্রতিমাকেও একদিন আবাহন করে এনেছিলেন এই খাপরায় ছাওয়া এক-কামরার সংসারে; পূজা সে পেয়েছিল কিনা তা সেই বলতে পারত; তারপর আজ তাকে চিরদিনের মত বিসর্জন দিয়ে এলেন আদি গঙ্গায়।

বিসর্জন?

কিন্তু বিসর্জনের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ তো তা নয়। বি-পূর্বক সৃজ্‌ ধাতু অনট্‌। 'বিসর্জন' মানে বিশেষভাবে জন্মগ্রহণ। পূজা অন্তে যখন মৃন্ময়ী প্রতিমার নিরঞ্জন করি, তখন বস্তুতঃ তিনি পর বছরের জন্য জন্মগ্রহণ করেন। আগামী বছরের প্রতিশ্রুতি মিশ্রিত বলেই বিসর্জনের ধাতুটা 'সৃজ্‌'। মৃন্ময়ী প্রতিমাকে জলে নিক্ষেপ করার মন্ত্রটাও তাই 'পুনরাগমনায় চ।'

আজ আদিগঙ্গায় আধ-কোমর জলে তিনি কি তেমনিভাবে প্রতিমা বিসর্জন দিয়েছেন? পুনরাগমনায় চ? আত্মা তো অবিনশ্বর। আজ এই আধো-অন্ধকারে কি আবার এসে দাঁড়াতে পারে না তাঁর মানস-প্রতিমা? তিনি তাহলে তাকে একবার জিজ্ঞাসা করতেন—

কিন্তু কী লাভ হত তাতে? কতবারই তো সে প্রশ্ন করেছেন। মৃদু হেসে এড়িয়ে গেছে প্রতিমা। সাত বছর তার সঙ্গে ঘর করেও প্রশান্ত পণ্ডিত বুঝতে পারেননি প্রতিমা তাঁকে পেয়ে সুখী হয়েছিল কিনা। প্রতিমা তাঁর চেয়ে কুড়ি বছরের ছোট। তার যখন ভরা যৌবন তখন প্রশান্ত ভট্টাচার্যের জীবনে লেগেছে প্রৌঢ়ত্বের অস্তমান ম্লানিমা। কতবার কতভাবে প্রশ্নটা পেশ করেছেন খুকির মাকে। প্রতিবারই সে হেসে এড়িয়ে গেছে, বলেছে—আপনাকে বললে তো আপনি বিশ্বাস করেন না, খামকা আমাকে দিয়ে বলাতে চান কেন?

হ্যাঁ, খুকির মা তাঁকে চিরকাল 'আপনি' বলে এসেছে। সাত বছরে নৈকট্যের অভাব হয়নি। সুখ-দুঃখের অনেক গোপন কথা হয়েছে দুজনের। পণ্ডিতের সন্তানকে সে অঙ্কে ধারণ করেছে, মাতৃ স্তন্যে পুষ্ট করে তুলেছে। কিন্তু ঐ সেই প্রথম দিনের 'আপনি' আর কোনদিন 'তুমি'তে পরিণত হয়নি।

খুকু বিছানায় উশ্‌খুশ্‌ করছে। বারে বারে পাশ বদলাচ্ছে। পণ্ডিতের মনে পড়ল এ সময় খুকির মা ওকে একবার হিসি করিয়ে আনত। একেবারে

শয্যাশায়ী হয়ে পড়ার পর পণ্ডিতকে মনে করিয়ে দিত, আপনি এখন একবার খুকুকে বাইরে নিয়ে যান, না হলে বিছানা নষ্ট করবে।

আজ আর খুকুর মা সেকথা মনে করিয়ে দেবে না। যেখানে তার বিছানাটা পাতা থাকত সেটা শূন্য পড়ে আছে। কম্বলটা অবশ্য পাতাই আছে। খুকির মাকে চাদর আর বালিশ সমেত উঠিয়ে নিয়ে খাটিয়ায় শুইয়ে দিয়েছিলেন। কম্বলটা পড়েই ছিল, এখনও পড়ে আছে। কিন্তু মনে করিয়ে না দিলেও কথাটা পণ্ডিতের মনে পড়ে গেল। হাত বাড়িয়েও হাত সরিয়ে নিলেন। থাক ঘুমাক। কী জানি, যদি হিসি করাতে গিয়ে ঘুম ভেঙে যায় ওর? যদি প্রশ্ন করে, মা কোথায়? কী বলবেন তিনি? যদি বলে খিদে পেয়েছে? কী খেতে দেবেন? ঘরে কোথায় কী আছে কিছুই তো জানেন না।

বাইরে রাস্তার মোড়ে গ্যাসবাতিটা তখন জ্বলছে। তারই আলো তেড়চা হয়ে ঘরে ঢুকেছে জানালা দিয়ে। জানালার পাল্লাটা অনেক দিন ভেঙে গেছে। বাড়িওয়ালা মেরামত করে দেয়নি। প্রতিমা একটা ছেঁড়া শাড়ির টুকরা দিয়ে পর্দামতো টাঙিয়ে দিয়েছিল। আর কিছু না, ঠাণ্ডা হাওয়া আসা কিছুটা বন্ধ হয়েছে তাতে। পণ্ডিত হাত দিয়ে পর্দাটা সরিয়ে দেন, আরও কিছুটা আলো ঢোকে ঘরে। পণ্ডিত কুলুঙ্গির উপর, মাজা বাসনের ভিতর, চৌকির নিচে টিনের কৌটাগুলোর ভিতর হাত চালিয়ে চালিয়ে হাতড়ালেন কিছুক্ষণ। তারপর নিজেরই খেয়াল হল—এসব স্থানে খুকির মা কোন খাদ্যদ্রব্য লুকিয়ে রাখবার সুযোগই পেয়েছিল না কি? আজ প্রায় পনের দিন সে তো একনাগাড়ে শুয়েছিল ঐ বিছানাটায়। খাবার জিনিস কিছুই নেই ঘরে। খুকু যদি উঠে বসে খেতে চায় তাহলে বিপদে পড়তে হবে। আচ্ছা, ও বেলা খুকু কী খেয়েছিল? আদৌ কিছু খেয়েছিল কি? মনে পড়ল না। তিনি নিজে কিছু খাননি। খাওয়ার কথা মনেও হয়নি, সুযোগও হয়নি। মাসে চার পাঁচ দিন তাঁকে এমনিতেই উপবাস করতে হয়। উপবাসে তাঁর কষ্ট হয় না, ওটা সহ্য হয়ে গেছে। বেলা ন'টা বত্রিশে অন্তিম নিঃশ্বাস পড়েছিল খুকির মায়ের। তারপর বাকি দিনটা কোথা দিয়ে কেটে গেছে জানতেও পারেননি। স্কুলে গিয়ে খবর দিলে হয়তো ছাত্রের অভাব হত না, মাস্টারমশাইরাও হয়তো কেউ কেউ আসতেন; কিন্তু অপরের কাছে সাহায্য চাওয়াটা তাঁর ধাতে নেই। নিজেই খাটিয়া কিনে এনেছিলেন। না-ডাকতেও শ্মশান-যাত্রী যোগাড় হয়ে গেল—ঐ নাকি তাদের ব্যবসা। সময়টা অফিস-টাইম। প্রতিবেশীরা আগ বাড়িয়ে খোঁজ নিতে আসেনি। আর শুধু অফিস-টাইম বলে নয়, পণ্ডিত জানেন, তাঁকে বিপদে-আপদে কেউ কোনদিন সাহায্য করতে আসেনি, আসবে না। প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাঁর খুব একটা সদ্ভাব নেই, ঝগড়া-বিবাদও নেই অবশ্য। ওদের কাছে তিনি তো আর প্রশান্ত ভট্টাচার্য নন, পাষণ্ড পণ্ডিত। তা আড়ালে রাজার মাকেও লোকে ডাইনি বলে; প্রশান্ত পণ্ডিত যে পাষণ্ড পণ্ডিত হয়ে

যাবেন এ আর বিচিত্র কি? সেই জন্যেই আজ তের রাত্রি চৌদ্দ দিন রোগভোগের মধ্যে প্রতিমাকে কোন প্রতিবেশিনীর কাছে জবাবদিহি করতে হয়নি—সে কেমন আছে, তার জ্বর আছে কিনা, কোন কষ্ট হচ্ছে কিনা। কোন প্রতিবেশীও পণ্ডিতকে ডেকে প্রশ্ন করেনি, আজ আপনার স্ত্রী কেমন আছেন। একমাত্র কাতুবুড়িই মাঝে মাঝে খবর নিতে আসত। বার্লিটা জ্বাল দিয়ে আনত, অথবা জ্বর বেশি হলে প্রতিমার মাথাটা ধুইয়ে দিত।

প্রতিবেশীর বাড়ির ত্রিতলের ঘর থেকে ঢং ঢং করে রাত এগারোটা বাজল। এই খোলার বস্তীর পাশেই ঐ ত্রিতল প্রাসাদ। কলকাতা শহরের এই এক মহিমা। ধনী ও দরিদ্র পাশাপাশি বাস করতে বাধ্য হয়।

গলির মধ্যে মাঝে মাঝে রিকশার ঠুংঠাং শব্দ উঠছে।

ত্রিতল বাড়ির আর এক ঘরে রেডিও বাজছিল। রাত এগারোটায় বেজে উঠল জাতীয় সঙ্গীত, জনগণমনঅধিনায়ক—

জাতীয় সঙ্গীতের শব্দকে ছাপিয়ে একটা মাতাল কাকে যেন অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিতে দিতে গলির এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে চলে গেল।

হঠাৎ পণ্ডিতের মনে পড়ে গেল আদি গঙ্গার জলে সেই ভাসমান বস্তুটাকে।

আকণ্ঠ বিষ পান করে কলকাতা শহর নীলকণ্ঠ হয়ে গেছে!

পণ্ডিত উঠলেন। কলসী থেকে জল গড়িয়ে খাবেন বলে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ঘটিটাকে উদ্ধার করতে পারলেন না। মাজা বাসনের তাক থেকে একটা কাঁসার জামবাটি নিয়ে এগিয়ে আসেন কলসীটার কাছে। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, কলসীতে এক ফোঁটা জল নেই। মৃত্যুর পরে অশুচি জলটা বোধকরি কেউ ফেলে দিয়েছিল, আর ভরে রাখবার কথা তার মনে নেই। তার দোষ নেই। কলসীটা খালি করারই দায়িত্ব ছিল তার—মৃতের প্রতি জীবনের দায়। নতুন করে ভরার দায়টা আবার মৃত্যুর নয়, জীবনের। সে ত্রুটি প্রশান্ত পণ্ডিতের। ভোগে তো সেই ভুগুক। তা নিরম্বু উপবাস করাও অভ্যাস আছে পণ্ডিতের। আবার খুকুর পাশে গুটিগুটি শুয়ে পড়েন তিনি।

কিন্তু নাঃ, খুকু বড়ই উশখুশ্ করছে।

হঠাৎ মনে হল ঝাঁপের দরজায় কে যেন অতি মৃদু টোকা দিচ্ছে। ছাঁৎ করে ওঠে বুকের মধ্যে। সে কি এসেছে? পুনরাগমনায় চ? উঠে বসেন পণ্ডিত। না, ভুল তাঁর হয়নি, আবার কে যেন টোকা দিল মুলি বাঁশের উপর। বালিশের নিচে দেশলাইটা আছে। হাত বাড়িয়ে সেটা নিতে গিয়েও হাতটা টেনে নেন। নাঃ, থাক। আলো জ্বালবেন না। সত্যই সে যদি এসে থাকে তবে এই আলো-আঁধারিতেই তার মুখোমুখি হবেন। প্রখর আলো হয়তো সে সহ্য করতে পারবে না। না, ভয় তিনি পাননি একটুও। খুকির মাকে ভয়

পাওয়ার কথা মনেও হয়নি তাঁর। সন্তর্পণে উঠে এসে ঝাঁপের দরজা থেকে আগলটা সরিয়ে দিলেন।

দরজা খুলতে চুপিসারে ঘরে ঢুকলেন কাতুপিসি।

—এত রাতে পিসি তুমি?

—চুপ, কথা কস্‌নি! শত্তুরগুলো এই সবেমাত্র ঘুমিয়েছে।

—শত্রু? কে তোমার শত্রু?

—কে আবার? যে দুটো হতচ্ছাড়াকে দশ মাস গর্ভে ধরেছিলাম। আর যে দু' মাগী তাদের অপগণ্ড দুটোকে গর্ভে ধরেছে!

—আঃ পিসি! কী অশ্লীল ভাষা তোমার! নিজের পুত্র পুত্রবধূকে—

—থাম দিকি তুই! ভাষা শেখাস্‌ তোর পোড়ারমুখো ছাত্তরদের! এই নে, এই দুটো রাখ। খুকি রাতে কিছু খায়নি। রাত বিরেতে যদি উঠে খেতে চায়—

—কী ওগুলো?

কাত্যায়নী জবাব দিল না। পণ্ডিতের ডানহাতটা টেনে নিয়ে তাতে গুঁজে দেন একটা পাকা কলা আর কাগজের ঠোঙায় খানকতক জিলিপি।

—এ তুমি কোথায় পেলে পিসি?

অন্ধকারের মধ্যেও মাড়ি-সর্বস্ব হাসি ফুটে ওঠে দন্তহীনার মুখে। বলে, বলি বটে শত্তুর, তবু ন্যাপ্‌লাটা আমাকে এখনও ভক্‌তি-ছেদ্দা করে। কাল একাদশী তো। তাই বউকে লুকিয়ে আমাকে দিয়ে গেছল। আমি খুকির জন্য সরিয়ে রেখেছিলুম।

পণ্ডিতের চোখে জল এসে যায়। গোপাল আর নেপাল বুড়ির দুই উপযুক্ত পুত্র। কিন্তু সংসারে দুই দজ্জাল বধূর সামনে তারা কাঁটা হয়ে থাকে। দুই বধূতেও নিরন্তর চুলোচুলি-মারামারি ঝগড়া-বিবাদ লেগেই আছে; প্রতি বিষয়েই দুজনের ভিন্ন মত। শুধু একটি বিষয়ে তারা একমত—এই বিধবা বুড়ি যে এসে ওদের সংসারে অন্ন ধ্বংস করছে এটাতে দুজনেরই ঘোরতর আপত্তি। বুড়ির ছোট ছেলে নেপাল তাই বধূদের দৃষ্টি এড়িয়ে একাদশীর আগে রাত্রে বিধবা মায়ের জন্য একটি বীচেকলা আর এক ঠোঙা জিলিপি এনে দিয়েছে মায়ের কাছে। আর সেই খাবারটুকু কাতুবুড়ি লুকিয়ে নিয়ে এসেছে খুকির জন্য, এই মধ্য রাত্রে।

পণ্ডিতকে কোন কথা বলার অবকাশ না দিয়ে কাতু'দিদি খুকিয়ে উঠিয়ে নিয়ে [illegible]।

পণ্ডিত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। জ্ঞানত তিনি কারও কাছে কখনও প্রতিগ্রহ হাত পেতে নেননি। সুরেন্দ্রনাথের উপযাচক হয়ে দিতে আসা পাঁচ বিঘে ব্রহ্মোত্তর প্রত্যাখ্যান করেছিলেন বলেই ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়েছিলেন একদিন। তবু আজ এই আসন্ন একাদশীর পূর্ব রাত্রে ঐ বিধবা বুড়ির স্নেহের

দানটা প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না।

যা ভেবেছিলেন, ঘুম ভেঙে গেল খুকুর ; কিন্তু ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কাতুদিদি ওকে খাটে বসিয়েই কলা আর জিলিপি খাওয়াল। কলসীটা নেড়ে তাতে এক বিন্দু জল নেই দেখে গজগজ করে কাকে যেন গাল পাড়তে থাকে। পণ্ডিত লজ্জিত হন। ত্রুটিটা তাঁরই—কন্যার জন্য পানীয় জল সংগ্রহ করে রাখা উচিত ছিল তাঁর ; কিন্তু একটু কান করতেই শোনেন, কাতুপিসি গালাগাল দিচ্ছে তাঁকে নয়, তাঁর স্বর্গগতা স্ত্রীকে ; এমন ডাংডেঙিয়ে বড় যে আগ বাড়িয়ে সগ্‌গে গেলি তুই, একবার আক্কেল হল না এই পোড়ারমুখো মিন্‌সের খাবার জলটা কে ভরে দেয় !

খুকুকে খাইয়ে, জল খাইয়ে, মুখ মুছিয়ে আবার তাকে বিছানায় শুইয়ে দেয়।

—শো এবার। বলে বুড়ি বিদায় নিল। ঝাঁপের দরজাটা বন্ধ করে পণ্ডিতও শুয়ে পড়েন ঃ বাসুদেব ! তুমিই সত্য !

কিন্তু ঘুম ভেঙে গেছে খুকুর। অবোধ দুটি চোখের দৃষ্টি মেলে সে চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখে। মায়ের শূন্য বিছানাটার দিকে তাকিয়ে বলে ঃ মা কোথায় ?

পণ্ডিতের গলায় কী যেন একটা আটকে যায়।

—বল না বাবা, মা কোথায় ?

—তোমার মা স্বর্গে গেছেন মা-মণি !

—সগ্‌গ কোথায় বাবা ?

পণ্ডিত জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারা ঐ এক মুঠো আকাশের দিকে শীর্ণ তর্জনীটা তুলে বলেন, ঐখানে।

খুকু অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকে। আকাশে জ্বল-জ্বল করে জ্বলছে একটা নক্ষত্র। একদৃষ্টে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকে খুকু তার জুলজুল চোখে। তারপর বাপের দিকে ফিরে বলে, আবার কবে আসবে মা ?

বৃদ্ধ একটু ইতস্ততঃ করেন। মিথ্যা কেমন করে বলেন ? শেষে বলেন, তিনি তো এখানেই আছেন মা-মণি। আমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না শুধু।

খুকু বলে, যা ! মার যে অসুখ। মা কি এখন লুকোচুরি খেলতে পারে ?

পণ্ডিত চিন্তা করে দেখেন, এ-অবোধ শিশুকে ঐ দার্শনিক ব্যাখ্যায় শান্ত করা যাবে না। ওর কাছে অনৃতভাষণে অন্যায় নেই কিছু। পরিণতবয়স্ক মানুষ এবং অবোধ শিশুর কাছে সত্যের সংজ্ঞা অপরিবর্তনশীল নয়। সত্যধর্ম এত স্থূল নয় যে, জগতের তাবৎ উপকথাকে সে অস্বীকার করবে। শিশুর মনোজগতে যে সাতরঙা ইন্দ্রধনুটা রূপে-রঙে তার মন ভোলায়, সেটিকে কালিমালিপ্ত করার কোন ইচ্ছে নেই সত্যধর্মের। পণ্ডিত বলেন, তোমার মা স্বর্গের দেবতাদের কাছে গেছেন মা-মণি। আবার একদিন তোমার কাছে

ফিরে আসবেন। তুমি লক্ষ্মী হয়ে থাকলে, আমার কথা শুনলে, খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন তিনি। তুমি লক্ষ্মী হয়ে থাকবে তো?

খুকু একগাল হেসে বলল, থাকব।

—এবার তাহলে চোখ বন্ধ কর।

—তুমি গান কর।

চমকে ওঠেন পণ্ডিত। গান? গান করবেন তিনি! প্রশান্ত পণ্ডিত!

—কই গান কর, কিসের মাসি, কিসের পিসি, গান কর···

উপায়ান্তরবিহীন হয়ে বৃদ্ধ নৈয়ায়িক তাঁর কর্কশকণ্ঠে একবার শেষ চেষ্টা করেন, 'কিসের মাসি, কিসের পিসি, কিসের বৃন্দাবন! এতদিনে জানলেম মা বড় ধন!'

খুকু মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়ে।

না, খুকু জানল না, এতদিনে পণ্ডিতই এটা মর্মে মর্মে জানলেন!

পণ্ডিতও ইষ্টনাম স্মরণ করে শুয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ হাতে এক খণ্ড কাগজ লাগল। আঠা আঠা। সেই জিলাপির ঠোঙাটা। কাতুপিসি খুকিকে খাটে বসিয়েই জিলিপিটা খাইয়েছে। হাতটা ধুয়ে ফেলতে উঠতে হল আবার। ঠোঙাটা জানলা দিয়ে ফেলে দিতে গিয়ে গ্যাসের আলোয় হঠাৎ নজরে পড়ল সেটা 'স্তবকুসুমাঞ্জলির' একটা ছেঁড়া পাতা। সের দরে কেউ হয়তো বিক্রয় করে দিয়েছিল পুরানো কাগজওয়ালাকে। তা থেকে ঠোঙা হয়েছে; আজ জিলিপি বেষ্টিত হয়ে ফিরে এসেছে পণ্ডিতের ঘরে। কৌতূহলী হয়ে মেলে ধরেন গ্যাসের স্তিমিত আলোয়। আবছা পড়া যায়। ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধ সে অল্পালোকে ভাল দেখতে পেলেন না—কিন্তু প্রার্থনা মন্ত্রটা যে তাঁর কণ্ঠস্থ।

কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েন ন্যায়রত্ন। মনে হল, এ মঙ্গলময়ের আশীর্বাদ। যেন সারাদিন এ সত্যটা ভুলেছিলেন বলেই দিনান্তের এই শেষ মুহূর্তে তাঁর কণ্ঠ শুনতে পেলেন। ভারতবিধাতার বন্দনা গান তিনি মাতালের অশ্লীল গালাগালে ডুবে যেতে শুনেছেন, গঙ্গার পবিত্র জলকে পূতিগন্ধময় বিষ্ঠায় দূষিত হতে দেখেছেন, প্রতিবেশীদের নির্লিপ্ত উদাসীনতা এবং শ্মশান-যাত্রীদের মাতলামোতে মনটা বিষিয়ে উঠেছিল; কিন্তু এই তো জীবন নয়! এখানে নেপাল তার বউকে লুকিয়ে বিধবা মায়ের জন্য ঠোঙায় করে মাধুর্য রস আহরণ করে আনে, এও তো সত্য। আবার সেই ঠোঙায় জড়ানো মাধুর্য রস সেই বিধবা বুড়ি প্রতিবেশীর মা-হারা মেয়ের জন্য লুকিয়ে নিয়ে আসে তাও তো অসত্য নয়! তাই দিনান্তের ঐ মন্ত্রটা তিনি পণ্ডিতকে শুনিয়েছেন এই 'মধুনক্তমে'।

যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে সদ্য শ্মশানপ্রত্যাগত ন্যায়রত্ন উচ্চারণ করেন সেই মন্ত্রটিকেই। দিনান্তের শেষ প্রার্থনামন্ত্রঃ মধুবাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, মাধ্বীর্ণঃ সন্তোষধীঃ।

নিষ্প্রভাত রাত্রি নেই। সব দুঃখ-রজনীরই অবসান আছে; পণ্ডিতের সেই অধুময়ী দুঃখরজনীও শেষ হল। আবার পূব আকাশে ফুটে উঠল সোনার দ্বাক্ষর—বালার্ক রশ্মির আলোক-বন্যায় ভেসে গেল বিশ্বচরাচর। এমন যে সর্বশক্তিময় হিরণ্যগর্ভ সূর্যদেব, তাঁরও বসে থাকবার সময় নেই—তাঁকেও প্রতিটি মুহূর্তে বিশ্বছন্দে তাল রেখে এগিয়ে চলতে হয় সম্মুখপানে, চরৈবেতি মন্ত্রে দীক্ষিত তিনি।

অতি প্রত্যূষে ওঠা প্রশান্ত পণ্ডিতের চিরদিনের অভ্যাস। প্রায় সমস্ত রাত্রিই জাগ্রত ছিলেন তিনি, মাঝে মাঝে তন্দ্রামত এসেছিল, কিন্তু প্রতিবেশীর জাপানী ঘড়িতে প্রহরের পর প্রহর অতিক্রান্ত হয়ে যেতে শুনেছেন। শুক্লা দশমীর চাঁদ পূর্ব গগন থেকে পশ্চিমাকাশে ম্লান হয়ে গেছে। তবু প্রতিদিনের মত ব্রাহ্ম-মুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করেন পণ্ডিত। প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে মনে পড়ল আজ আহ্নিক নেই, তাঁর অশৌচ, একাদশী তিথিতে তিনি অন্নগ্রহণ করেন না, প্রতিমা দুটি মুগের ডাল ভিজে, কিছু বাতাসা, হল তো দুটি শশার কুচি মেলে ধরত। আজ প্রতিমা নেই, তা বলে অরন্ধনের ব্যবস্থা হতে পারে না, খুকি কাল কী খেয়েছে জানেন না, আজ যা হোক দুটো ভাতে-ভাত রাঁধতে হবে।

খুকু তখনও ঘুমাচ্ছে। পণ্ডিত চাদরটা টেনে ওর গায়ে ঢাকা দিলেন। চরাচর খুকুও সকালে ওঠে। কাল দুপুরে ঘুমায়নি, আজ তাই এখনও ঘুমাচ্ছে। ঘরের শিকলটা তুলে দিয়ে পণ্ডিত বাজারের পথে রওনা হলেন। বাজার কাছেই। বেশি দূরে যেতে হবে না। র‍্যাশান-লক্ষ্মী ঘরেই আছেন, দুটো কাঁচা কলা, কিছু আলু আর সৈন্ধব লবণ কিনে ফিরে আসছেন—হঠাৎ খেয়াল হওয়ায় খানচারেক লিলি বিস্কুটও কিনে নিয়ে এলেন। খুকু তখনও ঘুমাচ্ছে।

অনভ্যস্ত হাতে তোলা উনুনটা ধরিয়ে গলির মধ্যে রেখে গিয়েছিলেন। বাজার থেকে ফিরে এসে দেখেন বেশ আঁচ উঠেছে। চিমটে দিয়ে ধরে সেটাকে ঘরে নিয়ে এলেন। চালটা ধুয়ে আনতে না আনতেই খুকুর ঘুম ভাঙল। বড় বড় দু' চোখে চারিদিকে তাকিয়ে কী দেখল, তারপর বাপের দিকে তাকিয়ে বলে, বাবা তুমি কাঁদছ কেন?

পণ্ডিত চোখ দুটো রগড়ে মুছে নেন, বলেন, কাঁদিনি মা, ঐ উনানের ধুমে জল এসেছিল।

খুকুকে মুখ ধুইয়ে দিতে গিয়ে একটু বিব্রত হলেন। নিজে তিনি নিমের দাঁতন নিয়ে আসেন প্রতিদিন। দেশে থাকতে টাটকা নিমের ডাল ভেঙে আনতেন। সে সুবিধা কলকাতা শহরে নেই, কিন্তু অভ্যাসটা আছে। কিন্তু খুকু কিভাবে দাঁত মাজে? এ সামান্য সাংসারিক তথ্যটাও জানা ছিল না তার, প্রশ্ন করেন, তুমি কী প্রকারে মুখ প্রক্ষালন কর?

খুকুর বোধগম্য হয় না প্রশ্নটা; পেট চুলকাতে চুলকাতে মুখটা উঁচু করে বলে: এঁ্যা?

প্রশ্নটা আর একটু সহজ ভাষায় প্রকাশ করার পর খুকু সহাস্যে বললে, তুমি কিচ্ছু জান না বাবা, আমি তো তেল-নুন দিয়ে দাঁত মাজি, মা-ও—

হঠাৎ কী মনে হওয়ায় মাঝপথেই থেমে যায়।

পণ্ডিত ওর ছোট্ট হাতের তালুতে এক ফোঁটা তেল এবং এক চিমুটে সৈন্ধব লবণ ফেলে দিলেন। খুকু একটু ইতস্ততঃ করে। আড়চোখে বাপের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে। তারপর কোন কথা না বলে নিজেই দাঁত মাজবার চেষ্টা করে। বাবাকে আর বলে না নিত্যকর্মপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত ঐ দন্ত-প্রক্ষালন প্রক্রিয়া সে নিজে হাতে এতদিন করেনি।

পাঁচ বছরের শিশুও কি বুঝতে পেরেছে, এখন থেকে তাকে আত্মনির্ভর হবার চেষ্টা করতে হবে? কেউ তাকে কিছু বলেনি। নিজেই ঘটিতে করে জল নিয়ে বাইরে যায়। মুখটা ধুয়ে ফিরে আসে।

পণ্ডিত তার হাতে চারখানি বিস্কুট তুলে দেন, খাও মা-মণি।

খুকু কী মনে করে দুখানা বিস্কুট পণ্ডিতের দিকে বাড়িয়ে ধরে। হেসে ফেলেন বৃদ্ধ, বলেন, দূর পাগলি! আমি কি বিস্কুট খাই? তুমিই সবগুলো খাও?

দ্বিতীয়বার অনুরোধ করতে হল না। ক্ষুধায় বোধ করি বেচারি এমনিতেই কাতর ছিল। চারখানি বিস্কুটই খেল বসে বসে।

উনুনে জলটা গরম হয়ে উঠেছে। মাজা পিতলের বোগনোয় জল বসিয়েছেন। স্বপাক রন্ধনে অভ্যস্ত ছিলেন। শেষ বছরসাতেক অবশ্য অব্যাহতি পেয়েছিলেন, একেবারে অভ্যাসটা যায়নি। প্রতি মাসে চারদিন তাঁকে স্বপাক আহার করতে হত। নিষ্ঠাবান হওয়ার মাশুল। কাঁচকলা আর আলু কেটে এনে ছেড়ে দিলেন জলে, ধোয়া চালটাও দিলেন। খুকু তার ভাঙা পুতুলের ডালিটা চৌকির তলা থেকে টেনে বার করবার উদ্যোগ করছিল, বাদ সাধলেন পণ্ডিতমশাই, না, মা-মণি, প্রাতঃকালে খেলা চলবে না, তুমি এখন পাঠাভ্যাস করবে। বই নিয়ে এস।

এদিকে মেয়েটা বেশ বাধ্য। বিনা প্রতিবাদে খেলার ডালাটা আবার চৌকির তলায় ঠেলে দিয়ে নিয়ে আসে তার পড়ার বই। মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের সেই অনবদ্য লাল-মলাটের 'পেরথম ভাগ'। উনুনের ধারে বসে রান্না করতে করতে মেয়েকে পড়াতে থাকেন। সবেমাত্র অক্ষর পরিচয় হচ্ছে খুকুর। প্রতিদিনের মত বই খোলার আগে খুকু বাবু হয়ে বসে চোখ বুজে সরস্বতীর স্তবমন্ত্র মুখস্ত বলে যায়। এটা ওকে দিয়ে কণ্ঠস্থ করিয়েছেন। হাতা দিয়ে আলোচালের বোগনোটা নাড়তে নাড়তে পণ্ডিত বলেন, 'জিব্ ভায়াঙ্' নয় মা-মণি, বল 'জিহ্বায়াং'—বল: 'সা মে বসতু জিহ্বায়াং বীণা পুস্তকধারিণী।'

খুকু আপ্রাণ প্রচেষ্টায় বিশুদ্ধ উচ্চারণ করতে প্রয়াস পায়।

তারপর শুরু করে: অ-য় অজগর আসছে তেড়ে।

খুকুকে খাইয়ে-দাইয়ে এঁটো সাফ করে বোগনোটা মেজে রেখে মুখ-হাত ধুয়ে নিলেন পণ্ডিত। এতক্ষণে খেয়াল হল নিজের কথা। কী আশ্চর্য! সমস্ত সকালটা ওকথা একবারও মনে পড়েনি। তিনি কী খাবেন? একাদশীতে তিনি অন্নগ্রহণ করেন না—কিন্তু শশা, কলা, বাতাসা, মুগের ডাল ভিজে কিছুই তো ব্যবস্থা করেননি! প্রতিমা কখন একটু দুধ জ্বাল দিয়ে রাখত। বাজার থেকে কী কী আনতে হবে খুকুর মা-ই তা বলে দিত। শুধু বলে দিত নয়, ভুলো মানুষটাকে যাতে বারে বারে বাজারে দৌড় করতে না হয়, তাই একটা টুকরো কাগজে ফর্দ লিখে হাতে গুঁজে দিত। আজ সে নির্দেশ ছিল না। অন্যমনস্ক হয়ে একাধিকবার ফতুয়ার পকেটে হাত চালিয়ে সেই চিরকুটখানা খুঁজছেন—পরক্ষণেই মনে পড়ে গেছে, সে নির্দেশ আজ নেই। খুকুর কথাই মনে ছিল তাঁর। তাই ওর জন্য বিস্কুট পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন, অথচ নিজের জন্য কিছুই আনেননি।

একটু দুধ হলে সবচেয়ে ভাল হত। দুধ তো প্রতিনিদিনই থাকত বাড়িতে। যা কেউ খেত না। না পণ্ডিত, না পণ্ডিত-গিন্নী। কিন্তু খুকুকে দুধ খেতে দেখেছেন বহুবার। প্রাক-বিবাহজীবনে অর্ধ-সের করে দুধ তিনি রাখতেন, 'যুগী'-বলে একটা গোয়ালা তাঁকে রোজ সকালে দুধটা দিয়ে যেত। যুগীকে দীর্ঘ দিন দেখেননি, প্রতিমা নিশ্চয় যুগীকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু তার বদলে কোন গোয়ালাকে বহাল করেছিল? অনেক চিন্তা করেও কোন গোয়ালা দুধ দিয়ে যাচ্ছে এ ছবি মনে পড়ল না। হয়তো তিনি স্কুলে বেরিয়ে গেলে গোয়ালা দুধটা দিয়ে যেত।

প্রতিবেশীর জাপানী ঘড়িতে ঢং-ঢং করে দশটা বাজল। সওয়া দশটায় স্কুল বসে। স্কুল অবশ্য খুব কাছেই। হেঁটে যেতে দশ মিনিটও লাগে না পণ্ডিতের সারসের মত লম্বা লম্বা পায়ে। কাল রাত্রে কাতুপিসি আধকলসী জল এনেছিল; তার কিছুটা তখনও আছে। সেই বাসী জল ঢক-ঢক করে একঘটি খেয়ে ছাতাটা তুলে নিলেন কোণ থেকে। শীতের আমেজ এখনও আছে। ছাতার কোন প্রয়োজন নেই, বৃষ্টি হওয়ার কোন আশঙ্কা নেই; তবু নিত্য অভ্যাসবশে ছাতাটা তুলে নেন। ঘরে দুটি দরজা। একটি রাস্তার দিকে। দ্বিতীয়টা ভিতরের উঠানের দিকে যাবার পথ। পণ্ডিত বাইরে যাবার দরজাটা খোলাই রাখলেন। চুরি যাবার মত সম্পদ অবশ্য তেমন কিছু ঘরে নেই। তবু কাঁসার বাসন কয়েকটা আছে। দু-চারটে জামা, বিছানাও আছে। কিন্তু দুটি দরজা তাই বলে বন্ধ করে যাওয়া যায় না। তাহলে সমস্তটা দুপুর খুকুকে বন্দীজীবন যাপন করতে হয়। সেটা অমানুষিক অত্যাচার। স্থির করেন, যাবার সময় কাতুপিসিকে বলে যাবেন, ভিতর দিকের ঐ দরজাটা খোলা থাকল, একটু নজর রাখতে। ভিতরের ঐ দরজার উপর শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবের একটি ছবি ফ্রেমে বাঁধানো। এপাশের দেওয়ালে একটি দেওয়াল-পঞ্জিতে

ননীচোরা বালগোপালের ছবি। যুক্তকরে দুটি চিত্রকেই প্রণাম জানিয়ে বৃদ্ধ অস্ফুটে কী মন্ত্রোচ্চারণ করেন। তারপর চলতে গিয়েও ফিরে আসেন খুকুর কাছে। তাকে আদর করে বলেন, লক্ষ্মী হয়ে থাকবে, মা-মণি। দ্বারটা রুদ্ধ করে দাও। রাজপথে কদাচ যাবে না। তোমার কাতুদিদি তো সর্বদাই নিকটে থাকবেন, প্রয়োজনে তাঁর সাহায্য ভিক্ষা করবে।

মুলিবাঁশের ঝাঁপের দরজাটা টেনে দিয়ে উঠানে নেমে পড়েন। পাশাপাশি পাঁচ-সাতখানা খোলার চালা ঘিরে এই এক চিলতে একখণ্ড উঠান, তার একান্তে দরমা-ঘেরা একটি শৌচাগার, এজমালি সম্পত্তি সমস্ত বস্তীবাসীর, স্ত্রী এবং পুরুষের। পানীয় জল আনতে হয় রাস্তা থেকে। সেখানে সকাল থেকে লাইন পড়ে। পণ্ডিত পাশের দাওয়ায় উঠে পড়েন ঃ কাতুপিসি আছ নাকি?

কাত্যায়নীর সাড়া পাওয়া গেল না। ঝাঁপের ওপাশ থেকে মাথায় ঘোমটা টেনে একটি বধূ তার খনখনে কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব মোলায়েম করে বলে, মা সেই সাতসকালে কালীঘাটের মন্দিরে গেইছে!

—অ! তা বৌমা, খুকু একাকী থাকল। প্রাঙ্গণের দিকে নির্গমন-দ্বারটা উন্মুক্ত রেখে গেলাম! একটু দৃষ্টি রেখ। গোপাল-নেপালদের দেখছি না যে?

—অরা ফ্যাক্‌টরী গেইছে।

তা বটে। ভোরে উঠেই দু' ভাই বেরিয়ে যায় কারখানার কাজে। টালিগঞ্জের ওদিকে কী-একটা ইলেকট্রিক-ফ্যান তৈয়ারী কারখানায় তারা কাজ করে। সারাদিন বাড়ির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই। সন্ধ্যার পর কালীতারা কেবিনে গিয়ে বসে দু' ভাই। মধ্যরাত্রে টলতে টলতে বাড়ি ফেরে। এ বধূটি গোপাল অথবা নেপালের, কার স্ত্রী, ঠিকমত জানেন না। দুটি বধূই প্রায় সমবয়সী। তাদের দু'জনকেই ও বাড়ির বাসিন্দা বলে সনাক্ত করতে পারেন, কিন্তু কোন্‌টি কার স্ত্রী সে খবর ঠিক জানেন না।

—বড়ু আর ছোটনকেও দেখছি না যে—

—কা জানি কোথায় গেইছে!

—যাই হোক, খুকু সম্পূর্ণ একাকী থাকল। আমি বিদ্যালয়ে যাচ্ছি। একটু দৃষ্টি রেখ মা।

ঘরের ভিতর ঘোমটাসমেত গোপাল অথবা নেপালের স্ত্রীর মাথাটা নড়ল।

—বাসুদেব! তুমিই সত্য!

হন্‌হন্‌ করে এগিয়ে চলেন চেতলা স্কুলের থার্ড-পণ্ডিত তাঁর কর্মস্থলের দিকে।

সারাটা দিন বারে বারে খুকুর কথাই মনে পড়েছে। অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন বারে বারে। কৃৎ-তদ্ধিৎ সন্ধি-সমাসের অরণ্যে বারে বারে ঝাঁকড়া-

ভুল একটি শিশুর মুখ ভেসে উঠেছে মানসপটে। পাড়ার কেউ স্ত্রী-বিয়োগে তাঁকে সহানুভূতি জানাতে আসেনি, কিন্তু স্কুলে খবরটা জানাজানি হওয়া মাত্র অনেকেই সহানুভূতি দেখালেন, সমবেদনার কথা শোনালেন। টিচার্সরুমে সেদিন শুধু এই আলোচনাই হল। ইতিহাসের শিক্ষক অনন্তবাবু জানতে চাইলেন, শেষ সময় পণ্ডিত-গৃহিণীর কোন কষ্ট হয়েছিল কিনা। পণ্ডিত জানালেন, না, কোন যন্ত্রণাবোধ তাঁর ছিল না ; প্রায় শেষ সময় পর্যন্ত জ্ঞান ছিল তাঁর। কথাও বলেছিলেন স্পষ্ট। ড্রইং মাস্টারমশাই বলেন, মেয়েটিকে আপনার শ্বশুরবাড়িতে রেখে আসুন বরং, এখানে কেমন করে মানুষ করে তুলবেন এতটুকু বাচ্চাকে ?

ম্লান হেসে পণ্ডিত বলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে সে স্থানেও কেহই নাই।

মৌলভীসাহেব দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বলেন, খোদাতালার মর্জি কখনো বুঝা যায় না। ঐটুকু শিশুকে কেনই বা তিনি আনলেন এই দুনিয়ায়, আর যদি আনলেনই তবে এভাবে মাতৃহীন করলেন কেন ?

সেকথার কেউ জবাব দেয় না।

হেডমাস্টারমশাই বলেন, আজ না এলেই পারতেন—

পণ্ডিত কুণ্ঠিতস্বরে বলেন, কর্মহীন অবস্থায় গৃহে অবস্থান করেই বা কী লাভ হত ? আজ না হলে, আগামীকাল তো আসতেই হত—

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে হেডমাস্টার জগদানন্দবাবুর।

ছাত্রমহলেও সংবাদটা রটে গেছে। যে ঘরে ক্লাস নিতে গেলেন, ছেলেদের মুখে একটা শান্ত সমবেদনার ছাপ লক্ষ্য করলেন। অন্যান্য দিন যেসব দুষ্টামি লক্ষ্য করেন, আজ তার চিহ্নমাত্র নেই। মৃত্যুর এমনই মহিমা! প্রাণচঞ্চল কিশোর ও বালকগুলি পর্যন্ত মূক হয়ে গেছে। উঁচু ক্লাসেও একটা পাঠ ছিল। এ ক্লাসের ছাত্রেরা কিছু বড়। একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আজ আর পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না স্যার! আপনিও অত্যন্ত ক্লান্ত, আজ বরং আপনি দু-একটা ভাল উপদেশ দিন।

পণ্ডিতমশাইয়ের চোখটা ছল ছল করে ওঠে, তবু সে ভাব গোপন করে বলেন, কিন্তু তোমাদের পাঠ্যসূচীর বহির্ভূত এসব আলোচনায়—

ছেলেটির একটি পূর্ব-প্রসঙ্গ মনে পড়ে যায়, সলজ্জে বলে, আজ আর সেসব কথা বলবেন না স্যার! আমরা অন্যায় করেছিলাম। আমাদের মার্জনা করবেন।

এত দুঃখেও অমলিন হাসি ফুটে ওঠে পণ্ডিতের মুখে।

এর পিছনে একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে—

প্রশান্ত পণ্ডিতের একটা নিয়ম ছিল, প্রতিদিন ক্লাস শুরু হবার আগে একটি সংস্কৃত প্রার্থনা-মন্ত্র শোনানো। তিনি মন্ত্রটি উচ্চারণ করতেন, ছেলেরাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বলত। শ্লোকটির ব্যাখ্যা করে দিতেন তিনি। তারপর পাঠ্যসূচীতে

মনোনিবেশ করতেন। ছেলেরা আড়ালে বলত, এও পাষণ্ড-পণ্ডিতের একটা ভড়ং। একবার পণ্ডিতের উপর খেপে গিয়ে হঠাৎ ছেলেরা বিদ্রোহ করে বসল। এই ক্লাসেরই ছেলেরা। ওসব বুজরুকি চলবে না। মাইনে দিয়ে তারা সংস্কৃত পড়তে ক্লাসে এসেছে, বোর্ড-অফ-সেকেণ্ডারি এডুকেশন ছক কেটে দিয়েছে, তার বাইরে ওরা এসব 'অং-বং' শুনতে রাজী নয়। পণ্ডিতের সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ায় ছেলেরা দল বেঁধে হেডমাস্টার জগদানন্দবাবুর কাছে গিয়ে দরবার করেছিল। হেডমাস্টার আজকালকার ছেলেদের চেনেন। এখনই চেয়ার-টেবিল ভাঙা শুরু হয়ে যাবে। তাই ছাত্রদের এককথায় হাঁকিয়ে না দিয়ে বললেন, কিন্তু কাজটা তো খারাপ কিছু নয়, তোমাদের এত আপত্তিই বা কেন?

—এগুলো সব স্যার হিন্দু-শাস্ত্রের মন্ত্র। ভারতবর্ষ সেকুলার স্টেট স্যার। আপনি যদি এসব বন্ধ না করেন, আমরা ডি. পি. আই-কে লিখব। আমরা ধর্মঘট করব।

জগদানন্দবাবু ব্যাপার বেগতিক বুঝে থার্ড-পণ্ডিত প্রশান্ত ভট্টাচার্যকে ডেকে পাঠালেন। পণ্ডিতমশাই হাজির হওয়ায় বলেন, এই শুনুন ছেলেরা কী বলছে; আপনি ঐ প্রার্থনা-মন্ত্র বন্ধ না করলে ওরা ধর্মঘট করবে।

পণ্ডিত বলেছিলেন: একটু ব্যাকরণের অসঙ্গতি হচ্ছে। ধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মঘট হতে পারে না, 'অধর্মঘট' বলুন! তা, প্রার্থনা-মন্ত্রের অপরাধ?

একটি দুঃসাহসী ছেলে পুনরায় তার যুক্তি পেশ করেছিল: এগুলো হচ্ছে হিন্দু-শাস্ত্রের মন্ত্র। ভারতবর্ষ সেকুলার স্টেট, মানে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে আপনি যদি হিন্দুধর্ম থেকে প্রার্থনামন্ত্র শোনান তবে মুসলমান ছেলেরা কোরাণের মন্ত্র শুনতে চাইবে, ক্রিস্চিয়ানরা বাইবেল থেকে শুনতে চাইবে। বৌদ্ধরা ত্রিপিষ্টক থেকে শুনতে চাইবে। বাধা দিয়ে পণ্ডিত বলেছিলেন: অশ্বঘোষ আর বসুমিত্র বৌদ্ধ-শাস্ত্রের যে সংকলন রচনা করেছিলেন তার নাম ত্রিপিটক, ত্রিপিষ্টক নয়। ত্রিপিষ্টক শব্দের অর্থ তিন-পিঠে।

—বেশ, তাই হল; তারা ত্রিপিটক থেকে শুনতে চাইবে—

পণ্ডিতমশাই বলেন, উত্তম। তোমরা তো দশম শ্রেণীর ছাত্র। তোমাদের মধ্যে অ-হিন্দু ক'জন ছাত্র আমার সংস্কৃত পাঠ নিতে আস?

ছেলেটি জবাব দেয় না।

পণ্ডিতমশাই ছেলেটির পিছনে ভিড় করে দাঁড়ানো ছেলেদের উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমাদের মধ্যে বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান-মুসলমান-জাওসে-কনফুসিয়াস্ কিম্বা চার্বাকপন্থী যদি কেউ থাক তো হাত তোল।

ছেলেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

পণ্ডিত তখন অগ্রগামী ছেলেটিকে বলেন, তোমার যুক্তি বাস্তব অবস্থার পরিপন্থী। আমি জানি, তোমাদের শ্রেণীতে একটিও অ-হিন্দু ছাত্র নেই।

কিন্তু যুক্তির কখনও অভাব হয় না। অত সহজে হার মানেনি ওরা। সঙ্গে সঙ্গে তার পাশের ছেলেটি বলে উঠেছিল, শ্লোক-ফ্লোক তো আমাদের সিলেবাসে নেই। এভাবে প্রত্যেকটি পিরিয়ডে আপনি পাঁচ মিনিট সময় নষ্ট করেন। হপ্তায় আপনার চারটে ক্লাস, ফলে, পার উইক আমাদের বিশ মিনিট করে নষ্ট হচ্ছে।

প্রশান্ত পণ্ডিত বলেছিলেন, তোমার যুক্তিটি কিন্তু অকাট্য!

হেডমাস্টারমশাই বলেন, তাহলে?

জগদানন্দবাবুকে কোন জবাব না দিয়ে পণ্ডিত ছেলেদের বলেছিলেন, আমার মনে হচ্ছে প্রার্থনা-মন্ত্রে তোমাদের আসলে আপত্তি নাই, সময়টা নষ্ট হচ্ছে বলেই তোমরা ওই প্রতিবাদ জানাচ্ছ, তাই না!

ফল ধরেছে দেখে ছেলেটি খুশি হয়ে বলে, তা তো বটেই! ভাল ভাল উপদেশই তো দেন আপনি; কিন্তু কী করব বলুন! পরীক্ষা তো আমাদের পাশ করতে হবে। তাই ওগুলো বাদ দিতে বলছি—

পণ্ডিত এতক্ষণে জগদানন্দবাবুর দিকে ফিরে বলেন, এরা যা বলছে তা যুক্তিপূর্ণ কথা। তার প্রতিবিধান আমি করব। ছাত্রদের ঐ অর্ধঘণ্টা সময়কাল আমি বিনষ্ট করতে চাই না, সে আমি ন্যায়তঃ ধর্মতঃ পারিও না। উহাদের শনিবারের শেষ ক্লাসটা আমিই নিই। আমার প্রস্তাব, অতঃপর প্রতি শনিবার আড়াই ঘটিকার পরিবর্তে তিন ঘটিকায় ছাত্রদের ছুটি দেব আমি। অর্ধঘণ্টা কাল বেশি পড়িয়ে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব।

জগদানন্দবাবু হেসে বলেন, এ প্রস্তাবে আমার আপত্তি নেই। আপনি ঐ অর্ধঘণ্টাকালের জন্য যখন অতিরিক্ত পারিশ্রমিক চাইছেন না, আর ছাত্ররাও তাদের দাবি আদায় করিয়ে আরও আধ ঘণ্টা—

বুদ্ধিমান ছেলেটি বুঝে নেয় কী সর্বনাশ হতে বসেছে। জগদানন্দবাবুকে মাঝ পথেই থামিয়ে দিয়ে বলে, না না, স্যার! পণ্ডিতমশাই প্রায়শ্চিত্ত-টিত্ত কী সব বলছেন! পণ্ডিতমশাই দেবতুল্য মানুষ, তিনি কোন পাপই করতে পারেন না। না না, প্রায়শ্চিত্তের কথা যখন একবার উঠেছে তখন শনিবারে আমরা কিছুতেই বেশিক্ষণ থাকব না; তা নিন, পণ্ডিতমশাই প্রার্থনা-মন্ত্রের জন্য কিছু সময় নিন না! কাজটা তো ভালোই। আচ্ছা, আমরা আসি স্যার!

সেই বেদনাদায়ক ঘটনার ইঙ্গিতই করেছিলেন প্রশান্ত পণ্ডিত।

আর ছেলেটি সেইজন্যই আজকের দিনে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল, আজ আর সেসব কথা বলবেন না, স্যার। আমরা অন্যায় করেছিলাম, আমাদের মার্জনা করবেন।

গুরুপত্নীর মৃত্যুতে আর কিভাবে তাঁকে সান্ত্বনা জানাতে পারে? কোন সহানুভূতির কথাই এ ক্ষেত্রে শোভন শোনাবে না; ওরা তাই পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে আজ কিছু উপদেশ শুনতে চায়; জানে, এতেই মনটা শান্ত হবে বৃদ্ধের।

পণ্ডিত মৃত্যুর কথাই বললেন। যম এবং নচিকেতা সংবাদ। যমের কাছ থেকে নচিকেতা মৃত্যুরহস্য জানতে চাইছে। শ্লোকের পর শ্লোক আউড়ে অন্বয় করে, ব্যাখ্যা করে মৃত্যুরহস্যকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে থাকেন। ঘণ্টা কোথা দিয়ে পার হয়ে গেল। মুখে বলেনি, কিন্তু এক ক্লাস ছেলের নিষ্পলক দৃষ্টির মাধ্যমেই পণ্ডিত শুনলেন সেই প্রার্থনা-মন্ত্র : অবতু মাম, অবতু বক্তারম্!

—হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে করুণা কর, আমাদের গুরুদেবকেও করুণা কর!

ক্লাস থেকে বেরিয়ে এলেন যখন, তখন অত্যন্ত দুর্বল লাগছে শরীর। গতকাল নিরম্বু উপবাস গেছে, আহারের কথা গতকাল মনেও পড়েনি। আজ অবশ্য মনে পড়েছিল, কিন্তু অসময়ে। আজ এই পড়ন্ত বেলা পর্যন্ত মুখে কিছু পড়েনি। রাত্রে ভাল ঘুমও হয়নি। মাথাটা ধরেছে। এমন আধকপালে মাথাধরায় আজকাল প্রায়ই কষ্ট পান। বুঝতে পারেন, বয়সটা বাড়ছে। শরীর আর কৃচ্ছ্রসাধনের অত্যাচার বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে রাজী নয়।

চন্দ্রকান্তবাবুর লক্ষ্য হল টিচার্স রুমের একান্তে কপালের রগ দুটো টিপে ধরে একটা হাতলভাঙা চেয়ারে বসে আছেন পণ্ডিতমশাই। তাঁর আরও একটি পিরিয়ড ক্লাস নিতে বাকি আছে। শেষ ঘণ্টায় চন্দ্রবাবুর ক্লাস ছিল না। বই খাতাপত্র গুছিয়ে উনি বাড়ি যাবার উদ্যোগ করেছিলেন। ঢং-ঢং করে শেষ পিরিয়ডের ঘণ্টা বাজতেই সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ান প্রশান্তবাবু। চন্দ্রকান্তবাবু এগিয়ে এসে ওঁর কাঁধে একখানা হাত রেখে বলেন : শরীরটা কি ভাল লাগছে না, পণ্ডিতমশাই?

ম্লান হেসে প্রশান্ত পণ্ডিত বলেন, না চন্দ্রকান্তবাবু, দেহে কোন বিকার নাই, শুধু কন্যাটির জন্য কিছু চিত্তচাঞ্চল্য বোধ করছি, সম্পূর্ণ একাকী আছে কিনা—

—তার মানে? আর কেউ নেই বাড়িতে?

—আজ্ঞে না।

—দরজা বন্ধ করে রেখে এসেছেন নাকি?

—আজ্ঞে না, দ্বার উন্মুক্তই রেখে এসেছি।

চন্দ্রবাবু চমকে ওঠেন : বলেন কী! পাড়া-প্রতিবেশীদের কারও জিম্মায় ওকে রেখে ঘরে তালা দিয়ে আসা উচিত ছিল আপনার। দিনকাল খারাপ, সমস্ত চুরি হয়ে যেতে পারে যে—

—আমার গৃহে আর কী সম্পদ আছে, বলুন?

ধমকে ওঠেন চন্দ্রবাবু : আরে মেয়েটাকে তো চুরি করে নিয়ে যেতে পারে! পাশেই তো মাতালের আড্ডা।

—মা-মণিকে? আকাশ থেকে পড়েন পণ্ডিত।

—কেন? ছোট মেয়ে চুরি যায় কলকাতা শহরে, একথা কখনও শোনেননি?

পণ্ডিত জবাব দিতে পারেন না। চন্দ্রবাবু বুঝতে পারেন, একথা শোনার পর ঐ সরল মানুষটির পক্ষে ক্লাস নেওয়া সম্ভবপর নয়। পণ্ডিতের পিঠে আবার একখানা হাত রেখে বলেন, ও বি, ওভাবে বসে পড়লেন কেন? যান, বাড়ি যান, আপনার ক্লাসটা আমিই নিচ্ছি। সেভেন-বি তো?

পণ্ডিত উদ্‌ভ্রান্তের মত মাথাটা একবার নাড়িয়েই চশমাটা নাকে চড়ান, কোণ থেকে ছাতিটাকেও নিতে ভুলে যান—চন্দ্রবাবুকে ধন্যবাদ জানানো তো দূরের কথা, বকের মত লম্বা-লম্বা ঠ্যাঙ ফেলে তিনি হন্‌হনিয়ে প্রায় ছুটেই চলেন বাড়ির দিকে। চন্দ্রবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, বৃদ্ধের কপালে এখনও অনেক দুঃখ আছে।

অক্ষয়বাবু বলেন, ছেলেদের দোষ দেব কী? লোকটা সত্যিই পাষণ্ড। বেয়াল্লিশ বছর বয়সে তোর কী দরকার ছিল অমন একটা কচি বউ ঘরে আনার?

ক্ষেত্রবাবু বলেন, মুনিদেরও মতিভ্রম হয় অক্ষয়বাবু, এ তো পাষণ্ড!

কিন্তু না, প্রশান্ত পণ্ডিত সেকথা মনে করেন না। মতিভ্রম তাঁর হয়নি। মানব জীবনে ষড়রিপুর প্রভাব অনস্বীকার্য; কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রামকে স্ববশে রাখার সাধনা তাঁর আকৈশোরের। বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। তিনি অবশ্য নিজেকে স্থিতপ্রজ্ঞ মনে করেন না। দুঃখে মন উদ্‌বিগ্ন হয়, সুখেও সম্পূর্ণ বিগতস্পৃহ নন তিনি। কিন্তু তাই বলে প্রতিমাকে বিবাহ করতে যাওয়ার মূলে কোন 'মতিভ্রম' ছিল না তাঁর। সে প্রেরণার মূলে ছিল না আদি রিপুর নির্দেশ। কৈশোরের প্রথমেই তিনি মাতৃপিতৃহীন। সহোদর বা সহোদরা ছিল না তাঁর। স্নেহ-প্রেম-ভালবাসার স্পর্শে ধন্য হয়ে উঠবার সুযোগ তিনি পাননি জীবনের আদি পর্বে। অধ্যয়ন-অধ্যাপন-যজন-যাজন। ঊষর একটি মরুভূমি অতিক্রম করে তিনি এসে উপনীত হয়েছিলেন যৌবনের শেষপ্রান্তে। প্রায় প্রৌঢ় তখন তিনি। চুলে পাক ধরতে শুরু করেছে। দেহযষ্টি কিন্তু দৃঢ় আছে তখনও। কালীঘাটের ঐ এক-কামরা ঘরে দশ-বারো বছর স্বপাক রন্ধনে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। একাহারী ছিলেন বরাবর। এক-বেলাই অন্নপাক করতেন। সন্ধ্যার পর ফলমূল মিষ্টান্নে ছিল ক্ষুন্নিবৃত্তির আয়োজন। মনে আছে, এই সময় একদিন পিতৃদেবের বাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিন গীতাপাঠের অবকাশে একটি শ্লোকে হঠাৎ আটকে গিয়েছিলেন: 'পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ'। অর্থাৎ শ্রাদ্ধতর্পণাদি ক্রিয়া লুপ্ত হলে পিতৃ-পুরুষগণ নরকে পতিত হন।

বহুবার এ শ্লোকটি পড়েছেন, কিন্তু এভাবে মনে দাগ কাটেনি। ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সেটাকে যাচাই করে দেখেননি। আজ হঠাৎ কেমন যেন বিচলিত বোধ করেন। গীতা বন্ধ করে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ছিলেন। পরম পূজনীয় পিতৃদেব গদাধর তর্করত্ন এবং মহামহোপাধ্যায় পিতামহ সুদর্শন

তর্কপঞ্চাননকে মনশ্চক্ষে দেখতে পেলেন। তাঁর নিজের মৃত্যুর পর এঁদের কী গতি হবে?

সমস্ত দিন ঐ চিত্তচাঞ্চল্যটা দূরীভূত হয়নি। সে-রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন পিতৃপুরুষদের। দেখলেন, সুমেরু পর্বত থেকে তাঁরা সকলে অতল গহ্বরে পড়ে যাচ্ছেন—আর হাত বাড়িয়ে অধঃস্তন পুরুষ প্রশান্তকুমারকে রক্ষা করতে বলছেন। নিদ্রাভঙ্গে দেখলেন, সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে। আশ্চর্য, শুধু সে-রাত্রেই নয়, পরদিনও আবার ঐ একই স্বপ্ন দেখলেন।

অস্থির হয়ে উঠেছিলেন প্রশান্তকুমার। নিরুপায় হয়ে অকপটে সমস্ত কথা স্বীকার করলেন চন্দ্রবাবুর কাছে। নিজ চিত্তচাঞ্চল্যের কথা, স্বপ্নদর্শনের কথা। চন্দ্রকান্তবাবু ইংরাজির শিক্ষক, নব্যপণ্ডিত। তবু একমাত্র তাঁর কাছেই মাঝে মাঝে মনের কথা বলতেন প্রশান্ত পণ্ডিত। সব শুনে চন্দ্রবাবু বিচিত্র হেসে বলেছিলেন, বয়স কত হল আপনার?

পণ্ডিত মনে মনে হিসাব করে বলেছিলেন, আগামী সীতা নবমীর পরের দশমীতে দ্বা-চল্লিশ বৎসর হবে।

চন্দ্রবাবু পুনরায় হেসে বলেছিলেন, দ্বা-চল্লিশ? তবে আর কী? আপনি কোন চিন্তা করবেন না। এ রোগের ঔষধ আমার জানা। আমার পরিচিতা একটি সর্বগুণান্বিতা কন্যা আছেন। তাঁর বয়সও আন্দাজ দ্বা-বিংশতি। আপনারই পালটি ঘর, নৈকষ্য কুলীন। কী গোত্র আপনার? ভরদ্বাজ তো?

পণ্ডিত গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, আপনি কি পরিহাস করছেন?

—পরিহাস! যেখানে পিতৃপুরুষগণ 'ইনভল্‌ভড', সেখানে কি কেউ পরিহাস করে মশাই?

—কিন্তু এই বয়সে—

—কিসের বয়স মশাই? দ্বা-চল্লিশ মাইনাস দ্বা-বিংশতি ইসুক্যালটু বিংশতি। ও তো নস্যি? শতাব্দীর পঞ্চমাংশ! এর চেয়ে অনেক বেশি বয়সের ফারাক ম্যানেজ করেছেন আপনার পূর্বপুরুষরা। আপনি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করবেন না। পাত্রীর পিতাকে আমি বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে চিনতাম। তিনিও পণ্ডিত বংশের সন্তান। ভদ্রলোক মারা গিয়েছেন আজ বছরপাঁচেক। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবার। তাঁর স্ত্রী তাঁর পূর্বেই গত হয়েছেন। কন্যাটি বর্তমানে তার ভাইয়ের গলগ্রহ। ভাই সামান্য কেরানী। এদিকে কৌলিন্যের দেমাকটা আছে। ফলে, ভগ্নীটিকে পাত্রস্থ করতে পারেনি। ভাইয়ের বউ আবার একটি খাণ্ডার! তার সংসারে দাসীবৃত্তি করেও মেয়েটি প্রতিনিয়ত নিগ্রহ সহ্য করে চলেছে। শাঁখা-সিঁদুর ছাড়া আর কিছুই দিতে পারবে না অবশ্য—

বাধা দিয়ে পণ্ডিত বলেছিলেন, না না, দানের কোন প্রশ্নই উঠছে না। বিবাহ যদি আদৌ করি তাহলে প্রতিগ্রহ কিছু গ্রহণ করব না আমি। সেকথা নয়, আমি ভাবছিলাম—

—আর তাহলে ভাবনার কিছু নেই পণ্ডিতমশাই। এ প্রজাপতির নির্বন্ধ। ছেলেটি আমাকে কাকা বলে, এই ক'দিন আগেই সে আমাকে একটি পাত্রের সন্ধান করতে বলেছে; আর আজ আপনি বলছেন স্বপ্নমঙ্গলের কথা। আমি বলছি, আপনি এখানেই বিবাহ করুন। মেয়েটি অত্যন্ত শান্তস্বভাবা। দেবদ্বিজে তার অচলাভক্তি। আপনার অযত্ন হবে না। তাছাড়া, আমার ভয় হয়, তার আশু বিবাহের বন্দোবস্ত না করতে পারলে, ভ্রাতৃবধূর গঞ্জনাতে মেয়েটি না শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী হয়ে পড়ে।

—বলেন কী। এ যে নিদারুণ সংবাদ।

—নিদারুণ বলে নিদারুণ। একেবারে মর্মবিদারকভাবে নিদারুণ! সব কথাই আপনাকে খুলে বললাম মশাই। এরপর মেয়েটি যদি আত্মহত্যা করে, তবে সে স্ত্রী-হত্যার পাপ আপনাতে বর্তাবে কিনা সে আপনি মনুসংহিতা ঘেঁটে দেখবেন, আমার কিছু বলার নেই—

আতঙ্কতাড়িত পণ্ডিত বলেছিলেন: এ কী দুশ্চিন্তায় আমাকে ফেললেন চন্দ্রকান্তবাবু!

—দুশ্চিন্তা কিসের মশাই? আপনার দুশ্চিন্তা বরং ঘুচিয়ে দিলাম আমি। কোথায় আমাকে মিষ্টিমুখ করাবেন, তা নয়, ধমক দিচ্ছেন। আপনার ইতস্ততঃ করার কী আছে? আপনি কি দণ্ডী সন্ন্যাসী? আপনি তো গৃহীই। রসিকতা নয় পণ্ডিতমশাই, খাঁটি কথা বলছি, এখনও সময় আছে। এর পর কিন্তু পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধতর্পণাদির কোন ব্যবস্থাই আপনি করে উঠতে পারবেন না।

পণ্ডিত আর আপত্তি করেননি। চন্দ্রবাবু একটা ছুটির দিনে পণ্ডিতমশাইকে পাত্রী দেখাবার জন্য নিয়ে যাবার আয়োজন করলেন, বললেন, আপনি নিজে ঘরদোর বংশ-পরিচয় দেখে নিন। শেষকালে আমাকে দায়ী করবেন না।

পণ্ডিত শশব্যস্তে বলেন, না না, সে কী?

—'না না, সে কী' নয়। এ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আপনি নিজে পাত্রী দেখতে না গেলে আমি এ বিয়েতে নেই।

পণ্ডিত একটু চিন্তা করে বলেছিলেন, উত্তম প্রস্তাব; আমি পাত্রীর জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার ভদ্রাসনে যাব, প্রারম্ভিক কথাবার্তা বলতেই যাব, কিন্তু এক সর্তে—

—কী সর্ত বলুন?

—পাত্রী আমার সম্মুখে আবির্ভূতা হবেন না।

—সে আবার কী মশাই? আপনি তো মেয়ে দেখতেই যাচ্ছেন! মেয়ে যদি আপনার সম্মুখে 'আবির্ভূতাই' না হন, তবে তো ঘরে বসেই মনশ্চক্ষে তাঁকে আপনি প্রত্যক্ষ করতে পারেন!

প্রশান্ত পণ্ডিত বলেছিলেন, আপনার একটি ভ্রান্তি হচ্ছে চন্দ্রকান্তবাবু। আমি সেই কন্যাকে দেখতে যাচ্ছি না, আমি নিজেকে প্রদর্শিত করতে যাচ্ছি।

তাঁরা আমাকে দেখুন, এবং আমি আশা করব অন্তরাল থেকে কন্যাকেও তাঁরা দেখবার সুযোগ দেবেন। আমার বয়স, আমার আকৃতি—তারপর একটু হেসে যোগ করেছিলেন, আমার অর্কফলাটি তাঁরা প্রত্যক্ষ করুন। বিবাহ যাঁকে করি নাই, তিনি আমার জননী। তাঁর দিকে আমি ঐভাবে দৃষ্টিপাত করতে পারব না। আপনি আমাকে মার্জনা করবেন।

পাষণ্ড-পণ্ডিতের কাঁচা-পাকা কদমছাঁট চুল, শিখা, খড়্গনাসা সত্ত্বেও পাত্রী-পক্ষ থেকে কোন আপত্তি উঠল না। পণ্ডিত তাঁর গৃহলক্ষ্মী প্রতিমাকে নিয়ে এসে তুলেছিলেন তাঁর সেই কালীঘাটের এক-কামরার সংসারে। প্রতিবেশীরা উঁকি-ঝুঁকি মেরেছিল, কৌতূহলী হয়েছিল। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যার এ রঙ্গে বস্তীবাসীরা কিছুদিনের জন্য আলোচনার একটা বিষয়বস্তু পেয়েছিল মাত্র। তার বেশি কিছু নয়। ক্রমে তাও গা-সওয়া হয়ে এল সকলের। সে আজ সাত বছর আগের কথা।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে অদ্ভুতভাবে বদলে গিয়েছিল ঐ এক-কামরা সংসারটার প্রকৃতি। ঐ এক-কামরাবাসীর জীবন। পণ্ডিত সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেছিলেন তাঁর জীবনসঙ্গিনীর উপর। নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন সাংসারিক বিষয়ে। কলের পুতুলের মত কাজ করে যেত প্রতিমা। কোথা থেকে কী করত, কাকে ধরে রেশন আনাত, কেমন করে সংসার চালাত কিছুই খবর রাখতেন না পণ্ডিত। মাসান্তে মাহিনার টাকা, টিউশানির টাকাটা ওর শাঁখা-সর্বস্ব হাতে ফেলে দিয়ে এবং প্রত্যহ সকালে ফর্দ অনুযায়ী বাজারটা এনে দিয়েই তিনি মুক্ত হতেন। এতদিন যে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়েছিলেন তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে জীবনযাত্রা শুরু হল তাঁর। তাতে অসুবিধা তো কিছু অনুভব করেনইনি, বরং আরাম পেয়েছিলেন। অধ্যয়ন, পূজা আর জ্ঞানচর্চায় পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করতে পেরেছিলেন। মাঝে মাঝে অবশ্য স্ত্রীর নির্দেশমত এখানে-ওখানে যেতে হত। এটা-ওটা কিনে আনতেন, চুলকাটার দোকানে যেতেন—নির্দেশমত কাজটুকু পালন করে ভাঙানি পয়সা ওর হাতে সমর্পণ করে আবার তাঁর গ্রন্থের সমুদ্রে তলিয়ে যেতেন।

তবু বাসগৃহ আর আহার্যের আয়োজনই দাম্পত্য-জীবনের সব কিছু নয়। তার বাইরেও স্ত্রীর একটি ভূমিকা থাকে। এ বিষয়ে পণ্ডিতের অভিজ্ঞতা অল্প। তাই প্রতিমাকে তিনি বুঝে উঠতে পারেননি। প্রতিমা কি সুখী হয়েছিল? কোনদিন তাকে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাননি। কোনদিন, ঐ যে কী বলে, 'সিনেমা', তা সেই সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাননি। দু-একবার দুর্গাপূজা অথবা কালীপূজার মণ্ডপে সস্ত্রীক গিয়েছেন অবশ্য। ব্যস, তার বেশি নয়। প্রতিবেশিনীদের সঙ্গেও কোনদিন প্রতিমাকে ঘনিষ্ঠ হতে দেখেননি। তাদের সঙ্গে দল বেঁধে কোথাও যেতে দেখেননি। উদয়াস্ত মেয়েটি শুধু সংসারের কাজ করে যেত। পণ্ডিত মাঝে মাঝে বলতেন, আমার ওসব ভাল

লাগে না, কিন্তু তুমি তো ওই নেপাল-গোপালদের স্ত্রীদের সমভিব্যহারে ওখানে যেতে পার।

অবাক দুটি চোখের দৃষ্টি মেলে প্রতিমা বলেছিল, কোথায়?

—ঐ যে কী বল তোমরা, সিনেমায়।

প্রতিমা হয়তো মুখ টিপে হেসে বলত, আজ হঠাৎ আপনার সিনেমার কথা মনে হল যে? আমি কোনদিন ওকথা বলেছি?

—বল না বলেই তো বলছি।

—আমার ওসব ভাল লাগে না।

প্রশান্ত পণ্ডিত যে স্তরের মানুষ তাতে প্রতিমা যে তাঁর নাগাল পাবে না, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেখানেই তো এর শেষ নয়। স্মার্ত পণ্ডিত প্রশান্ত ভট্টাচার্যও ঐ অল্পশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়েটির মনের নাগাল পাননি। সে কী চায়, সে কী ভাবে? সে কি সুখী? প্রশ্ন করেছেন খোলাখুলি। হেসে এড়িয়ে গেছে প্রতিমা।

না, প্রতিমার অন্তস্তল পর্যন্ত দৃষ্টি যায়নি পণ্ডিতের। দুজনের সম্পর্ক যেন স্বামী-স্ত্রীর নয়, গুরু-শিষ্যার। না, তাও নয়, স্ত্রীকে কোন বিদ্যাদান করতে বসতেন না তিনি। প্রতিমাও কোনদিন এসে বলেনি, যেনাহম্ নামৃতাস্যাম্ তেনাহম্ কিম কুর্যাম্? সে শুধু নিরলস সেবায় পরিচর্যা করে গেছে তার স্বামীকে; কোন প্রতিদান চায়নি—উন্মুখ উদার আগ্রহে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েই যেন তার তৃপ্তি।

তাই বলে স মূর্খ ছিল না। শাস্ত্রজ্ঞান না থাকলেও তত্ত্বজ্ঞান তার ছিল। মনে আছে, একদিন প্রশান্ত পণ্ডিত রহস্য করে বলেছিলেন, তুমি যে দিবারাত্র শুধু এই সংসারের জন্য প্রাণপাত করে যাচ্ছ, জপ-তপ-পূজা-আহ্নিক কিছুই করছ না, এর কী পরিণাম হবে জান?

কাজলকালো দৃষ্টি মেলে প্রতিমা প্রশ্ন করেছিল, কী?

—মৃত্যুর পর আমরা দুজনে একস্থানে থাকতে পারব না। আমার পূজা-অর্চনার প্রভাবে আমার যেখানে স্থাননির্দেশ হবে, তোমাকে সেখানে প্রবেশাধিকার দেবে না যমদূতেরা। বলবে, এ ব্রাহ্মণী তো নিত্যপূজাই করত না—

সেই একদিনই পণ্ডিত দেখেছিলেন প্রতিমার তেজোদৃপ্ত ভঙ্গিমা। ঘুরে দাঁড়িয়ে সে বলেছিল, বেশ, আমিও দেখে নেব সে কত বড় যমদূত। আমাকে আপনার কাছে যেতে না দেওয়ার ক্ষমতা যমদূতের আছে কিনা দেখে নেব আমি!

পণ্ডিত তখন রসিকতা করে বলেন, দৈহিক ক্ষমতায় তুমি যমদূতকে পরাস্ত করতে পারবে?

—গায়ের জোরে কেন? তপস্যার পুণ্যফলে তাকে শায়েস্তা করব আমি। স্বামীসেবায় আমি তো কোন অবহেলা করিনি! যমদূতের যদি প্রাণের মায়া থাকে, তবে সে আমার ত্রিসীমানায় আসবে না।

যমদূতের প্রাণের মায়া থাকে কিনা এ তথ্য জানা ছিল না স্মার্ত পণ্ডিতের। কিন্তু তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন প্রতিমার আত্মবিশ্বাস দেখে। এমন কথা, অমন দৃপ্তভঙ্গিতে যে ঐ কোমলস্বভাবা মেয়েটি বলতে পারবে এটা যেন আশাই করেননি তিনি। হঠাৎ প্রতিমা লজ্জা পেয়ে যায়। নিজের আচম্‌কা প্রগলভতায় সংকুচিত হয়ে দৃষ্টি নামিয়ে দেয়। মাথার ঘোমটা বাড়িয়ে দেয়। চলে যাবার উপক্রম করতেই পণ্ডিত বলেছিলেন: তুমি মহাভারত পড়েছ?

—না, কেন?

—তুমি সেই মহিলাটির কথা শোন নাই, যিনি কোপনস্বভাব সন্ন্যাসীকে বলেছিলেন, আমি ক্রৌঞ্চবক নহি, আমার দিকে অমনভাবে ক্রোধদৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না, আমি ভস্ম হয়ে যাব না।

প্রতিমা মাথা নেড়ে বলেছিল, না, কী গল্প?

পণ্ডিত তখন মহাভারতের উপাখ্যান শুনিয়েছিলেন প্রতিমাকে।

হন্‌হন্‌ করে চলেছিলেন পণ্ডিত। গলির মোড়ে পানওয়ালা বলে ওঠে, এই যে, পণ্ডিতমশাই! এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? বলিহারী আক্কেল আপনার! ঐ কচি বাচ্চাটাকে অমনভাবে একা ফেলে রেখে যেতে হয়?

একেবারে কুঁকড়ে যান পণ্ডিত, বলেন, কেন, কী হয়েছে?

—কী হয় নি? একেবারে স্রেফ ডবল্‌-ডেকারের তলায় সেঁদিয়ে যাচ্ছিল যে! এতক্ষণে মায়ের কোলে উঠে বসে থাকত!

আর্তনাদ করে ওঠেন পণ্ডিত: কোথায় সে? কোথায় মা-মণি?

—যান, বাড়ি যান। হাসপাতালে নিয়ে যায়নি, বাড়ির দিকেই গেছে। অমনভাবে একলা ফেলে আর যাবেন না কোনদিন। কী? অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? যান, বাড়ি যান!

বাকি পথটুকু দৌড়েই চলে যান বৃদ্ধ।

বাড়িতে ঢুকবার মুখেই তাঁকে ঘিরে ধরল নানান জাতের মানুষ।

—কী মানুষ মশাই আপনি? মানুষ, না পায়জামা?

—বে-ওয়ারিশ বাচ্চা পেয়েছেন নাকি? জন্ম দেবার সময় খেয়াল ছিল না?

—ওসব মুখে চলবে না হরীশ। হাত চালাও। প্যাঁদানি শুরু কর, শালার পাষণ্ডামি ভাঙবে!

সমস্ত অপমান মাথায় নিয়েও পণ্ডিত এগিয়ে যেতে পারেন না। তাঁর ঘরের ভিতর কী হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন না তিনি।

এইবার ভিতর থেকে খ্যান্‌খেনে গলায় চীৎকার করে উঠে কাতুবুড়ি, ওগো ভালমানুষের পোয়েরা, বুড়োটারে ঘরে আসতি দাও কেনে? শাসন পরে কর, এখন বাপটারে বেটির কাছে আসতি দাও।

একথায় কাজ হয়। ভীড়টা একটু পাতলা হয়ে পথ ছেড়ে দেয়।

সসংকোচে বৃদ্ধ এগিয়ে আসেন। খুকু শুয়ে আছে চৌকিতে। কপালে

একটা কাটা দাগের উপর টিঞ্চার বেঙ্গুইন দিয়ে সীল করা। খুবই অল্পের উপর দিয়ে গিয়েছে। চোট সে পায়নি। বাবাকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলে খুকু। পণ্ডিতের দুই চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে আসে। উবুড় হয়ে পড়েন ঐ একরত্তি মা-হারা মেয়েটার উপর : মা-রে, মা-মণি আমার!

নানা রকম উপদেশ এবং ভর্ৎসনা বর্ষণ করে প্রতিবেশীরা তাঁদের সামাজিক দায় পালন করে একে একে নিষ্ক্রান্ত হলেন। পণ্ডিতের মাথার মধ্যে তখনও টলছে। প্রতিমাই কি ওকে তার কাছে টেনে নিতে চেয়েছিল? সে কি বুঝতে পেরেছে, সন্তান পালনে অশক্ত পণ্ডিতের হাতে খুকু শুধু যন্ত্রণাই ভোগ করবে? তাই কি সে পণ্ডিতকে নিষ্কৃতি দিতে চেয়েছিল? কিন্তু এসব কী ভাবছেন তিনি? এত কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন কেন? মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব শাস্ত্রে স্বীকৃত, কিন্তু তার প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। মৃত্যুলোক অজ্ঞাত রাজ্য। ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ। সেখানে চক্ষু গমন করে না, বাক্য গমন করে না, মনও সেখানে নাগাল পায় না। ন বিদ্মো ন বিজানীমো ;—তাঁকে জানি না, তাঁর কথা কিভাবে বোঝানো যাবে তাও জানি না। ঈশ্বরের মত মৃত্যুও অজ্ঞাত। প্রতিমা ওকে টেনেছিল, একথা ভাবছেন কেন?

—ও বেলা দাঁতে তো কুটোটি কাটিস্‌নি। এ বেলাও কি উপুষ দিবি নাকি?

বৃদ্ধ হেসে বলেন, উপুষ বল কেন পিসি, কথাটা উপবাস।

খ্যাঁক করে ওঠে কাতুপিসি : থাক, বাবা থাক! উপুষ করতে করতে তিন কাল গেল আমার, এখন আর আমাকে উপুষ শেখাতে আসিস্‌ না। তা, আমার কথা না হয় ছাড়ান দে। তুই কী খাবি? এ পোড়ারমুখীকে কী খেতে দিবি?

পণ্ডিত বিহ্বলের মত এদিক-ওদিক তাকাতে থাকেন।

—ওদিকপানে কী দেখছিস্‌? ভাঁড়ে মা ভবানী। সবই বাড়ন্ত। যাও, বাজার থেকে দুটো ফলমূল যা পাও, নিয়ে এস।

খুকুর চোট বেশি লাগেনি। তবে ফাঁড়াটা কেটে গেছে খুব। পণ্ডিত ওকে কাছে বসিয়ে অনেক উপদেশ দিলেন; বড় রাস্তায় যাওয়ার বিপদের কথা বুঝিয়ে দিলেন। লণ্ঠনটা জ্বালতে গিয়ে দেখেন, হ্যারিকেনের চিমনিটা কালো হয়ে আছে, পলতেটাও কেমন যেন বেঁকে গেছে। ধোঁয়া উঠেছে একদিক দিয়ে। দিনের বেলা মেরামত করে ঝেড়ে-মুছে রাখা উচিত ছিল।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। রাস্তার মোড়ে জ্বলে উঠেছে গ্যাসের বাতিটা। ফুলকপির ঝাঁকা নিয়ে একটা লোক হাঁকতে হাঁকতে চলে গেল গলি বরাবর। রিকশার ঠুং-ঠাং শোনা যায়। এ সরু গলির মধ্যে অবশ্য রিকশা ঢোকে না, কিন্তু গলিটা হাত পনের ওফাতে গিয়েই পড়েছে অপেক্ষাকৃত একটা বড় গলিতে।

সেখানে রিকশা কেন, গাড়িও চলে। ঠেলাগাড়ী, রিকশা আর মটোর গাড়িতে প্রায়ই সেখানে জটলা বেধে যায়। পদাতিক মানুষজন ভ্রূক্ষেপ করে না, সেই গাড়ির জটলা ভেদ করে অনায়াসে যাতায়াত করে। বড় গলিটা যেখানে বাস-চলা রাজপথে গিয়ে পড়েছে, ঠিক আটা কলের পাশেই কালীতারা কেবিন। চায়ের দোকান। খানকতক বেঞ্চি পাতা আছে, পেরেক-ওঠা খানকয় আমকাঠের টেবিলও। রোজ সন্ধ্যাবেলায় একজন হিন্দুস্থানী ঐ দোকানটা ঘেঁষে তোলা উনুন নিয়ে বসে, আলুর চপ, পেঁয়াজি, ফুলুরি বিক্রি করে সে। চায়ের দোকানে মাংসের ঘুগনি পাবেন, ডিমের অমলেট, কষা মাংসও পাবেন। আর চা। কালীতারা কেবিনের আসল রহস্য ঐ চটের পর্দার ওপাশে। চোলাই মদ পাওয়া যায় ওখানে। লাইসেন্স অবশ্য নেই দোকানের মালিকের। তা হোক, নির্ভয়ে ওখানে গিয়ে দু-এক ভাঁড় অমৃত সেবন করতে পারেন। কোন হাঙ্গামা-হুজ্জত হবে না। দোকানে এ আনুষঙ্গিকটি চালু আছে আজ বিশ-পঁচিশ বছর। দোকানের মালিক বঙ্কুবাবু বিচক্ষণ মানুষ; বাপ-মায়ের পুণ্যনামধন্য এ দোকানটির যাতে বদনাম না হয়, সেজন্য যথাযোগ্য স্থানে নিয়মিত প্রণামী দিয়ে আসে। খরিদ্দারেরা অধিকাংশই নির্বিরোধী মানুষ। ঝগড়া-কাজিয়া যে কখনও হয় না, তা নয়—তবে বঙ্কু অবিলম্বে সেটা থামিয়ে দেয়। গাঁটের পয়সা খরচ করে একপক্ষকে রিকশায় তুলে বাড়ি পাঠায়।

কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ হুড়মুড় করে পণ্ডিতের ঘরের চৌকাঠের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যতীন মাতাল। বন্ধ ঝাঁপের দরজার উপর হাত বুলিয়ে আদর করে ডাকে, পণ্ডিত আছ নাকি ঘরে—দোরটা একবার খোল বাওয়া—চাঁদমুখটা দেখি—

পণ্ডিত লাফিয়ে উঠে পড়েন। সর্বনাশ! আজ আবার যতীন এসেছে। কোনরকমে খুকুকে কোলে তুলে নিয়ে পিছন দরজা দিয়ে উঠানে নেমে পড়ে তাকে নামিয়ে দিয়ে বলেন, তোর কাতুদিদির কাছে গিয়ে বসে থাক।

খুকু অন্ধকারের মধ্যেই এগিয়ে যায় পাশের ঘরখানার দিকে।

—ও পাষণ্ড পণ্ডিতমশাই, দোরটা খোল না বাওয়া—

পণ্ডিত এসে বাইরের দ্বারটা খুলে দেন, বলেন, আবার ঐসব অখাদ্য খেয়েছ?

যতীন প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসে। জাঁকিয়ে বসে পড়ে মাটিতে। একটা হেঁচকি সামলে নিয়ে বলে, হুঁ হুঁ বাওয়া! আজ পণ্ডিতের ব্যাকরণের ভুল ধরেছি! 'অখাদ্য' শব্দটা অশুদ্ধ প্রয়োগ। ধান্যেশ্বরী খাদ্য নয়, পানীয়। One can't eat liquor, one drinks! খানা নেহি হায়, পীনা! সমঝা?

পণ্ডিতের মুখটা করুণ হয়ে যায়, তোমাকে এতবার বারণ করেছি, এত করে বুঝিয়েছি—তবু ঐ বদ নেশা পরিত্যাগ করতে পারলে না?

যতীন একগাল হেসে বলে, তুমি কী বুঝবে সখা? অনেক দুঃখে এ-পাড়ায়

আসি। এ শালা শহরটা আদ্যন্ত পাপে ভর্তি। একটি হারামজাদাদের ডিপো। এখান থেকে কেটে পড়তে চাই, তা শালার শহরটা আমাকে আষ্টেপিষ্টে নাগপাশে জড়িয়ে ফেলেছে। বুঝেছ? সাঁঝের বেলা তাই এখানে পালিয়ে আসি। সব ভুলে থাকি খানিকক্ষণ। তা সে যাক্‌গে, তোমার খবর কী? শুনলাম, মিসেস পণ্ডিত গো-ওয়েণ্ট-গন্‌?

পণ্ডিত জবাব দেন না।

—আরে অত কাঁচুমাচু হচ্ছ কেন বাওয়া? ঘোড়া তো মরেনি, মরেছে বউ। আমার বউ শালী মরলে আমি হরির লুট দিই। তুমি শালা ভাগ্যবান! দাও, দাও বাওয়া···একটু পায়ের ধুলো দাও—

খপ করে পণ্ডিতের একখানা পা চেপে ধরে যতীন। শশব্যস্ত পণ্ডিত পা ছাড়িয়ে নিয়ে সরে দাঁড়ান।

যতীন আজ অনেক দিন পরে এসেছে। অনেক, অনেক দিন পরে। পণ্ডিত যখন এখানে একেবারে একা থাকতেন, তখন সে প্রত্যহ সন্ধ্যায় আসত। তারপর পণ্ডিতের ঘরে গৃহিণী আসার পর তার যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। মদে চুর হয়ে থাকলেও যতীনের এটুকু বোধ অবশিষ্ট থাকত যে, পণ্ডিত-গিন্নীর উপস্থিতিতে সে এই এককামরার সংসারে আসতে পারে না। দীর্ঘদিন তাই যতীন সাধুখাঁ পণ্ডিতের বাড়ি আসেনি। অথচ হয়তো গত সাত বছর ধরেই সে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় এসেছে এ পাড়ায়। আজ কালীতারা কেবিনে পণ্ডিতের স্ত্রী-বিয়োগের সংবাদ পেয়ে টলতে টলতে এসে হাজির হয়েছে। বঙ্কুকে অবশ্য সে বলে এসেছিল—ঐ পাষণ্ড পণ্ডিতই এ দুনিয়ায় আমার একমাত্র বন্ধু। এ সময়ে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত আমার। আহা, বেচারির বউটা মরে গেল! সত্যই চোখের জল ফেলেছিল যতীন. ঐ চটের পর্দার ওপারে বসে পণ্ডিতের অদেখা বউয়ের জন্য। অথচ এখানে আসতে আসতে তার সান্ত্বনার ভাষা পালটে গেছে।

পণ্ডিত জানতেন, যতীন সাধুখাঁ ধনী, কিন্তু সে যে কত বড়লোক এ সম্বন্ধে তাঁর ঠিকমত ধারণা ছিল না। পায়জামা-পাঞ্জাবি আর চপ্পল। সন্ধ্যার পর তাকে একই বেশে দেখা গেছে এ পাড়ায়। নিত্য ত্রিশ দিন তাকে দেখা যাবে ঐ কালীতারা কেবিনে ইটের উপর বসে মাটির ভাঁড়ে মদ্যপান করছে। ফুটবলের ব্লাডার থেকে মদ ঢেলে দেওয়া হয় মাটির ভাঁড়ে। ঝড়-ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে যতীনের এই সান্ধ্যবিলাস বন্ধ থাকে না। গলিটা যেদিন প্রবল বর্ষণে এক হাঁটু ঘোলা জলের তলায় অবলুপ্ত হয়ে যায়, সেদিনও সপ্‌সপে পাঞ্জাবি-পায়জামা পরে যতীন হাজিরা দেয়। অন্যদিন আসে ট্যাক্‌সিতে, সেদিন রিকশা চেপে। কালীতারা কেবিনের মালিক বঙ্কুবাবুই একদিন পণ্ডিত ক বলেছিল —লোকটা শুনেছি টাকার কুমীর! ঠিক বিশ্বাস হয়নি পণ্ডিতের। টাকার কুমীরেরা এ পাড়ায় ইটের উপর বসে মাটির ভাঁড়ে চোলাই মদ খেতে আসে না।

ঠেলাওয়ালা, ট্যাক্সির ড্রাইভার আর নেপাল-গোপালদের মত ফিটার-টানারদের সঙ্গে তারা মদ খায় না। ওপথের কিছু না জেনেও পণ্ডিত এটুকু জানেন যে, অভিজাত সম্প্রদায়ের জন্য চৌরঙ্গী-পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলে আলো ঝলমল আসবাগারের অভাব নেই কোন। তবে লোকটা নেহাৎ মধ্যবিত্ত ঘরেরও নয় বোধহয়। কব্জিতে তার ঘড়ি নেই, হাতে নেই আংটি, পাঞ্জাবির বোতামও হাড়ের তৈরি—কিন্তু প্রতিদিন ট্যাক্সি করে আসে সে। গাড়ির মালিক হওয়ার মত বড়লোক সে নিশ্চয় নয়, তাহলে ট্যাক্সি চাপবে কেন? কিন্তু বঙ্কুবাবু বলে ট্যাক্সির ভাড়া মিটাতে লোকটা রোজ দশ টাকার নোট বার করে, মেজাজ ভাল থাকলে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলে, তোড়ানি আপ্ রাখ দিজিয়ে সর্দারজী।

প্রশান্ত পণ্ডিতের সঙ্গে যতীন সাধুখাঁর প্রথম আলাপ হয়েছিল অদ্ভুতভাবে। সেও আজ সাত-আট বছর আগেকার কথা। স্কুলে খবর এসেছিল, ওঁদের ক্লাস টেনের একটি ছাত্র টাইফয়েডে ভুগে মারা গেছে। বেলা দুটোর সময় ছুটি হয়ে গেল। ছাত্রটি বিজ্ঞান বিভাগের। প্রশান্ত পণ্ডিতের ক্লাসে বসত না। তা হোক, ছেলেটিকে তিনি চিনতেন। পথে-ঘাটে দেখা হলে ছেলেটি হাত তুলে নমস্কার করত। হঠাৎ-পাওয়া ছুটিতে ছাত্ররা হৈ-হৈ করতে করতে যে-যার বাড়ি চলে গেল। উঁচু ক্লাসের কিছু ছেলে ছুটল হাজরা মোড়ে—এখনও লাইনে দাঁড়ালে ম্যাটিনীর টিকিট পাওয়া যাবে। মাস্টারমশাইরাও যে-যার বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। ছেলেটি হরীশ চ্যাটার্জি স্ট্রীটে তার মামাবাড়িতে থেকে পড়ত; কিন্তু মারা গেছে তার বাবার ওখানে। বাবা থাকতেন নাগের-বাজার। সেটা অনেক দূরে। অতদূর আর কে যায়? কেউই সঙ্গী হতে রাজী হল না। টিচার্স-রুমে গিয়ে অনেককেই অনুরোধ করলেন পণ্ডিত। অক্ষয়বাবু বললেন, তাঁর শরীরটা ভাল নেই, চন্দ্রকান্তবাবু বললেন, সন্ধ্যায় তাঁর একটা জরুরী কাজ আছে। হেডমাস্টারমশাই বললেন, সে বাড়িতে একটি মানুষই আমাদের চিনত, সে-ই তো আজ চলে গেল। গিয়ে কী লাভ? তার চেয়ে শনিবার ছুটির পর আমরা একটা শোকসভায় মিলিত হয়ে তার আত্মার শান্তি কামনা করব।

প্রশান্ত পণ্ডিত অফিস থেকে ঠিকানা নিয়ে একাই রওনা হলেন। স্কুলের গেটের কাছে হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে ডাকল, পণ্ডিতমশাই।

পণ্ডিত ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখেন, মৌলভী সাহেব।

—আমি বিধর্মী, আমার যাওয়াটা কি অশোভন হবে?

—নিশ্চয় না! আসবেন আপনি? চলুন না, তবু একজন সঙ্গী হবে!

—চলুন!

সংস্কৃত এবং ফার্সীর দুই শিক্ষক উপস্থিত হয়েছিলেন বিজ্ঞানের ঐ ছাত্রটির শেষ সৎকারের সময়। দাহকার্য সমাধা করে দুজনে ফিরে এলেন নাইট-শোর

যাত্রী-ভরা দোতলা বাসে। মৌলভী সাহেব হাজরা মোড়ে নেমে গেলেন। পণ্ডিতও নিজের স্টপে নেমে নির্জন গলিটা দিয়ে ফিরে আসছেন—হঠাৎ দেখতে পেলেন, গলির গ্যাসপোস্টে ঠেসান দিয়ে একটা লোক পড়ে আছে। অমনভাবে লোকটাকে পড়ে থাকতে দেখে পণ্ডিত বসে পড়েন রাস্তার উপরেই। না, নাড়ি ঠিক চলছে। বেঁচে আছে লোকটা। পণ্ডিত তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে এলেন। শুইয়ে দিলেন তাঁর চৌকিতে। অত রাত্রে ঘরে তালা দিয়ে ডেকে নিয়ে এলেন পাড়ার মাধব ডাক্তারকে, এবং সেজন্য ভর্ৎসনা শুনতে হল তাঁকে। লোকটার কিছুই হয়নি, অত্যন্ত মদ্যপান করে বেহুঁস হয়ে গেছে মাত্র।

যাই হোক, পরদিন জ্ঞান হবার পর মাতালটা অবাক হয়ে গেল। সে শুয়ে আছে একটা চৌকিতে, আর মাটিতে মাদুর বিছিয়ে একজন অদ্ভুতদর্শন মানুষ শুয়ে আছে।

পণ্ডিত বলেন, এখন সুস্থ বোধ করছেন? নিজগৃহে প্রত্যাগমনে সমর্থ বোধ করছেন?

যতীন উঠে বসে বললে, পারব। কোথায় পেয়েছিলেন আমাকে?

—ঐ পয়ঃপ্রণালীর পাশে। কেন খান ওসব? যান, বাড়ি যান। আর কখনও এসব খেতে আসবেন না।

যতীন উঠে দাঁড়িয়ে পকেটে হাত চালিয়ে বলেছিল, যাঃ শালা! মনিব্যাগটা খোয়া গেছে! একটা টাকা হবে? বাড়ি যাওয়ার বাসভাড়া? কাল শোধ দিয়ে দেব, মাইরি!

বাধা দিয়ে পণ্ডিত বলেছিলেন, আপনার মনিব্যাগ অপহৃত হয় নাই; আমিই নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রেখেছি, নিন—গ্রহণ করুন!

ব্যাগটা হাতে পেয়ে যতীন খুলে দেখে। খুচরা টাকা ছাড়া খানতিনেক একশ' টাকার নোটও ছিল ফাঁকে। সব কিছু ঠিক আছে।

—আমাকে দুইটি টাকা দেবেন, কাল আতঙ্কতাড়িত হয়ে একজন চিকিৎসককে আহ্বান করেছিলাম। তাঁকে পারিশ্রমিক দিতে হবে।

যতীন মনিব্যাগ থেকে একখানা একশ' টাকার নোট পণ্ডিতের দিকে বাড়িয়ে ধরে।

পণ্ডিত খ্যাঁক করে ওঠেন, অংটানঘটই টাকা আমার কাছে নাই। দুইটি টাকা দিতে বলছি, শুনছেন না? ঐ তো খুচরা নোটও রয়েছে—

যতীন গম্ভীরভাবে বলছিল, আপনি আমার যে উপকার করেছেন টাকা দিয়েও তার মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। এটা রাখুন, ভাঙানি দিতে হবে না আপনাকে।

পণ্ডিত শুধু ওকে মারতে বাকি রেখেছিলেন।

সেই থেকেই দুজনের বন্ধুত্ব।

পাষণ্ড-পণ্ডিত আর যতীন-মাতাল।

এবং সেই থেকেই যতীন আসত তাঁর কাছে। নিত্য রাত্রে। আকণ্ঠ মদ গিলে। কখনও কখনও ইংরাজি কবিতা আবৃত্তি করত। কখনও বা গান গাইত আপন খেয়ালে। আর সেই নাচ-গান-আবৃত্তির মূল ধুয়োটা হচ্ছে: এ শালার শহরটা শুধু হারামীদের আড্ডা। এখানে ভদ্রলোক থাকতে পারে না। শুয়োর, শুয়োর, সব শালা শুয়োর! যতীন নিজেও এখানে থাকবে না। সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে চলে যাবে। সব শালা পাজি-বদমাশ-ভণ্ড-মেকি-জোচ্চোর আর নির্ভেজাল হারামী! এই হচ্ছে যতীন-মাতালের জীবনদর্শন।

যতীনের হাত থেকে পা-খানা টেনে নিয়ে পণ্ডিত বলেন: এতদিন পরে আবার আমাকে দগ্ধ করতে এসেছ তুমি?

—দগ্ধ করতে? না বন্ধু, দগ্ধ করতে আমি আসিনি; নিজেই আমি 'দগ্ধিত' হচ্ছি—if that be grammatically correct। তিলতিল করে মোমের বাতির মত জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছি আমি, অপরকে জ্বালাব কী?

—তবে কি আমার দুঃখে সান্ত্বনাবারি সিঞ্চন করতে এসেছ?

—না, তাও নয়। আমি শুধু বলতে এসেছি—তুমি কোল্টন পড়েছ পণ্ডিত? পড় নি? কোল্টন বলেছেন: "Death is the liberator of her, whom freedom cannot release; the physician of her whom medicine cannot cure; the comforter of her, whom time cannot console!"

—একথার অর্থ?

—তোমার ধর্মপত্নীকে আমি দেখিনি, শুনেছি তিনি বয়সে বিশ বছর ছোট ছিলেন তোমার। তোমাকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি পণ্ডিত। তুমি খাঁটি নির্ভেজাল নিটোল একটি পাষণ্ড! তোমার মত stay-bright তলোয়ারেরই আজ দরকার এ পুণ্যভূমি বঙ্গদেশে। তা হোক, তবু তোমাকে কোন বঙ্গললনা আলিঙ্গন করলে তার বুকে ক্ষতই হবে শুধু! দুঃখ কর না পণ্ডিত, তোমার স্ত্রী মুক্তি পেয়েছেন।

কী করবেন? এ মাতাল তাড়ালেও যাবে না। হঠাৎ যতীনের নজর পড়ে ভিতরের দ্বারের দিকে। খুকু পায়ে পায়ে ফিরে এসেছে, যতীন বলে, আরে আরে, এ আবার কে?

যতীন দুহাত বাড়িয়ে খুকুকে ডাকে। খুকু ওকে ভয় পায় না। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে তার বাহুবন্ধে ধরা দেয়। পণ্ডিত বলে, আমার কন্যা!

—কন্যা? daughter? কী তাজ্জব কি বাৎ! আরে এ কথা তো জানতাম না! বাহারে বাহা, পণ্ডিত! এর পর যে তোমাকে হিংসে করতে ইচ্ছে করছে, এ্যাঁ? আমার বউ-এর বাচ্চা হয়নি। মানে বাচ্চা চায় না সে। তাহলে তার দেহ ঢিলে হয়ে যাবে! তুমি তো আমার চেয়ে ভাগ্যবান! শুধু

বউই মরেনি, বাচ্চাও আছে। সাউদে পড়েছ পণ্ডিত? Call not that man wretched, who, whatever ill he suffers, has a child to love! এ্যাঁ?

খুকু বললে, আমার সঙ্গে খেলবে তুমি?

—By all means! আলবৎ খেলব? কী খেলা?

—রান্নাবাড়ি।

যতীন তৎক্ষণাৎ রাজী। খুকু আর যতীন রান্নাবাড়ি খেলায় বসে যায়। ইটের টুকরো, বালি, ধুলো নিয়ে আসে যতীন। খুকু রান্না চড়ায়। যতীন বলে, তোমার নাম কী খুকু?

—খুকু।

—সে তো সব খুকুরই নাম! তোমার নাম কী?

প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারে না খুকু। যতীন তখন পণ্ডিতকে বলে, মেয়ের কী নাম রেখেছ হে?

পণ্ডিত সলজ্জে বলেন, সবিতা।

খুকু অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, সবিতা কার নাম বাবা?

হো-হো করে হেসে ওঠে যতীন। বলে, যাঃ বাবা; মেয়েকে নাম ধরে ডাকনি বুঝি, পণ্ডিত?

পণ্ডিত অর্কফলা সমেত মাথাটা নেড়ে বলেন, না।

—তুমি শালা ন্যায্য পাষণ্ড!

সত্যই এ নামে কোনদিন মেয়েকে তিনি ডাকেননি। আজই প্রথম ঐ নামটার স্বীকৃতি দিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর। এ নামের উৎপত্তিগত এবং ব্যুৎপত্তিগত দ্বন্দ্বের অবসান হল এতদিনে।

কন্যার নামকরণ নিয়ে বস্তুত মতান্তর হয়েছিল স্বামী-স্ত্রীতে।

মনান্তর হয়নি।

প্রতিমা অনুরোধ করেছিল স্বামীকে, আপনি এবার খুকুর একটা ভাল মতন নাম দিন। না হলে সারা জীবন ঐ খুকু হয়েই থাকবে।

—না, না, নামকরণটা তুমিই করবে।

প্রতিমা মুখ টিপে হেসে বলেছিল, না বাপু, আমার সাহস হয় না। অত বড় পণ্ডিতের মেয়ের নাম, ও আমি দেব কেন?

পণ্ডিত প্রতিবাদ করেছিলেন, নামকরণের সহিত পাণ্ডিত্য-প্রকাশের কোনও অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ নাই। তুমিই বল!

প্রতিমা সলজ্জে বলেছিল, আমার ইচ্ছা ওর নাম হোক, 'সবিতা'।

পণ্ডিত বলেছিলেন, 'সবিতা' শব্দটা পুংলিঙ্গ। ওর অর্থ সূর্য, জনয়িতা। 'সবিত্রী' শব্দটা ওর স্ত্রীলিঙ্গের রূপ।

প্রথমটায় থমকে গিয়েছিল প্রতিমা। এই ভয়েই সে এতক্ষণ কথা বলেনি।

তবু রাগ না করে বলে, না না, 'সাবিত্রী' নামের মেয়েরা সুখী হয় না। আমি দুজন সাবিত্রীকে চিনি—

—আহ্! তুমি বুঝছ না। আমি 'সাবিত্রী' বলি নাই। সাবিত্রী হচ্ছেন অশ্বপতির কন্যা, সত্যবানের পত্নী;—সাবিত্রীর অপর অর্থ সূর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, গায়ত্রী। আমি বলছি, 'সবিত্রী'। সবিতৃ স্ত্রীয়াম্ ঈপ্ সবিত্রী।

প্রতিমা বিরক্ত হয়ে বলেছিল, অত ইপ্-টিপ্ আমি বুঝি না, ওর নাম সবিতা।

পণ্ডিত বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, কী আশ্চর্য! বললাম না, ওটা পুংলিঙ্গ শব্দ!...

প্রতিমা একথার আর জবাব দেয়নি।

খুকুর আর পোশাকী নামই হয়নি তারপর।

পণ্ডিত উনানে আগুন দেন। যতীন বলে, আমার জন্যেও দুটি চাল নিও পণ্ডিত। বাড়িতে কী জুটবে কে জানে। গিন্নি আজ ক্লাবে গেছেন। তার চেয়ে ব্রাহ্মণ বাড়িতেই দুটি প্রসাদ খেয়ে যাই।

—আমার কিন্তু ব্যঞ্জনের কোন আয়োজন নাই, হবিষ্যান্নের ব্যবস্থা।

—তাহলে আমারও তাই!

পণ্ডিত আলোচাল ধুয়ে আনতে যান। যতীন খুকুর পুতুলের ডালাটা খুঁটিয়ে দেখে, বলে, আরে, তোমার পুতুল কই, খুকুমণি?

—আমার একটাও পুতুল নেই।

—এ কী অনাসৃষ্টি! পাষণ্ড একটা পুতুলও কিনে দেয়নি তোমাকে? আচ্ছা, কালই আমি তোমার জন্য একটা এ্যাত্তবড় পুতুল নিয়ে আসব।

ক্রমে ঘনিয়ে আসে রাত। খুকু আর যতীন পাশাপাশি খেতে বসে। আলু সিদ্ধ, মুগের ডাল সিদ্ধ, কাঁচকলা সিদ্ধ আর ভাত। যতীন বলে, পণ্ডিত, তোমার কই?

পণ্ডিত বলেন, রাত্রিকালে আমি অন্নগ্রহণ করি না। আর আজ তো একাদশী!

—আয়াম সরি! তুমি যে একাদশী বৈরাগী এটা খেয়াল ছিল না আমার! একটা কাঁচা পেঁয়াজ হবে? আয়াম সরি এগেন। কাঁচা লঙ্কা হবে অন্তত?

আহারান্তে টলতে টলতে যতীন বেরিয়ে যায়। খানিক গিয়ে আবার ফিরে আসে, বলে পণ্ডিত, চীন দেশে একটা প্রবাদ আছে, জানলে, 'There are two perfectly good men, one dead, and the other unborn!' চীনে বেটারা জানে না, আর এক শ্রেণীর নির্ভেজাল খাঁটি পাষণ্ড আছে এই ভারতবর্ষে, যারা তিন্তিড়ি পাতার ঝোল খায়, যাদের কোন 'অনুপপত্তি' নেই, যারা অর্ধেন্দু মুস্তফীকে চটি জুতো ছুঁড়ে মারে, যারা তোমার মত পাষণ্ড!

পণ্ডিত ওকে তাগাদা দেয়, যাও ভাই, অনেক রাত্রি হয়ে গেছে—

যতীন ঘুরে দাঁড়ায়, বলে, ভাবছ, যতে শালা মাতলামো করছে? না বন্ধু! 'I'm serious to the marrow of my bones।' তোমার মত পার্ফেক্ট পাষণ্ডের উপযুক্ত স্থান এই কলকাতা শহরটা নয়। দেখছ না, এর সর্বাঙ্গে ঘা হয়েছে! মাংস গলে পচে খসে পড়ছে! আমি ঐ রাস্তার জঞ্জালের কথা বলছি না, আমি বলছি মানুষের মনের ডাস্টবিনগুলোর কথা। তুমি ভেবেছ, এ শহরটার কুষ্ঠ হয়েছে? না! কুষ্ঠ নয়, আমি জানি! মুখটা পণ্ডিতের কানের কাছে এনে বলে, শহরটা ভেনিরাল ডিসিসে ভুগছে। সংক্রামক মহামারী; পার তো পালাও, আমি পালাব। তুমিও কেটে পড়। তুমিও মরবে, তোমার খুকুও গো-ওয়েণ্ট-গন!

পণ্ডিত ঝাঁপের দরজাটা টেনে বন্ধ করে দেন ওর মুখের উপর।

পরদিন সকালে পণ্ডিত প্রথমেই গেল কাতুপিসির খোঁজে। কিন্তু এই সাতসকালেই বুড়ি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছে। উদয়াস্ত বুড়িকে খাটতে হয়। দুই উপার্জনক্ষম পুত্রের অন্ন ধ্বংস করছে সে, তাই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গতরে খেটে পুষিয়ে দেয় সেটা। তবু দুই পুত্রবধূর মন পায় না। উঠানটুকু পার হয়ে পণ্ডিত কাতুপিসির সন্ধান পেলেন। একতাল গোবর নিয়ে পড়ো পাঁচিলটার উপর সারি সারি ঘুঁটে দিচ্ছিল বুড়ি। পণ্ডিত সেখানে তার শরণাপন্ন হলেন। আজ মেয়েকে তার জিম্মায় রেখে যেতে চান।

বুড়ি খিঁচিয়ে ওঠে, পারবনি, আমি পারবনি! কেন? বে' করতে যখন গিইছিলি, তখন কাতুবুড়িকে শুধিয়ে গিইছিলি? তোর বউ মাগী যখন ড্যাংডেঙিয়ে সগ্‌গে চলে গেল, তখন কাতুবুড়িকে শুধিয়েছিল?

ন্যায়রত্ন এ তর্কের সম্মুখে অসহায় বোধ করলেন।

সত্যই তো, বৃদ্ধা সমস্ত দিন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে। চোখে ভাল দেখে না, সংসারের ঐ পরিমাণ কাজ সামলে সে কেমন করে খুকুকে রাখবে?

বাধ্য হয়ে ফিরে আসেন ঘরে। খুকুকে খাইয়ে নিজেও খেয়ে নেন। এটো বাসনপত্র মেজে, সব ধুয়ে-পুঁছে খুকুকে বলেন, তোর মা দুধ দিত না তোকে?

—দিত তো বাবা।

—কোন্ গোয়ালা দুধ দিয়ে যেত?

—তা তো জানি না বাবা!

পণ্ডিত চটে ওঠেন। খুকু কিছুই খবর রাখে না। তারপর খেয়াল হয় এজন্য ঐ শিশুকে দোষারোপ করাটা অন্যায় হচ্ছে তাঁর। তিনি নিজেই তো জানেন না, কোন্ গোয়ালা দুধ দিয়ে যায়, কখন দিয়ে যায়।

খুকুকে ডেকে বলেন, তুমি আজ ঘরের মধ্যেই থাক, মা-মণি। আমি

বাইরে থেকে তালাবন্ধ করে দিয়ে যাই। কান্নাকাটি কর না, কেমন? লক্ষ্মী মেয়ে!

ব্যাপারটা বোধকরি খুকু আন্দাজ করতে পারে না। পুরানো একখানা বইয়ের ছবি দেখছিল সে। অন্যমনস্কের মত মাথা নেড়ে বললে, আচ্ছা।

আজ ঘরে তালা বন্ধ করে স্কুলে চলে গেলেন পণ্ডিত। সমস্ত দিন কোথা দিয়ে কেটে গেল। শেষ পিরিয়ড শেষ হলে মনে পড়ল মেয়ের কথা। আহা, বেচারি সমস্ত দিন ঐটুকু ঘরে বন্দী হয়ে আছে। ঘুমাচ্ছে বোধহয়। হন্‌হনিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। ঘরের কাছে এসে প্রথমে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে ভিতরে তাকিয়েই একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলেন:

খুকু ঝাঁপের দরজাটার কাছে হাঁটু গেড়ে বসেছে। হাত দিয়ে দরজাটা ঠেলছে না। ঘড়ির দোলকের মত নিয়মিত তালে তালে সেই ঝাঁপের দরজায় মাথা খুঁড়ছে, আর বলছে: মা, মা-মণি! আর কোন দুষ্টুমি আমি করব না, তুমি ফিরে এস! মা গো, মা, মা-মণি গো!

বুকের মধ্যে মুচড়ে ওঠে পণ্ডিতের। আজ দুদিন খুকু মায়ের নাম উচ্চারণ করেনি। তার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সে কী বুঝেছে তা সে-ই জানে। প্রথম দিনের পর আর সে নিজে থেকে মায়ের কথা বলেনি। পণ্ডিত ভেবেছিলেন, মায়ের কথা সে বুঝি ভুলেই গেছে। এই মুহূর্তে অনুভব করেন, খুকুও ভোলেনি। সে ভেবেছে এ তার কোন অপরাধের শাস্তি। তাই এই নির্জন ঘরে প্রাণের সবটুকু আকুতি উজাড় করে সে এখন মাকে ডাকছে আর বন্ধ দরজায় মাথা খুঁড়ছে।

দরজা খুলে দিতেই খুকু ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

পণ্ডিত দুহাত বাড়িয়ে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরতে গেলেন। ছিটকে সরে গেল খুকু। দুহাতে মুখে ঢেকে দেওয়ালের দিকে ফিরে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে। ঘৃণা-লজ্জা-অভিমানে ছোট্ট মানুষটা আজ বিদ্রোহী!

না, খুকু মাতৃস্মরণ করছিল নিতান্ত জৈবিক কারণে। উপায় ছিল না বেচারির। খুকু শিশু হলেও শৌচাগারে যেতে অভ্যস্ত। এ ঘর নোংরা না-করবার আপ্রাণ দৈহিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে তার। ঘরের কলসীতে আজও জল রাখতে ভুলেছেন পণ্ডিত। সমস্ত দিন বিষ্ঠায় মাখামাখি হয়ে কেঁদেছে। বন্দী খুনী অপরাধীরও যেটুকু স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে, বাপ তাও দেয়নি তাকে। বাপের কথা তাই তার মনে পড়েনি। কোন্ অপরাধে তার এ শাস্তি বিধান করা হল, তা সে জানে না; কিন্তু চিরদিন যিনি ওকে এ লজ্জা নিবারণে সাহায্য করেছেন তাঁকেই মনে পড়ে গিয়েছিল ওর। দুর্গন্ধে পেটের মধ্যে মুচড়ে উঠেছে,—বমি করে ফেলেছে। তারপর কলসীতে এক ফোঁটা জল নেই দেখে সেই তিক্ত আঠা আঠা ছোট্ট জিবটুকু নেড়ে অস্ফুটে সে মাকে ডেকেছে। বারে বারে ঝাঁপের দরজায় মাথা খুঁড়ে বলেছে: আর কোন দুষ্টামি আমি করব না, মা-রে!

তুমি ফিরে এস। মা গো! মা-মণি আমার!

পণ্ডিতের মনে হল, এ লজ্জা তাঁর। তিনি অসহায়, তিনি অপারগ। খুকুর এ শাস্তি তাঁরই অপরাধে। কন্যাকে লজ্জা নিবারণের সুযোগ তিনি দিতে পারেননি। বুকের মধ্যে হু-হু করে উঠল তাঁর।

আকাশের দিকে দুহাত উঁচু করে আর্তনাদ করে ওঠেন, এ কী যন্ত্রণা আমাকে দিচ্ছ, করুণাময়!

দ্বার খোলা পেয়েই খুকু ছুটে বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই এল কাতুপিসি। খুকু নিরুপায় হয়ে তারই দ্বারস্থ হয়েছে। হাজার হোক কাতুদিদি মেয়েমানুষ, নারীর সহজাত লজ্জায় তার মনে হয়েছে বাপের চেয়ে এ বিপদে কাতুদিদিই আপনজন! এক বালতি জল আর ঝাঁটা হাতে কাতুদিদির আবির্ভাবে একপাশে সরে দাঁড়ালেন পণ্ডিত। ঐ ঝাঁটাটাই পণ্ডিতের মুখের সম্মুখে নেড়ে খেঁকিয়ে উঠল কাতুদিদি, ঠিকই বলে সবাই, তুই পাষণ্ড! তুই ঘোর পাষণ্ড! দয়া-মায়া বলে কিছুই নাই গা ঐ পোড়া তালগাছটায়? ঐটুকু দুধের বাছাকে তুই কোন আক্কেলে এমন বন্দী করে গেলি? এমনি করে গু-মুতের মাঝখানে দগ্ধে দগ্ধে না মেরে গলায় পা দে' আবাগীটারে মেরে ফেল না! সেঁকো বিষ নে' এসে খাইয়ে দে। ল্যাটা চুকে যাক! নে, সর ওখান থেকে, গায়ে ঝাঁটা লাগবে।

আজ আর পণ্ডিত কাতুপিসির প্রাকৃত সম্বোধনে কোন প্রতিবাদ করেন না। সমস্ত তিরস্কার মাথা পেতে নিলেন। হ্যাঁ, অপরাধটা সম্পূর্ণ তাঁরই।

গোবরজল দিয়ে ঘরটা ধুতে ধুতে কাতুবুড়ি এক নাগাড়ে গজগজ করতে থাকে, ভেজ কত বাবুর! তখন বললাম ছাত্তর ঠ্যাঙাতে যাওয়ার আগে এক রত্তির মেয়েটারে নড়া ধরে আমার কাছে বসিয়ে দিয়ে যেও। তা কথা কানে গেল না বাবুর, রাগ দেখিয়ে ঘরে তালাবন্ধ করে যাওয়া হল। এখন গু-মুত মুক্ত করে কে?

খুকু প্যাণ্টটা বদলে চৌকির উপর উবুড় হয়ে শুয়েছে। দুরন্ত অভিমানে বালিশে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

কেমন করে ওর অভিমান ভাঙাবেন পণ্ডিত ভেবে পান না।

সন্ধ্যার পর যথারীতি যতীন এসে হাজির। আজও মদ্যপান করে এসেছে। আর মদ না খেলে এখানে আসবেই বা কেন? মদ্যপান করতেই তো সে আসে কালীতারা কেবিনে। মদে চুর হয়ে পড়ার পরেই তার মনে পড়ে যায় পণ্ডিতের কথা। আজ যতীন একটা সুন্দর পুতুল নিয়ে এসেছে। মস্ত ডল-পুতুল। পুতুল পেয়ে খুকুর অভিমান ভাঙে। বাপের উপর রাগ হয়েছে তার, তাই আজ যতীনকে আরও নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে। যতীন আর খুকু দুজনে খেলাঘরের সংসার পাতে। প্রৌঢ় যতীন খুকুর নাগাল পায়; চোলাই-করা মদ

ওদের দুজনের বয়সের ফারাকটা মিটিয়ে দেয়। দুটি শিশুর সে খেলাঘরের প্রবেশদ্বারটা খুঁজে পান না পণ্ডিত। বুঝতে পারেন, ওদের সে খেলাঘরে তিনি অপাংক্তেয়, বাহুল্য। পণ্ডিত রান্নার যোগাড়ে মন দেন। ওরা ভ্রূক্ষেপও করে না। ওদের খেলা জমে ওঠে। যতীন সাধুখাঁ খুকুকে বার্নস, কীটস, বেন জনসনের উদ্ধৃতি শোনায়। খুকু এ মনে শোনে। খুকুও ছড়া শোনায়ঃ শিব-ঠাকুরের আপন দেশে, আইন-কানুন সর্বনেশে।

যতীন বলেঃ এক্স্যাক্টলি! সেই শিব-ঠাকুরের আপন দেশটা কোথায়, জান খুকুমণি?

—কোথায় কাকু?

—দিস্ গন্দা-সিটি! এই কলকাতা শহর! এখানে কেউ যদি যায় পিছলে পড়ে, অমনি প্যায়দা এসে পাকড়ে ধরে। এখানে রাস্তায় কলার খোসা ফেল, কেউ মানা করবে না, কিন্তু সেই কলার খোসায় পা দিয়ে যদি পিছলে পড়, অমনি তোমাকে প্যায়দা এসে চেপে ধরবে।

খুকু বলে, বারে! তা কেন? কেউ পড়ে গেলে তো ধরে তুলতে হয়!

যতীন মাথা নেড়ে বলে, উঁহু হু! সে হবে না। সেটা পুরানো আইন! এখন ও আইন বাতিল। এখন হচ্ছে একুশে আইন! এখন বুঝো যদি পিছলে পড়ে অমনি উদো তার পিঠে পোঁটলা সমেত উঠে বসবে। তারপর তার পিঠে দমাদম লাগাবে আর বলবে, ওঠ বলছি, ওঠ!

খুকু খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে যতীনের ভাবভঙ্গি দেখে।

—হ্যাঁ, সত্যি বলছি। এখানে দেখবে ডাস্টবিনের গায়ে লেখা থাকে 'ময়লা ছুঁইলে শাস্তি পাইবে'। কিন্তু মানুষ কি কুকুর? খামকা ময়লা সে ছোঁবে কেন বল? তার মানে মানুষকে আমি ময়লা ছোঁবার মত অবস্থায় এনে পেড়ে ফেলেছি; আমার কোন শাস্তি নেই। এ যে একুশে আইনের দেশ! তুমি শালা ময়লা ছুঁয়েছ কি তোমাকে প্যায়দা এসে পাকড়ে ধরবে!

পণ্ডিত ভাতের ফ্যান গালতে গালতে আড়চোখে এদিকে একবার তাকান। বুঝে উঠতে পারেন না, এ কি যতীনের মাতলামী, না কি সে জানতে পেরেছে যে, খুকুকে আজ তিনিই ময়লার মধ্যে পেড়ে ফেলেছিলেন, শাস্তি খুকুই পেয়েছে, তিনি নন। অথবা যতীন নিছক তীব্র শ্লেষের সঙ্গে এই সমাজকে ব্যঙ্গ করছে!

যতীন তখনও বলে চলেছে, ময়লা না ছুঁয়ে টপাটপ মরে যাও। অমনি মস্ত মস্ত গাড়ি আসবে। তোমাদের নিয়ে যাবে বিরাট প্রাসাদে। হাজার বাতির রোশনাইয়ে তোমার পেট চিরে দেখবে। তারপর বলবে,—এ অনাহারজনিত মৃত্যু নয়, এ বেশি খেয়ে পেট ফেটে মরেছে।

পেট ফেটে মরার কায়দাটা যতীন চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে দেখিয়ে দেয়।

খুকু আবার খিল্খিল্ করে হেসে ওঠে।

রাত গভীর হয়ে আসে। খুকুর ঘুম পায়। সে শুয়ে পড়ে। যতীন

আজ খায়নি, বলে, না বাবা রোজ রোজ ও একাদশী বৈরাগীর হবিষ্যান্ন আমার পোষাবে না। যতীনকে পণ্ডিত দ্বার পর্যন্ত এগিয়ে দেন।

যাবার সময় যতীন বলে, এখনও বলছি পণ্ডিত, কেটে পড় বাওয়া। ওসব ছেলে ঠেঙিয়ে কিস্সু হবে না। এ জাতটার ক্যানসার হয়েছে ব্রাদার। ও শিবের অসাধ্য। বাঁচতে চাও তো কেটে পড়, আর খুকুটাকে যদি বাঁচাতে চাও—

পণ্ডিতের মনটা আজ ভাল ছিল না। না হলে, মদ্যপকে মনের দুঃখের কথা বলে ফেলতেন না। হঠাৎ বলে ওঠেন, খুকুকে নিয়েই হয়েছে আমার চিন্তা! কী যে করি?

—শুনবে? আমার পরামর্শ শুনবে? এখান থেকে স্রেফ কেটে পড়। সাঁওতাল পরগণায় চলে যাও। সেখানে এখনও মানুষের সন্ধান পাবে। তারা নেংটি পরে থাকে; কিন্তু তারা খাঁটি মানুষ। আমার মত দিনে এক, রাতে আর এক নয়, হিপোক্রিট নয়। তুমি ওখানে চলে যাও। সেখানে আমার একটা ফ্যাক্টারি আছে। তার ম্যানেজার করে দিচ্ছি তোমায়। সোজা চলে যাও সেখানে।

পণ্ডিত ভদ্রভাবে এড়িয়ে যান। বলেন, আচ্ছা, ভেবে দেখি।

—ভাব, ভাব; ভাবনার কথা, ভাববে বই কি! এই নাও, আমার কার্ডখানা রাখ। ভাবনার সুরাহা হলে আমার সঙ্গে দেখা কর।

মনিব্যাগ খুলে সুদৃশ্য একখানা কার্ড বার করে দেয় যতীন-মাতাল।

পরদিন কাতুবুড়ি এসে বললে, হ্যাঁ পণ্ডিত, তুই দুধ আনতে যাস্নে?

—দুধ আনতে যাব? কোথা থেকে?

—ও আমার পোড়া কপাল! দেখ, খুঁজে দেখ—কার্ডখানা কোথায় রেখে গেছে সে আবাগী। রোজ বিকালে যে হরিণঘাটার ডিপো থেকে খুকুর মা দুধ আনত।

পণ্ডিত বলেন, ও বেলা এসে অন্বেষণ করে দেখব পিসি। এখন আমার বিলম্ব হয়ে যাবে। মা-মণি থাকল, তুমি একটু দেখ।

কাতুপিসির জিম্মায় খুকুকে গচ্ছিত রেখে পণ্ডিত স্কুলে গেলেন। ভেবে দেখলেন, এই ব্যবস্থাই সব চেয়ে ভাল। দুপুরবেলা মেয়েকে একা রেখেও যাওয়া যায় না, ঘরে তালা বন্ধ করেও রেখে যাওয়া চলে না। একটা বিপদ-জনক, একটা অমানুষিক। খাঁচায় বন্ধ একটা পাখির মত সারাটা দুপুর যদি বন্ধ ঘরে মেয়েটা পাখা ঝটপট করে, তাহলে তাঁর বিদ্যাদানের ব্রতও ব্যর্থ হতে বাধ্য। ছাত্রদের তিনি উপদেশ দেন, জাগতিক বন্ধন থেকে আত্মাকে, ষড়রিপুর শৃঙ্খল থেকে দেহ-মনকে মুক্ত রাখতে বলেন। দারিদ্র্যের কশাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হও ক্ষতি নেই, মনুষ্যত্ব হারিও না। আত্মাকে মুক্ত রেখ। তাঁর সে বাণী

প্রহসনের মত শোনাবে না, যদি তিনি ঐটুকু একটা মেয়েকে বন্দী করে রেখে যান? এ ভালই হল। কাতুপিসি দায়িত্ব নেওয়ায় নিশ্চিত হলেন তিনি।

কিন্তু দুর্ভাগ্য পণ্ডিতের। এ ব্যবস্থাও ধোপে টিকল না। সন্ধ্যায় তিনি ফিরে আসতেই কাতুপিসি মেয়ের হাত ধরে পেঁছে দিয়ে গেল। আঁচলে চোখটা মুছতে মুছতে বললে, নে বাবা, তোর ধন তুই ফেরত নে!

—কী হল হঠাৎ? অবাক হন পণ্ডিত।

—আমার সে ক্ষ্যামতাও নেই, সে অধিকারও নেই।

খুকু মুখটা চুন করে দাঁড়িয়ে থাকে দরজার পাশে।

—তোমার চোখ অশ্রুআর্দ্র কেন পিসি?

—তোর মেয়েকে নে' তুলকালাম কাণ্ড হয়েছে সারাদিন। পরের ঘরে দাসি বিত্তি করি আমি, এসব উট্‌কো ঝামেলা আমার বেটার বৌরা সইবে না।

—ও! এই!

—শুধু এই নয়! তোর মেয়েকে বুচু আর ছোটন সারা দিন ঠেঙিয়েছে, চিমটি কেটেছে আর চুল টেনেছে!

—কেন কেন? মা-মণি তো দুষ্টামি করে না কিছু!

—দুষ্টামি কেন করবে? তার পুতুলটা নিয়েই তো ঝগড়া! ছোটন সেটাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙেছে। তাই নিয়ে কথা বলতে গেলুম, তাতে আমার কী হাল হয়েছে দেখ্!

ডান হাতের কনুইটা তুলে দেখায়। কেটে গেছে অনেকটা।

—এমন হল কী করে? বিস্ময়াহত পণ্ডিত প্রশ্ন না করে পারেন না।

—ছোটনের মা ধাক্কা মারলে, আমি উল্টে পড়ে গেলুম।

পণ্ডিত কী বলবেন, কী করবেন ভেবে পেলেন না। নজরে পড়ে চৌকির একপ্রান্তে খুকুমণি দাঁড়িয়ে আছে তার পুতুলের ছিন্নভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি আঁকড়ে। টস্ টস্ করে চোখ থেকে জল ঝরে পড়ছে তার।

—পরের সংসারে একমুঠো ভাতের পিত্যেসে পড়ে আছি বাবা। আমাকে আর সেখান থেকে তাড়াস নে। নে, তোর বাছাকে নিয়ে যা ইচ্ছে করিস, আমার পিত্যাসী আর হস্ নে—

চোখে আঁচল চাপা দিয়ে তে-ভাঙা দেহটা টানতে টানতে কাতুবুড়ি চলে যায়।

পণ্ডিত বলেন, দেখি পুত্তলিটা! ওটা মেরামত করা যায় কিনা!

খুকু পুতুলের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অঙ্গগুলি ঝরঝরিয়ে ফেলে দেয় মাটিতে।

চশমাটা ঠিক করে নিয়ে পণ্ডিত সেগুলি পরীক্ষা করে দেখেন। না, মেরামতের প্রশ্নই ওঠে না। শুধু ছিন্ন-বিচ্ছিন্নই নয়, ব্লেড দিয়ে সেগুলি ফালা ফালা করে দেওয়া হয়েছে। ও আর জোড়া লাগবে না।

স্কুল থেকে ফেরার পথেই পণ্ডিত কিছু মিষ্টি নিয়ে এসেছিলেন। বলেন,

মায় মা-মণি, আমরা কিছু খেয়ে নিই। যতীনকে বলব, সে ওর অপেক্ষা আরও ভাল একটা পুতুলি নিয়ে আসবে।

খুকু চোখ মুছে এগিয়ে আসে।

সন্ধ্যার পর যতীন মাতাল ঠিকই এসে হাজিরা দেয়। আজও সে একটা পুতুল নিয়ে এসেছে। এবার কাঠের পুতুল। আগের পুতুলটার মর্মান্তিক অপঘাত মৃত্যুর কথা শুনে যতীন বললে, এ তো আমি জানতামই! তোমার পুতুলকে ওরা তো জ্যান্ত থাকতে দেবে না! তুমি পুতুলটাকে ভালবেসেছিলে কিনা, একুশে আইনের দেশে ভালবাসা একেবারে বারণ। তাই ওরা তোমার পুতুলটাকে মেরে ফেলেছে। তারপর পেট চিরে দেখেছে এটা অনাহারে মৃত্যু কিনা! তাই আজ কাঠের পুতুল নিয়ে এসেছি। এর পেট কাটা অত সহজ নয়! হুঁ হুঁ বাবা! তোমার ব্লেড ভেঙে যাবে এর পেট কাটতে গেলে।

খুকু বলে, কাকু, তাহলে কি এটাকে ভালবাসব না? ভালবাসলেই তো ওরা এটাকে মেরে ফেলবে।

যতীন বলে, তা কেন? ওরা ভাঙার খেলা খেলছে, ওরা ভাঙবে। আমরা ভালবাসার খেলা খেলছি, আমরা পুতুলকে ভালবাসব। তবে পুতুলকে শক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। যাতে সে দু' ঘা নিতে পারে, দু' ঘা দিতেও।

পণ্ডিত আজও আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন। যতীনের সবটাই মাতলামো। কিন্তু পণ্ডিতের মনে হয়, সবটাই বুঝি মাতলামো নয়।

মোট কথা, পুতুল পেয়ে খুকু তার দুঃখ ভুলে যায়। যতীন মাতালকে সে নীতিমত পেয়ে বসেছে। ঐ তার একমাত্র বন্ধু। তাকে রান্না করে খাওয়ায়, তাকে ঘুম পাড়ায়। যতীন সমস্ত দিনমান কী করে তা সেই জানে; কিন্তু সন্ধ্যার পর সে সেই দুনিয়াদারীকে ভুলতে চায়। খুকুর ঐ ছোট্ট সংসারটিতে মাথা গুঁজবার জন্য তখন সে আকুল হয়ে ওঠে। সারাটি দিন সে যে বিষ পান করে সন্ধ্যায় কালীতারা কেবিনে এসে অমৃতপানে সে বিষক্রিয়াকে ভুলে যায়। তখন শিশুর মত নিষ্পাপ মন নিয়ে সে শিশুর সমতলে নেমে আসে। অনর্গল শোপেনহাওয়ার, হেগেল, নীটশে আওড়ে যায় খুকুর কাছে। যতীনের বিশ্বাস, এসব তথ্য একমাত্র খুকুই বুঝবে!

প্রতি শুক্রবার সকালে প্রশান্ত পণ্ডিত রাসবিহারীর মোড়ের দিকে একটি ছেলেকে দেড়ঘণ্টার জন্য পড়াতে যান। বিরাট বড়লোকের বাড়ি। এককালে জমিদার ছিলেন, বর্তমানে জমিদারী নেই—কিন্তু অর্থ আছে প্রচুর। অর্থের অভিমান প্রচুরতর। ছেলেটি এবার হায়ার সেকেণ্ডারি দেবে। তার বাবা রামগোপালবাবুর অর্থের যখন অভাব নেই, তখন তিনি পুত্রের পাঠ্যবিষয়ে প্রত্যেকটির জন্য পৃথক পৃথক শিক্ষক রাখবেন এ আর আশ্চর্য কী? সংস্কৃত ভাষাটা শুনতে খটমট, কিন্তু রামগোপাল বিবেচনা করে দেখেছেন, ছাত্ররা ওটাতে

সচরাচর ফেল করে না। এ বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট। নিজে তিনি চার-চারবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছেন, অথচ কোনবারই সংস্কৃতে ফেল করেননি। হয় ঐ ইংরাজি, নয় অংক—নিদেন বাঙলা। তাই ছেলের বেলা বিষয়-বস্তুর গুরুত্ব অনুসারে পড়ার সময়টা ভাগ করে দিয়েছেন। প্রশান্ত পণ্ডিতের জন্য বাঁধা বরাদ্দ প্রতি শুক্রবার সকাল সাতটা থেকে সাড়ে আটটা। চন্দ্রবাবুও ঐ ছেলেটিকে পড়ান; ইংরাজি। নিজে চারবার ম্যাট্রিক দিয়ে রামগোপাল পরীক্ষার ঘাঁৎ-ঘোঁৎ ভালমতই বুঝে ফেলেছেন। তাই চন্দ্রবাবুকে আসতে হয় সপ্তাহে তিন দিন। প্রশান্ত পণ্ডিত সপ্তাহে দেড় ঘণ্টা হিসাবে মাসে ছয় ঘণ্টা পড়ান ছেলেটিকে। এজন্য ষাটটি মুদ্রা ব্যয় করেন রামগোপাল।

জমিদারী নেই, কিন্তু রামগোপাল প্রকৃতই কর্মবীর। চুপচাপ বসে থাকেননি। জমিদারীর ক্ষতিপূরণ বাবদ যে টাকাটা পেয়েছিলেন, তার একটা অংশ দিয়ে খুলে বসেছেন একটা লোহা-লক্কড়ের কারবার। লোহার পাত, ছড়, এ্যাংগেল, তারের জাল, বি আর সি ফ্যাব্রিকের বিরাট স্টক তাঁর। বড়বাজারের লোহাপট্টিতে তাঁর ছোট্ট দোকান, কিন্তু ভিতরে বিরাট গুদাম। টেবিলের উপর দু-দুটো টেলিফোন। তিনি নিজে কাজকর্ম দেখাশোনা করেন, কর্মচারীদের পরিচালনা করার দায়িত্বটা কোন ম্যানেজারকে ছেড়ে দেননি।

প্রশান্ত ভট্টাচার্যের অভাবের সংসার। চন্দ্রবাবু এই ছাত্রটির সন্ধান এনে দিয়েছিলেন। রামগোপালের পুত্র, রামদুলাল—ডাকনাম দুলাল। ওঁদেরই স্কুলে দুলাল পড়ে। স্কুলেরই ক'জন মাস্টারমশাই পালা করে দুলালকে পড়ান। ফলে, একবারও না আটকে সে উঠে গেছে শেষ ক্লাস পর্যন্ত। সে দুর্লভ সুযোগ নাকি তার বাবার বরাতে জোটেনি। এজন্য অবশ্য রামগোপাল তাঁর স্বর্গত পিতৃদেবকে দায়ী করে থাকেন। রামগোপালের মতে তাঁর পিতৃদেবের ভূয়োদর্শনের অভাব ছিল। যে স্কুলে তিনি অধ্যয়ন করতেন সেই স্কুল থেকে গৃহশিক্ষক সংগ্রহ না করে তিনি কোথাকার সব কলেজের অধ্যাপকদের ধরে এনেছিলেন। ফলে, রামগোপাল প্রথমবার ম্যাট্রিক দেবার সুযোগ পেয়েছিলেন বিশ বছর বয়সে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে সে ভুল নিজ পুত্রের বেলা আর হতে দেননি। দুলাল তাই ষোল বছর বয়সেই শেষ পরীক্ষায় 'এ্যালাও' হয়েছে।

কিন্তু লোহার ব্যবসায়ী লৌহ-কঠিন মানুষটি জানতেন আসল সমস্যা দেখা দেবে হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষার সময়ে। সে বড় শক্ত ঠাঁই। যাঁরা এ পরীক্ষার বিভিন্ন প্রশ্নপত্রের প্রণেতা তাঁদের সন্ধান জানা ছিল না তাঁর, না হলে একবার চেষ্টা করে দেখতেন তাঁদের আনা যায় কিনা! চেতলার এই মাস্টারগুলোকে তাড়িয়ে তাঁদের বহাল করতেন সে ক্ষেত্রে।

রামগোপাল একটি বিচিত্র চরিত্র। প্রথম দিনের আলাপে সরল মানুষ প্রশান্ত পণ্ডিত মনে মনে বলেছিলেন, লোকে রামগোপালবাবুর এত বদনাম

করে, কিন্তু আসলে লোক তো তিনি সত্যই সাচ্চা। এ রকম নির্ভেজাল খাঁটি মানুষ তো তিনি আগে কখনও দেখেননি।

এ রকম একটা ধারণা প্রশান্ত পণ্ডিত কেন করেছিলেন, জানতে হলে তাঁর নিযুক্তিকরণের সময় প্রথম দিনের কিছু কথোপকথন এখানে লিপিবদ্ধ করতে হয়।

চন্দ্রকান্তবাবুর নির্দেশ মতো প্রশান্ত পণ্ডিত এসে দেখা করেছিলেন রামগোপালের সঙ্গে, তাঁর রাসবিহারীর উপর বানানো প্রকাণ্ড বাড়িটার বৈঠকখানায়। প্রাথমিক কথাবার্তার পর রামগোপাল বললেন, তাহলে এই কথাই পাকা রইল পণ্ডিতমশাই, আপনি দুলালকে প্রতি শুক্রবার সকাল সাতটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত পড়িয়ে যাবেন। সপ্তাহে একদিন। কিন্তু আমার একটা সর্ত আছে—

—বলুন!

—আপনাকে সপ্তাহে একদিন হিসাবে মাসে চার দিন পড়াতে হবে; এবং মাসান্তে আপনাকে ষাট টাকা দেওয়ার কথা। আমি অনুরোধ করব, আপনি প্রত্যহ পনের টাকা করে নিয়ে যান। সহজ হিসাব, চার-পনেরং ষাট। যদি কোন মাসে পাঁচটা শুক্রবার পড়ে, তার জন্য আমি দায়ী—সে মাসে আপনি পাবেন পাঁচ-পনেরং পঁচাত্তর।

পণ্ডিত একটু অবাক হয়ে বলেন, এমন ব্যবস্থা করার হেতু?

রামগোপাল হাত দুটি জোড় করে বলেন, সে আপনি বুঝবেন না, পণ্ডিতমশাই। আপনি পণ্ডিত মানুষ—যজন-যাজন-অধ্যাপন-অধ্যয়ন নিয়ে আছেন। আমি লোহার কারবারী। ব্যবসায়ের হিসাবটা আমিই ভাল বুঝি। ওটা আমার ওপর ছেড়ে দিন দেখুন, আমার জীবনের ব্রত হচ্ছে, আমি কারও ধার ধারি না। ধার আমি নিই না, ধার দিইও না। কারও কাছে ঋণী আছি এটা মনে হলেই রাত্রে আমার অনিদ্রা হয়। মাসের প্রথম শুক্রবার থেকেই আমি আপনার কাছে ঋণী থাকতে রাজী নই। বিবেচনা করে দেখুন, মাসকাবারী ব্যবস্থায় আসলে কী দাঁড়াচ্ছে? মাসান্তের সময় থেকে মাসের প্রথম শুক্রবার পর্যন্ত ডেবিট-ক্রেডিট মিলে যাচ্ছে। কিন্তু তারপর থেকে মাসের শেষ দিন পর্যন্ত আমি ক্রমবর্ধমান ঋণজালে আপনার কাছে আবদ্ধ থাকব। না না, পণ্ডিতমশাই—আমি তাতে কিছুতেই রাজী নই।

প্রশান্ত পণ্ডিত রীতিমত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এমন খাঁটি মানুষ আজও তাহলে আছে কলকাতা শহরে?

বলেছিলেন, উত্তম প্রস্তাব, আমি কিজন্য আপনার অনিদ্রার কারণ হতে যাব?

প্রতি শুক্রবারে ঘড়ির কাঁটা ধরে উপস্থিত হতেন। ঘড়ি দেখবার প্রয়োজন হত না, ঠিক সাড়ে আটটায় একজন ভৃত্য এসে একটি মুখবন্ধ খাম রেখে যেত পড়বার টেবিলে। বাড়ি এসে খুলে দেখতেন, তাতে কড়কড়ে নোটে পনেরটি টাকা।

পরে একদিন এ প্রসঙ্গ তুলেছিলেন টিচার্স-রুমে। শুনে হো হো করে হেসে উঠেছিলেন অক্ষয়বাবু আর চন্দ্রবাবু। অক্ষয়বাবু বলেন, ওহো, পণ্ডিতমশাই, আপনিও ঐ ফাঁদে পড়েছেন?

—ফাঁদে? ফাঁদ কিসের? আমি তো ঠিক বুঝছি না?

—আরে মশাই, রামগোপাল একটি বাস্তুঘুঘু! ওমাসে ক'দিন পড়িয়েছেন দুলালকে?

—দুই দিন মাত্র। বাকি দুই দিন সে অনুপস্থিত ছিল।

—তবু তো ত্রিশটি টাকা জুটেছে বরাতে! এরপর এমন অবস্থা হবে যে, ভোর রাত থেকে ও বাড়ির গেটে পাহারা দিতে বসবেন। হাসি নয়, আমি তাই করি। হপ্তায় দুদিন সেই কাকডাকা ভোরে গিয়ে ওদের বাড়ির সামনে চায়ের দোকানে থানা গেড়ে বসে থাকি। আমার হচ্ছে সোম-বুধ। বিশ্বাস না হয় চন্দরবাবুকে জিজ্ঞাসা করুন। উনি আবার দারোয়ানের সঙ্গে দস্তুরীর ব্যবস্থা করেছেন। মঙ্গল-বৃহস্পতিবার আর শনিবার সকালে দারোয়ান কিছুতেই ছোটবাবুকে বাড়ির বাইরে যেতে দেয় না।

প্রশান্ত পণ্ডিত স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন।

চন্দ্রবাবু বলেন, অতি ধূর্ত ঐ রামগোপাল লোকটা। আমি তো আরও তিনটে টিউশনি করি। একটু ঝড়-বৃষ্টি হল, কি শরীরটা বেকায়দা হল, কি হোমড়া-চোমড়া লোক মারা গেলেন, আমি কামাই করি। আবার ওদিকে ছাত্রেরই শরীর খারাপ হল, বাড়িতে বিয়ে লাগল, কিম্বা ছাত্র সিনেমার টিকিট কেটে ফেলেছে—কী করা যায়, পড়ানো বন্ধ থাকে। মাসান্তে মাইনে ঠিকই পাই; কিন্তু দুলালের বেলা তা হবার উপায় নেই। আমি অনুপস্থিত কিম্বা ছাত্র অনুপস্থিত তো সেই খামওয়ালা ভৃত্যটিও অনুপস্থিত! ফেল কড়ি মাখ তেল, তুমি কি আমার পর?—রামগোপাল কালোয়ারের সব নগদ কারবার! ধার সে রাখবে না! ধার থাকলে তার নাকি রাতে ঘুম হয় না!

পরদিন সেই চিহ্নিত শুক্রবার। এতদিন কোন হাঙ্গামা ছিল না। সকালে বাজারটা সেরে দিয়ে ছাতা মাথায় চলে যেতেন ছাত্রবাড়ি। খামটা পকেটে নিয়ে ফিরে আসতেন ন'টা নাগাদ। স্নান তাঁর ব্রাহ্মমুহূর্তে সারা থাকে। প্রতিমার রান্না তৈরি থাকত। দুটো নাকেমুখে গুঁজে ছুটতেন স্কুলের দিকে।

এ শুক্রবারে তা হবার উপায় নেই। পণ্ডিত সকালে উঠেই দু মুঠো চিঁড়ে ভিজিয়ে দিলেন। দই কিনে আনলেন। পাটালি আর বাতাসাও। ওতেই এ বেলাটা-বাপ-বেটি ক্ষুন্নিবৃত্তি করবেন না হয়। খুকুকে কোলে নিয়ে ঘরে তালা লাগিয়ে পণ্ডিতমশাই রাসবিহারী-মুখো রওনা হলেন।

দুলাল বাড়িতে ছিল। উনি খুকুকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে উপক্রমণিকাখানা টেনে নেন। দুলাল বলে, আপনার মেয়ে বুঝি পণ্ডিতমশাই?

—হ্যাঁ বাবা ; এর জননী সম্প্রতি স্বর্গলাভ করেছেন। শূন্য গৃহে তাই রেখে আসতে ভরসা হয় না।

—ভালই করেছেন।

পড়ানো শুরু করবেন, সেই খাম-প্রদানকারী ভৃত্যটি অসময়ে এসে পণ্ডিতকে বললে, খুকুকে ছোটমা উপরে নিয়ে যেতে বললেন।

চশমাটা কপালে তুলে দিয়ে পণ্ডিত বলেন, ছোটমা কে ?

দুলাল বলে, আমার মা, ওঁর তো কোন ছেলেপিলে নেই, বাচ্চা দেখলেই—

পণ্ডিত অবাক বিস্ময়ে দুলালের দিকে তাকাতেই দুলাল বলে, উনি আমার আপন মা নন। আমার নিজের মা মারা গেছেন।

—ও, বুঝেছি। বেশ, নিয়ে যাও ওকে। মা-মণি, যাও ওর সঙ্গে।

ভৃত্যটির হাত ধরে বাধ্য মেয়ের মত খুকু উপরে চলে গেল। উনিও অধ্যাপনার মধ্যে ডুবে গেলেন।

ঠিক সাড়ে আটটার সময় খাম নিয়ে নেমে এল সেই চাকরটি, বললে, পণ্ডিত-মশাই, ছোটমা বলে পাঠালেন, আপনার যদি অসুবিধা না হয় তবে খুকু এখানেই থাক। ইস্কুল-ফেরত ওকে নিয়ে যাবেন। দুপুরে ও এখানেই খাবে।

অসুবিধা ? হাতে স্বর্গ পেলেন পণ্ডিত। এতদূর বিহ্বল হয়ে পড়েছেন যে, জবাব দিতে দেরি হয়ে যায় তাঁর।

দুলাল মাথা চুলকে বলল, পাড়ার কোন বাচ্চা আমাদের বাড়িতে আসে না। দোষ তাদের নয়। বাবা আবার বাচ্চা সহ্য করতে পারেন না। অথচ ছোটমা ছেলেপুলে খুবই ভালবাসেন। ওঁর নিজের তো হল না ! ওঁর সমস্ত ঘরভর্তি শুধু পুতুল, ছবির বই, রকিং হর্স আর দোলনা। যে দেখে সে-ই হাসে—

—তা, তোমার বাবা—

—বাবা তো দিল্লী গেছেন, পরশু ফিরবেন। আজ-কাল দুটো দিন খুকু আমাদের বাড়িতে থাকুক না ! পণ্ডিতমশাই, ছোটমা, মানে—

পণ্ডিত অবাক হয়ে যান। ঈশ্বরের কী বিচিত্র বিধান ! এই একটি বন্ধ্যা রমণী সন্তানের জন্য মাথা খুঁড়ে মরছে ; সন্তান মানুষ করবার মত অর্থের তার অভাব নেই—দেবতার দয়া হচ্ছে না। অথচ অনটনের সংসারে হয়তো তিনি শিশুর বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন।

ভৃত্যটি পুনরায় প্রশ্ন করে, তাহলে খুকু এখানেই থাকবে তো ?

পণ্ডিত বলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, থাকবে বইকি ! দুলালের ছোটমা যখন ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ; কিন্তু আমি ইতস্ততঃ করছিলাম এই নিমিত্ত যে, খুকুর তো দ্বিতীয় কোন অঙ্গবস্ত্র নাই—

ভৃত্যটি তাড়াতাড়ি বলে, আজ্ঞে না পণ্ডিতমশাই ; ছোটমা রামদীনকে এইমাত্র গাড়ি বার করতে বললেন। খুকুকে নিয়ে ফ্রক কিনতে যাবেন।

কুণ্ঠিত হয়ে পড়েন পণ্ডিত। কাতুপিসির দশমী রাত্রের ফলার হাত পেতে গ্রহণ করেছিলেন বলে কি এই ধনী মহিলার দেওয়া ফ্রকও—

দুলাল বলে ওঠে, আপনি চিন্তা করবেন না, পণ্ডিতমশাই ; বিকালে আপনি যদি না আসতে পারেন, আমি নিজে পৌঁছে দিয়ে আসব। হয়তো খুকু বিকালেও যেতে চাইবে না। মার ঘরটা যেন পুতুলের একটা মিউজিয়াম।

—না বাবা, এজন্য তোমাকে কোন শ্রমস্বীকার করতে হবে না ; আমি স্বয়ং এসে নিয়ে যাব।

বাসুদেবকে স্মরণ করতে করতে পণ্ডিত ফিরে এলেন তাঁর কালীঘাটের বাসায়। হে করুণাময়, তোমার লীলা বোঝা ভার। ঐ বন্ধ্যা মহিলার মনোবেদনা উপশম করানোর উদ্দেশ্যেই কি তুমি আজ আমাকে এখানে এনেছিলে ?

দই-চিঁড়ের ফলার সেরে পণ্ডিত চলে গেলেন স্কুলে।

স্কুল ছুটির পর বাড়ি না গিয়ে সোজা রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর দিকে রওনা দেন। দুলাল তখনও ফেরেনি। বোধ হয় স্কুল থেকে সোজাই খেলার মাঠের দিকে গিয়েছে। বাইরের ঘরে ঢুকতেই মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল রামগোপালের সঙ্গে। গৃহকর্তা রীতিমত বিরক্তি প্রকাশ করে বলে ওঠেন, এসব উপদ্রব করলে তো আমি পারব না, মাস্টারমশাই।

পণ্ডিত আকাশ থেকে পড়েন, উপদ্রব ? কী বলছেন আপনি ?

—আমার মশাই নির্ঝঞ্ঝাট সংসার। ওসব ঝঞ্ঝেরা আমার এখানে চলবে না। সমস্ত দিন আপনার মেয়ে আমাদের ওপর অত্যাচার করেছে। দুপুরে কেউ দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি।

পণ্ডিত কঠিনস্বরে বলেছিলেন, আপনি ভুল করছেন। আমি উপযাচক হয়ে আপনার ভদ্রাসনে আমার কন্যাকে রেখে যাইনি। আপনার স্ত্রীই—

—কিন্তু আমার স্ত্রী যে বিকৃতমস্তিষ্কা তা তো আপনি জানেন—

—বিকৃতমস্তিষ্কা! আজ্ঞে না, আমি তো কিছুই জানতাম না! দুলাল—

—দুলাল কি বলবে তার মা পাগল ?

পণ্ডিত অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে বলেন, খুকুমাকে যদি ডেকে দেন—

—তাকে আমি চাকর দিয়ে আপনার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি। অত্যন্ত বেয়াদপ মেয়ে। সমস্ত ঘরদোর লণ্ডভণ্ড করেছে ; একটা চীনামাটির ফুলদানি ভেঙেছে—

পণ্ডিত বিশ্বাস করতে পারেন না। খুকু অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের মেয়ে। অপরিচিত একজনের বাড়িতে এসে ফুলদানি সে নিশ্চয় ইচ্ছা করে ভাঙেনি। কিন্তু চীনেমাটির ফুলদানিতে সে হাতই বা দেবে কেন ? তাছাড়া ঘরদোর সে লণ্ডভণ্ড করবে কেন ?

বিনা বাক্যব্যয়ে কুণ্ঠিতভাবে পণ্ডিত চলে আসেন কালীঘাটে। গলির

মোড় ঘুরতেই দেখেন বন্ধ দরজার সামনে, টুমটুম্ হয়ে খুকু বসে আছে সিঁড়িটার উপর। মুখটা ভার। বাপকে দেখে ঠোঁট দুটো ফুলে ওঠে তার। পণ্ডিতের দ্বার খোলারও তর সয় না। হাতের নড়া ধরে ওকে টেনে দাঁড় করিয়ে দেন। গর্জন করে ওঠেন, ওদের ফুলদানি ভেঙেছিস্ ?

বাপেরই মেয়ে তো ; মিথ্যা কথা বলতে পারে না, ঘাড় নেড়ে বলে, হুঁ !

—কেন ? কেন ভাঙলি ?

খুকু ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, ওরা পাজি, ওরা দুষ্টু, ওরা—

কথাটা শেষ হয় না তার। প্রচণ্ড রাগে ওর গালে ঠাস্ করে এক চড় মেরে বসেন, অসভ্য ! ইতর ! এই শিক্ষা হচ্ছে তোমার ?

চড়টা বোধহয় মাত্রাতিরিক্ত জোরে হয়ে গিয়েছিল। খুকু সামলাতে পারে না। উল্টে পড়ে যায়।

ঠিক তখনই একটা সাইকেল এসে থামে তার পাশে। দুলাল সাইকেল থেকে নেমে সেটাকে ঠেকিয়ে রাখে প্রাচীরে। পণ্ডিত মশাইয়ের উদ্যত হাতটা ধরে ফেলে বলে, ওকে মারবেন না, স্যার !

প্রচণ্ড ক্রোধে ঘুরে দাঁড়ান পণ্ডিত। বলেন, কেন তুমি বলনি যে, তোমার ছোটমা বিকৃতমস্তিষ্কা ?

দুলাল এতটুকু হয়ে যায়। চোখটা নেমে যায়। চোখে চোখে আর তাকাতে পারছে না।

—বল, উত্তর দাও !

মেদিনীনিবদ্ধ-দৃষ্টি দুলাল কুণ্ঠিতস্বরে বলে, কথাটা সত্যি নয় স্যার, তাই বলিনি।

অবাক হয়ে পণ্ডিত বলেন, কিন্তু তোমার যে পিতা বললেন—

—বাবা সত্যি কথা বলেননি।

খুকুকে সে কোলে নেয়, বলে, দরজাটা খুলুন, ঘরে চলুন, বলছি !

যন্ত্রচালিতের মত পণ্ডিত তালা খুলে ঘরে ঢোকেন। খুকু তখন দুলালের কাঁধে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদছে। ওর ছোট নরম গালে পণ্ডিতের কড়া আঙুলের পাঁচটা দাগ ফুটে উঠেছে।

জুতা খুলে দুলাল ঘরে ঢোকে, চৌকির একপ্রান্তে বসে বলে, এসব কথা আমার বলা শোভন নয়, কিন্তু সব কথা না বললে আপনাকে বোঝাতে পারব না যে, খুকুর কোন দোষ নেই !

—কী বলতে চাইছ তুমি ? তোমার জননী—

বাধা দিয়ে দুলাল বললে, না স্যার, উনি আমার মা নন !

পণ্ডিত বলেন ; সে তো জানি, তোমার গর্ভধারিণী নন, কিন্তু—

—না স্যার, উনি—মানে, ওঁকে আমার বাবা বিবাহ করেননি !

পণ্ডিত স্তম্ভিত হয়ে যান।

মাটির দিকেই তাকিয়ে আছে দুলাল। তার কাঁধে মাথা রেখে খুকু তখনও ফুলে ফুলে কাঁদছে। দুলাল আর মাথাটা তুলতে পারে না। ঐভাবেই বলে, আমার মা মারা যাবার পর থেকেই উনি আমাদের বাড়িতে আছেন। আমার মায়ের মতই—

—ও!

—উনি বন্ধ্যাও নন, স্যার! পাছে বাবার সম্পত্তিতে আমার পুরো অধিকার না আসে, তাই ছোটমাকে—

ব্যাপারটা বুঝতে পারেন না পণ্ডিত। থেমে-যাওয়া বাক্যটাকে শেষ করতে প্রশ্ন করেন, তাই তোমার ছোটমাকে—

—উনি অপারেশন করে মা হতে দেননি!

পণ্ডিতের বিশ্বাস হয় না। একজন মানুষ একটি নারীকে এনে সংসারে স্ত্রীর মত থাকতে দেবে, অথচ তাকে জোর করে মা হতে দেবে না, এ কেমন করে সম্ভব? কিন্তু দুলাল অহেতুক নিজের পিতার নামে এতবড় অভিযোগই বা আনবে কেন? পণ্ডিতের বিশ্বাস, তাঁর দিকে তাকিয়ে, চোখে চোখ রেখে তাঁর কোন ছাত্র মিথ্যা কথা বলতে পারবে না। সেই ধারণার জোরে বলেন, আমার দিকে দৃক্‌পাত কর তো দুলাল—

দুলাল আদেশ পালন করল, মুখ তুলে পণ্ডিতমশাইয়ের দিকে চোখে চোখ রেখে তাকাল। পণ্ডিত দেখলেন, তার দুচোখ বেয়ে জল ঝরছে। অশ্রুআর্দ্র কণ্ঠে দুলাল বললে, আমি জানি, এর পর থেকে আপনি আমাকে ঘৃণা করবেন! নিজের বাপের নামে—

—দুলাল!

খুকুকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে দুলাল দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখটা মোছে।

—কিন্তু ফুলদানিটা ভাঙল কেমন করে?

পিছন ফিরে ঐভাবে দাঁড়িয়েই দুলাল বলল, এই মাত্র সেকথা শুনলাম ছোটমার কাছে। বাবা হঠাৎ দিল্লি থেকে দুপুরে ফিরে এসেছে। বাবা ছোট ছেলেপিলেকে একদম দেখতে পারে না। তার ভয়েই পাড়ায় কোন বাচ্চা ছোটমার কাছে আসে না। খুকুকে দেখেই ক্ষেপে উঠেছিল। খুকুকে ভয় দেখাতে আমাদের কুকুরটাকে···খুকু, মানে ইচ্ছে করে ফুলদানিটা ভাঙেনি, স্যার! বিশ্বাস করুন। ছোটমা নিজে তখন সেখানে ছিলেন। কুকুরটার ভয়ে ছুটে পালাতে গিয়েই···

পণ্ডিত কেমন যেন উদাস হয়ে যান।

দুলাল কুণ্ঠিত স্বরে বলে, অপরাধটা আমারই। ছোটমার জন্য আমার ভারি দুঃখ হয়, স্যার। তাই খুকুকে দুপুরে আটকে রেখেছিলাম। আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি যে, উনি হঠাৎ ফিরে আসবেন।

পণ্ডিত উদাস কণ্ঠেই বলেন, হা ঈশ্বর! তোমার লীলা—

—না!

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায় দুলাল। আবার তাকায় পণ্ডিতের মুখোমুখি। এবার আর তার চোখে জল নেই, বিদ্যুৎ। বললে, ঈশ্বর নেই। যদি থাকেন তবে হয় তিনি অন্ধ, নয় বধির।

পণ্ডিত মৌখিক প্রতিবাদ করেন না। দুহাতে নিজের কান বন্ধ করেন।

—হ্যাঁ, ঐ আপনার মতো! তিনি আমাদের প্রার্থনা শোনেন দুহাতে কান ঢেকে। আমার এক এক সময় ইচ্ছে হয় নিজেকে খুন করি!

কান থেকে হাতটা সরে আসে পণ্ডিতের, বলেন, কী বলছ দুলাল? আত্মহত্যা মহাপাপ!

—আত্মহত্যা নয় স্যার খুন। নিজেকে খুন। তাহলেই ছোটমার প্রতি যে অমানুষিক অন্যায় করা হয়েছে তার প্রতিশোধ আমি নিতে পারি! ঐ সম্পত্তি আমি কোনদিন ভোগ করতে পারব ভেবেছেন?

—দুলাল?

দুলাল আর দাঁড়ায় না। দ্রুতপদে বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে। পণ্ডিত বাধা দেন না। স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকেন।

একটু পরে আবার ফিরে আসে দুলাল, বলে, একটা কথা ভুলে গিয়েছিলাম স্যার, এটা ছোটমা খুকুর জন্য কিনেছিলেন—

সিল্কের একটা ফ্রক দুলাল বাড়িয়ে ধরে।

পণ্ডিত হাত বাড়িয়ে বলেন, দাও!

এবার বিস্মিত হবার পালা দুলালের, বলে, এটা আপনি নেবেন?

—কেন নেব না?

—আশ্চর্য! আমি ছোটমাকে বলে এসেছিলাম, এটা আপনি কিছুতেই নেবেন না। সব কথা শোনার পর আপনি কিছুতেই—

পণ্ডিত বললেন, দারিদ্র্যের অভিমানে তোমার ছোটমার স্নেহের দানটা প্রত্যাখ্যান করলেই কি এ অন্যায়ের প্রতিবাদ হত দুলাল? খুকুর প্রতি তাঁর ভালবাসাটায় তো কোন মালিন্য স্পর্শ করেনি!

কোথাও কিছু নেই, দুলাল হঠাৎ পণ্ডিতমশাইকে প্রণাম করে।

পণ্ডিত টের পান না। কেমন যেন উদাস হয়ে গেছেন তিনি। আত্মমগ্ন হয়ে গেছেন। দুলাল কখন যে চলে গেছে, টের পাননি। উনি ভাবছিলেন, ফ্রকটা নিয়ে কি তিনি ঠিক করলেন? ঐ মহিলাকে রামগোপালবাবু বিবাহ করেননি, অথচ ঘরে স্থান দিয়েছেন। স্ত্রীর মত রেখেছেন। মহিলাটিকে তিনি দেখেননি, জানেন না, হয়তো সদ্বংশজাতাও তিনি নন—না হলে আনুষ্ঠানিক বিবাহে বাধা হবে কেন? হয়তো কোন পণ্যাঙ্গনার ঘরে তাঁর জন্ম, হয়তো বহু-পরিচর্যার পর তিনি এসে আশ্রয় পেয়েছেন ঐ ধনকুবের লৌহ-ব্যবসায়ীর

গৃহে, শুধুমাত্র রূপের জোরে। এরূপ একটি মহিলার দান কি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের গ্রহণযোগ্য? কিন্তু ঐ মুহূর্তে এসব কথা মনে পড়েনি পণ্ডিতের। মনে পড়েছিল, পাড়ার কোন ছোট ছেলেমেয়েকে ওবাড়িত আসতে দেওয়া হয় না। হয়তো তাঁর ঐ পূর্ব-কথা প্রতিবেশীরা জানে, অথবা হয়তো রাম-গোপালের ভয়েই তারা শিশুদের ওবাড়ি যেতে দেয় না। মনে পড়েছিল, ভদ্রমহিলার ঘর নাকি শুধু পুতুলে ভর্তি; দুলাল বলেছিল, সেটা পুতুলের মিউজিয়াম—তিন চাকার সাইকেল, রকিং হর্স আর দোলনা! অতৃপ্ত মাতৃত্বের কামনায় মহিলা মরমে মরে আছেন। মনে পড়েছিল, বিদ্যাসাগরমশাইয়ের কথা: সন্ধ্যার অন্ধকারে কুটির দ্বারে অপেক্ষমাণা বারনারীর হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে ঘরে-ফেরা বিদ্যাসাগরমশাই নাকি বলেছিলেন, অনেক রাত হয়ে গেছে মা, এবার শুতে যাও!

না! অন্যায় তিনি করেননি। কাতুপিসির দশমীর রাত্রের আহার্য যদি তিনি হাত পেতে নিতে পেরে থাকেন, তবে ঐ অপরিচিতা ভ্রষ্টা রমণীর স্নেহের দানটা প্রত্যাখ্যান না করেই তিনি স্বধর্ম বজায় রেখেছেন।

যতীন আর সে রাত্রে এল না। কাতুপিসিও খোঁজ নিতে এল না। বোধকরি নিজের সংসারেই বেচারি জড়িয়ে পড়েছে। পরের গলগ্রহ সে; খুকুর প্রতি তার স্নেহের আতিশয্য তার পুত্রবধূরা ভাল চোখে দেখছে না।

অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে, সব কথা না জেনে খুকুকে আঘাত করা অন্যায়ই হয়েছে তাঁর। এমন তো তিনি করেন না কখনও? আজ হঠাৎ এত রাগ হয়ে গেল কেন? ব্রাহ্মণের তো এমন চণ্ডালে রাগ হওয়া উচিত নয়! স্থির করলেন, রাত্রে উপবাস করবেন। প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। খুকুও কিছুতেই কিছু খেতে রাজী হল না। একনাগাড়ে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। মার খেয়ে তার দুরন্ত অভিমান হয়েছে। বাপের কাছে কখনও সে মার খায়নি। অমন একটা ভয়ংকর কুকুরের সামনে থেকে ছুটে পালাতে গিয়েই না সে আছাড় খেয়ে পড়েছে? ফুলদানিটা কি সে ইচ্ছে করে ভেঙেছে? ঐ লোকটা কেন তাকে কুকুর লেলিয়ে দিল? খুকু তো ঠিকই বলেছে। ও লোকটা তো দুষ্টুই, পাজিই। বাবা কেন খুকুকে মারল? বাবার সঙ্গে ও আর কথাই বলবে না। বাবা ওকে একটুও ভালবাসে না। বাবার কাছে ও থাকবেই না! বাবার চেয়ে—

ঠোঁট দুটো আবার ফুলে ওঠে তার। জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে সে। রাত্রের সেই নক্ষত্রটা জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে আজও। অভিমানী খুকু তাকেই বলতে থাকে, আর কখনও দুষ্টুমি করবনা।

শনিবার দিন স্কুলে বেশ সোরগোল পড়ে গেল ছাত্রমহলে। থার্ড-পণ্ডিত-মশাই স্কুলে এসেছেন, কাঁধের উপর একটি খুকিকে নিয়ে।

গেটের কাছেই ক্লাস ইলেভেনের একটি চ্যাঙড়া ছেলে পণ্ডিতকে আটকে বলে, খুকিকে আমাদের ক্লাসে ভর্তি করে দিন, স্যার!

আর একজন বললে, দুনিয়ার সব স্কুলেই এখন কো-এডুকেশন চালু হয়ে গেছে স্যার, একমাত্র আমরাই পেছিয়ে আছি। আমরা সবাই মিলে হেডমাস্টার-মশাইকে গিয়ে ধরব, খুকুকে আমাদের স্কুলে ভর্তি করাতে হবে!

—আপনি হুকুম দিন স্যার, আমরা সবাই ধম্মঘট করব। আমাদের শ্লোগান হবে—'খুকুকে ভর্তি করতে হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে!'

পণ্ডিত হাসেন। ওদের ছদ্ম-তাড়না করে বলেন, যা যা, ক্লাসে যা সব, পালা। অনডুবান কোথাকার! আর শোন, ধম্মঘট বলিস কেন? কথাটা ধর্মঘট।

চন্দ্রকান্তবাবু এসে পড়েন সেই সময়। চন্দ্রবাবুকে ছেলেরা ভয় করে। সবাই পালাবার পথ পায় না। চন্দ্রবাবু পণ্ডিতের দিকে ফিরে বলেন, শেষ পর্যন্ত মেয়েকে স্কুলে নিয়ে এলেন?

—কী করি বলুন?

—কোথায় রাখবেন ওকে?

—ভাবছি দারোয়ানজী, মানে শিউচরণের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করে নেব।

কথা বলতে বলতে ওঁরা টিচার্স রুমে এসে পড়েন। অক্ষয়বাবু বলেন, শেষকালে হেডমাস্টারমশাই না আবার রাগারাগি করেন—

মৌলভী সাহেব বলেন, রাগ করা সহজ অক্ষয়বাবু; কিন্তু পণ্ডিতমশাইকে তার আগে একটা পথ তো আপনাদের বাৎলাতে হবে! উনি আর কী করতে পারেন!

ক্লাসের ঘণ্টা পড়ে গেল। শিউচরণের সাক্ষাৎ পেলেন না পণ্ডিতমশাই। ঘরে ঘরে তালা খুলে দিয়ে তার ডিউটি আপাতত শেষ হয়েছে। অগত্যা খুকুকে টিচার্স রুমে বসিয়ে রেখে ক্লাস নিতে গেলেন। বারে বারে ওকে বলে বুঝিয়ে গেলেন, সে যেন কোন জিনিসে হাত না দেয়। বললেন, তুমি লক্ষ্মী হয়ে বসে থেকো মা-মণি, আমি ক্লাসটা নিয়েই ফিরে আসব।

খুকু তার কাঠের পুতুলটাকে কোলে করে নিয়ে এসেছিল। টেবিলের উপর বসে থাবড়ে থাবড়ে পুতুলটাকে ঘুম পাড়াচ্ছিল। ঘাড় নেড়ে সে সায় দেয়।

প্রথম ঘণ্টাটা নিরুপদ্রবে কেটে গেল। একেবারে নির্ঝঞ্ঝাটে অবশ্য নয়। খবরটা সারা স্কুলে রটে গিয়েছিল। বিভিন্ন ক্লাসের ছেলেরা দল বেঁধে ক্রমাগত টিচার্স রুমে এসে উঁকি-ঝুঁকি মারতে থাকে। থার্ড-পণ্ডিতের মেয়েকে দেখবার জন্য তাদের অদম্য কৌতূহল। পণ্ডিত বুঝে উঠতে পারেন না, খুকু এত বড় আকর্ষণীয় হয়ে পড়ল কেন হঠাৎ? বারে বারে বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে ওদের বলে-বুঝিয়ে ক্লাসে ফেরত পাঠাতে হচ্ছে। হেডমাস্টারমশাই অবশ্য এখনও হস্তক্ষেপ করেননি; কিন্তু ব্যাপারটা বোধহয় তিনি জানতে পেরেছেন।

সেকেণ্ড পিরিয়ডের ঘণ্টা শুরু হতে ছেলেরা দুড়দাড় করে যে-যার ক্লাসে চলে গেল। পণ্ডিতমশাই আবার খুকুকে নানাভাবে তালিম দিয়ে চক আর ডাস্টার নিয়ে ক্লাস এইটের দিকে যাচ্ছিলেন, চন্দ্রবাবুকে দেখতে পেয়ে বলেন, কী বিপদ বলুন তো! খুকুকে দর্শনের জন্য ছাত্রেরা এত কৌতূহলী হয়ে উঠবে আশঙ্কা করলে তাকে আমি বিদ্যালয়ে আনতামই না।

চন্দ্রবাবু হেসে বলেন, ওদের এত প্রচণ্ড আগ্রহ কেন জানেন?

—না, কেন বলুন তো?

—কতকগুলো চ্যাঙড়া রটিয়ে দিয়েছে থার্ড-পণ্ডিতের মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী আর তার বয়স পনের বছর!

পণ্ডিত অবাক হয়ে বলেন, এমন অনৃতভাষণের উদ্দেশ্য?

—দুষ্টামি, আর কী!

—কিন্তু তাতেই বা এবম্প্রকার ভীড় হবে কেন?

এবার অবাক হওয়ার পালা চন্দ্রবাবুর। একটা ঢোঁক গিলে তিনি বলেন, সকলকে সব কথা বুঝবার ক্ষমতা তো ভগবান আমাদের দেন না; তাই ছাত্রদের 'এবম্প্রকার' মতিগতি কেন হয়েছে, তাও আপনাকে আমি বুঝিয়ে দিতে পারব না!

পণ্ডিত ব্রহ্মতালুতে হাত বুলাতে বুলাতে বলেন, আপনি ঐ কথা বলে সর্ব সময়ে আসল সত্যটা গোপন করেন কেন বলুন তো? কী এমন কঠিন বেদান্ত-ভাষ্য যে, বুঝিয়ে দিলেও প্রণিধান করতে পারব না?

এবার চন্দ্রবাবু হেসে বলেন, পণ্ডিতমশাই, এটা কঠিন বেদান্তভাষ্য নয় বলেই আপনি বুঝবেন না—যান, ক্লাস নিন গে।

কিন্তু দ্বিতীয় ঘণ্টাটা আর নিরুপদ্রবে কাটল না, ঘণ্টার মাঝামাঝি একটা হৈ-চৈ চীৎকার শুনে চমকে উঠেছিলেন তিনি।

পরমুহূর্তেই একটি ছাত্র ছুটে এসে বললে, শীগ্‌গির আসুন স্যার! আপনার মেয়ে জলে ডুবে গেছে!

—জলে ডুবে গেছে?

হন্তদন্ত হয়ে পণ্ডিত ছুটে বেরিয়ে আসেন। সমস্ত স্কুল তখন ভেঙে পড়েছে বিদ্যালয়-সংলগ্ন পুকুরঘাটে। ভীড় ঠেলে গিয়ে দেখেন, ব্যাপার তেমন গুরুতর নয়। তবে গুরুতর হতে পারত। খুকুর পুতুলের গরম লেগেছিল, তা তো লাগতেই পারে! শীতের দিনে পুতুলেরই তো গরম লাগে! তাই সে টিচার্স রুম থেকে বেরিয়ে পড়ে। গুটি-গুটি চলে আসে পুকুর পাড়ে। পুতুলকে স্নান করাতে। ঘাটে শিউচরণ তখন তার লোটা মাজছিল। খুকু জলের কাছে এগিয়ে আসে। শিউচরণ তখন লক্ষ্য করেনি। ঘাটের শেষ ধাপে বেশ শ্যাওলা জন্মেছে। খুকু সেখানে যেতেই উল্টে জলে পড়ে যায়। সেই শব্দে শিউচরণ মুখ ঘুরিয়ে তাকে দেখতে পায়। খুকুর পরিচয় সে জানত না। ওখানে

খুকুর ডুব জলও ছিল না ; কিন্তু আর একটু গড়িয়ে গেলেই সে ডুব জলে চলে যেত। শিউচরণ তাকে টেনে তোলে।

শিউচরণ বলে, রামজী রক্‌শা করেছেন পণ্ডিত মাশা। হামি অচানক দেখতে পেলাম, এক ঝাঁপ দিয়ে খোঁকিকে উঠিয়ে নিয়ে এলাম।

খুকুর ফ্রক-প্যাণ্ট-জুতো সব জলে ভিজে একশা। চন্দ্রবাবু গর্জন করে ছেলেদের ক্লাসে ফেরত পাঠালেন, যাও যাও, যে-যার ক্লাসে যাও! এ কি রথ, না দোল, এ্যাঁ! গো—

হুড়মুড়িয়ে ছেলের দল সব ক্লাসে ফিরে গেল।

হেডমাস্টারমশাই পণ্ডিতের কাছে সরে এসে বলেন, আর ক'টা ক্লাস বাকি আছে আপনার?

—এই তৃতীয় ঘণ্টার নাইন-বি-তে ব্যাকরণের একটা পাঠ!

—ওটা আর আপনাকে আজ নিতে হবে না। আপনি বাড়ি যান। মেয়েটা একেবারে ভিজে গেছে। আর শুনুন, এর পর থেকে ওকে আর স্কুলে নিয়ে আসবেন না।

পণ্ডিত মাথা নেড়ে সায় দেন।

খুকুকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে তাকে প্রশ্ন করেন, তোমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলাম কোথাও যেও না, কেন পুষ্করিণীর ধারে গিয়েছিলে?

খুকু সলজ্জে বলে, এই ছেলেকে নিয়েই হয়েছে আমার জ্বালা! একেবারে কথা শোনে না। ভীষণ বায়না! সেই ছান করল তবে কান্না থামল ছেলের!

কী আর বলবেন পণ্ডিত! সন্তানকে নিয়েই তো পিতামাতার জ্বালা! পণ্ডিত তাঁর খুকুকে নিয়ে যতটা বিব্রত, মনে হল খুকু তার পুতুলকে নিয়ে তার চেয়েও বেশি বিব্রত। হাজার হোক খুকুর কোন বায়না নেই, অথচ খুকুর পুতুলের কী বায়না! তাই ওকে আর বকলেন না ; শুধু বললেন, 'ছান' বল না, মা-মণি। শব্দটা 'স্নান'।

রবিবার সকালবেলা চন্দ্রবাবু এসে হাজির।

পণ্ডিত শশব্যস্তে ওঁকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। বলেন, আমার গৃহে তো চায়ের আয়োজন নাই, যদি অনুমতি করেন সম্মুখের দোকান থেকে এক পেয়ালা নিয়ে আসি!

চন্দ্রবাবু বলেন, বসুন, আপনি ব্যস্ত হবেন না। চা আমি খেয়েই বেরিয়েছি! বারে বারে চা খেলে অম্বল হয়।

—কিঞ্চিত দুগ্ধ আছে। উত্তপ্ত করে দেব?

—না মশাই! উত্তপ্ত দুগ্ধপান মানসে আমি এখানে আগমন করিনি। আমার কিছু নিবেদন আছে, আপনি নিজে উত্তপ্ত না হয়ে উঠলেই বাঁচি!

পণ্ডিত হেসে বলেন, না না, আমি অত সহজে উত্তপ্ত হই না, বলুন!

—কী স্থির করলেন ?

—কী বিষয়ে ?

—বিষয় তো একটাই। আপনার মেয়ের বিষয়।

পণ্ডিত ব্রহ্মতালুতে হাত বুলাতে বুলাতে বলেন, ঐ চিন্তাতে আমার ঈশ্বর-চিন্তাও বন্ধ হয়ে গেছে চন্দ্রকান্তবাবু। কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারিনি। আপনি কী পরামর্শ দেন ?

—আপনার পিসি-খুড়ি-মাসি-জেঠি এমন কোন বিধবা বুড়ির কথা চিন্তা করতে পারেন, যাঁকে এখানে এনে রাখা যায় ?

বৃদ্ধ মাথা নেড়ে বলেন, সেদিক হতে আমি সম্পূর্ণ দুর্ভাগা !

—আপনার স্ত্রীর কোন নিকট-আত্মীয়া আছেন, যিনি ওকে মানুষ করতে রাজী হবেন ?

—আমার স্ত্রীর পিতৃকুলের সকল সংবাদই তো আপনি অবগত আছেন চন্দ্রকান্তবাবু। থাকার মধ্যে আছে খুকু-মার একজন মামীমা ; কিন্তু তিনি—

—জানি মশাই, সে মাগীর কথা আমি ভালমতই জানি।

প্রশান্ত পণ্ডিত অত্যন্ত কুণ্ঠিত স্বরে বলেন, চন্দ্রকান্তবাবু, আপনি শিক্ষক। আপনি ছাত্রদের আদর্শ। আপনি নিজেই যদি এপ্রকার প্রাকৃত ভাষায়—

চন্দ্রবাবু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, আচ্ছা থাক থাক। হয়েছে। আমার বক্তব্য, খুকুর মামীমাতা ঠাকুরাণীকে আমি অস্থিতে অস্থিতে চিনি। তাঁর মত নিরঙ্কুশ ভর্তারহন্ত্রী, মার্জারাক্ষী, পেঁচকমুখী, অমঙ্গলভাষিণী ভদ্রমহিলা আমি জীবনে দুটি দেখিনি। কী, অমন করে তাকাচ্ছেন কেন ? আমি তো আদর্শ শিক্ষকের উপযুক্ত ভাষায় কথা বলছি। একটিও প্রাকৃত শব্দ উচ্চারণ করিনি—

পণ্ডিত হেসে বলেন, অনুপস্থিত মহিলার সম্মান আর নাই বা বৃদ্ধি করলেন। এ ক্ষেত্রে আপনি আমাকে কী পরামর্শ দেন ?

—আমার পরামর্শ শুনবেন ?

—শুনব বলেই তো প্রশ্ন উত্থাপন করছি !

—আপনি আবার একটি বিয়ে করুন।

পণ্ডিত একলাফে চৌকি থেকে নেমে পড়েন, বলেন, এই কি আপনার রসিকতা করবার উপযুক্ত সময় ?

চন্দ্রবাবু গম্ভীর হয়ে বলেন, রসিকতা আমি করিনি পণ্ডিতমশাই। আমি সত্য কথাই বলছি। এ ছাড়া আমি তো গত্যন্তর দেখি না। চেষ্টার তো আপনি ত্রুটি করেননি। পারলেন কোন সমাধান করতে ? আমার কথা শুনুন। সেকথা বলতেই এসেছি আমি।

—আপনি কী বলছেন ? বিবাহ করার মত কি বয়স আছে আমার ?

—কত বয়স হল আপনার ? উনপঞ্চাশ তো ?

বৃদ্ধ ঘাড় নেড়ে সায় দেন।

—ওতে আটকাবে না।

—না মশাই। ঐ ভ্রান্তির মধ্যে আমি আর যাব না। যথেষ্ট শিক্ষা আমার ইতিপূর্বেই হয়েছে। পূর্বেই আমার প্রণিধান করা উচিত ছিল, মূল ধাতুটা 'বহ্'।

—কিসের ধাতু?

—বিবাহের।

—এ আবার কোন জাতের হেঁয়ালী? বিবাহ কি ধাতব পদার্থ?

—আজ্ঞে না, আমি ওর ব্যুৎপত্তিগত অর্থটার কথা বলছিলাম। বিবাহ হচ্ছে, বি-পূর্বক বহ্ ধাতু ঘঞ্। অর্থাৎ কিনা, বিশেষভাবে বহন করা। এ বয়সে আমার আর বহন করবার কোন ক্ষমতা নাই চন্দ্রকান্তবাবু!

হো-হো করে হেসে ওঠেন চন্দ্রবাবু।

চন্দ্রবাবু চলে যাবার পর প্রশান্ত পণ্ডিত সমস্ত বিষয়টা আবার একবার তলিয়ে দেখেন। সত্যই তাঁর চেষ্টার কোন ত্রুটি হয়নি। মা-হারা একটি অনাথ শিশুকে এই দুনিয়ায় মানুষ করে তুলবার জন্য তিনি যাবতীয় কৃচ্ছ্র-সাধনের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু কোন একটা ব্যবস্থা করে উঠতে পারলেন কই? তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে আর কারও মিল হচ্ছে না। সকলের ধারণা, তিনি রূঢ়ভাষী। তাঁর চরিত্রের কাঠিন্যটাই সকলের সর্বাগ্রে নজরে পড়ে। তিনি ওদের চোখে পাষণ্ড-পণ্ডিত। হয়তো সেজন্য তাঁর আকৃতিটা আংশিকভাবে দায়ী। ঐ বাজে পোড়া তালগাছটার মত মানুষটার অন্তরেও যে কোমলতার কোন আমেজ থাকতে পারে এটা দুনিয়া বিশ্বাস করল না। না করল, নাই করল—তিনি তো কারও করুণা বা সহানুভূতির প্রত্যাশী নন? কিন্তু তাঁর মা-মণির আকৃতিতে তো কাঠিন্যের কোন ছাপ নেই? অতটুকু মেয়েটাকে দেখেও কারও মন নরম হল না? যারা একটু আহা-উহু করবার উপক্রম করেছিল, আর পাঁচজন তাদের গলা টিপে ধরল। কাত্যায়নী তার পুত্রবধূদের ভয়ে এপথ মাড়ায় না, দুলালের মা তার স্বামীর ভয়ে ওকে কোলে করতে ভয় পায়। যতীনই ঠিক বলেছিল, এ শহরটায় মানুষ নেই। এই কলকাতা শহরটার সর্বাঙ্গে বিষক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। এখানে তিনি তাঁর মা-মণিকে মানুষ করে তুলতে পারবেন না। এখানে শুধুই স্বার্থপরতা। শুধুই পরশ্রীকাতরতা এবং নিষ্ঠুরতা। কিন্তু তা তো হবার কথা নয়। দুঃখ তো জীবনের শেষ কথা হতে পারে না। আনন্দই যে জীবনের মূল উৎস। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দ থেকেই এ জগৎ-প্রপঞ্চের উৎপত্তি। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দকে মূলধন করে জগত বেঁচে আছে। এমনকি ঐ যে আপাতনিষ্ঠুর মৃত্যু, ঐ যে বিয়োগব্যথার আঘাত তাও এই আনন্দ-ছন্দের

তালে তাল দিয়ে বেজে চলেছে। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। এ মন্ত্র শুধু মুখে উচ্চারণ করলেই চলবে না, শ্রদ্ধাবনম্রচিত্তে এ মন্ত্রকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে হবে। বিশ্বাস রাখতে হবে প্রতিমার ঐ প্রয়াণও সেই মঙ্গলময়ের আনন্দ-ঘন পরিকল্পনার একটা অংশ। হয়তো যতীনের কথাই সত্য, মুক্তি পেয়েছে প্রতিমা। পণ্ডিতের এই সংসার ছেড়ে চলে যেতে পেরে সে বন্ধনমুক্তির স্বাদ পেয়েছে। চিরশান্তির রাজ্যে আজ সে সকল দুশ্চিন্তা-দুর্দশার অত্যাচার থেকে মুক্ত। শান্ত সমাহিত চিত্তে এ আশীর্বাদ গ্রহণ করতে হবে পণ্ডিতকে।

কিন্তু তিনি তো মুক্তি পাননি! জাগতিক বন্ধন আজও যে তাঁর মজ্জায়-মজ্জায় জড়ানো। খুকুকে শুধু বাঁচিয়ে রাখা নয়, তাকে ঐ আনন্দঘন জীবন-ছন্দে অভিষিক্ত করতে হবে। এ শহরে তা সম্ভব নয়। চন্দ্রকান্তবাবুর প্রস্তাব বিবেচনা করার প্রশ্নই ওঠে না। তিনি বরং এই শহরটাকেই ত্যাগ করে যাবেন। যেখানে গাড়ি ঘোড়ার ভীড় নেই, যেখানে প্রতিবেশীরা এত নিরুত্তাপ উদাসীন নয়, সেই সাঁওতাল পরগণাতে গিয়েই একটি কুটির বাঁধবেন। যতীনের পরামর্শ মতো। বাপ-বেটির সেই নূতন আস্তানার ধারে-কাছে থাকবে শুধু সেই নেংটিসার জংলী মানুষ—যারা সভ্য জগতের ক্লেদাক্ত অভিশাপ থেকে মুক্ত।

সোমবার ছুটির পর যতীনের সেই কার্ডখানা সম্বল করে তিনি ডালহৌসী স্কোয়ার-মুখো একটি ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠে বসেন।

অফিস ছুটির চঞ্চলতায় ডালহৌসি স্কোয়ারে তখন ঘরে ফেরার তাড়া। খুঁজতে খুঁজতে পণ্ডিত এসে পড়লেন নির্দেশিত ঠিকানায়, প্রকাণ্ড প্রাসাদের সম্মুখে। অফিস-বাড়ির প্রথমেই একটি কাঁচের ঘেরা কাউণ্টার। তার ওপাশে একজন মেমসাহেব বসে আছেন চেয়ারে। সামনে টেলিফোন। পণ্ডিত সসঙ্কোচে কার্ডখানি বার করে তাঁকে দেখালেন।

মেমসাহেব ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে প্রশ্ন করেন, মিস্টার সাধুখাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান? এ কার্ড কোথায় পেলেন?

—এটা আমাকে দিয়ে উনি দেখা করতে বলেছিলেন।

—আপনার নাম ঐ কার্ডের পিছনে লিখে দিন।

নির্দেশমত পণ্ডিত নিজ নাম ভিজিটিং কার্ডের উল্টোদিকে লিখে আবার দাখিল করলেন। মেমসাহেব ম্যানিকিওর-করা দুটি আঙুলে কার্ড-খানাকে ধরে পরীক্ষা করলেন। বার কয়েক আড়চোখে পণ্ডিতের দিকে তাকালেন; যেন কী একটা কথা বলি বলি করেও বললেন না। শেষে বলেন, আপনি ঐ সোফাটায় গিয়ে বসুন। মিস্টার সাধুখাঁ এ্যাসেম্বলিতে গেছেন একজন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। এখনই এসে পড়বেন।

পণ্ডিত সসঙ্কোচে সোফাটায় বসে পড়েন।

পাশেই বসেছিল আর একজন ছোকরা। বছর বাইশ-চব্বিশ। সুটেড-বুটেড। পণ্ডিতের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল, তারপর সরে গিয়ে বসল

আর একটা সোফায়। আবার কী মনে করে এগিয়ে এল কাছে, বললে, গট ম্যাচেস্?

পণ্ডিত বিরক্তভাবে মাথা নাড়লেন।

লোকটা অদ্ভুতভাবে শ্রাগ করে আবার গিয়ে বসল তার আসনে, যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে।

একটু পরেই প্রকাণ্ড একটা কালো গাড়ি এসে দাঁড়াল প্রবেশতোরণের সম্মুখে। তকমা-আঁটা একজন দারোয়ান জুতায় জুতায় খট্ করে শব্দ তুলে সসম্ভ্রমে স্যালুট করল এবং পিছনের দরজাটা খুলে দিল। নেমে এলেন নিখুঁত সাহেবি পোশাকে একজন ভদ্রলোক। টেরিলিনের নস্যি-রঙের স্যুট। টাইটা একটা সোনার টাই-পিনে আটকানো। সুচালো কালো রঙের চক্‌চকে জুতো মশ্‌মশিয়ে তিনি উঠে এলেন। মুখের একপাশে একটা পাইপ। বাঁ-হাতে চৌকা চ্যাপ্টা একটা ব্রীফকেস। অফিসের আশপাশের সকলে উঠে দাঁড়ায়। হাত তুলে নমস্কার করে। পণ্ডিত অবাক বিস্ময়ে দেখেন আগন্তুক আর কেউ নন, স্বয়ং যতীন সাধুখাঁ।

যতীন গরীব নয় এটুকু জানা ছিল। ট্যাক্সি করেই সে কালীতারা কেবিনে যায়, কিন্তু তার সাজ-পোষাক, কথাবার্তায় পণ্ডিতের কোনদিন মনে হয়নি, তার দিনের রূপটা এরকম হতে পারে।

একটু পরেই মেমসাহেব পণ্ডিতকে ডেকে বলেন, আপনার ঠিকানা এবং কেন দেখা করতে এসেছেন এই কাগজে লিখে দিন।

ব্রাহ্মণ প্রতিপ্রশ্ন করেন, যতীন জানতে চেয়েছে?

মেমসাহেব বিস্ময়বিশ্রিত দৃষ্টিতে পণ্ডিতকে আর একবার আপাদমস্তক দেখে নেন। জবাব দেন না। পণ্ডিতের দেওয়া কার্ডখানাই আবার বাড়িয়ে ধরেন। পণ্ডিত দেখেন, লাল পেন্সিলে তার উপর লেখা আছে: ঠিকানা? প্রয়োজন?

বিস্ময়ের মাত্রাটা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। যতীন কি নাম শুনে তাঁকে চিনতে পারেনি? সে তো নিজে থেকেই পণ্ডিতকে বলেছিল অফিসে দেখা করতে—সেই সাঁওতাল পরগণার কাজের ব্যাপারে, বোধহয় 'প্রশান্ত ভট্টাচার্য' লেখাতে যতীন তাঁকে ঠিক চিনতে পারেনি। তাই হবে। এর বদলে যদি উনি লিখতেন 'পাষণ্ড পণ্ডিত,' তবে বোধ করি যতীনের বুঝে নিতে কোন অসুবিধা হত না। পণ্ডিত এবার নামের নিচে নিজের ঠিকানাটা লিখে দিলেন। বুদ্ধি করে তলায় আরও লিখে দিলেন 'কালীতারা কেবিনের সন্নিকটস্থ' প্রয়োজনের ঘরে লিখলেন 'ব্যক্তিগত'।

তক্‌মা-আঁটা একজন চাপরাশী চিরকুটখানা নিয়ে চলে গেল।

পণ্ডিত মনে মনে হাসেন। তিনি গদাধর তর্করত্নের পুত্র, সুদর্শন তর্কপঞ্চাননের পৌত্র, নিজেও তিনি ন্যায়ের উপাধি পেয়েছেন—কিন্তু সেসব পরিচয়ে এখানে কেউ তাঁকে চিনবে না। প্রশান্তকুমার যদি এই অফিসের বড়-

সাহেবের ডাক আদৌ পান, তবে তা পাবেন তাঁর অন্য এক গুণের জন্য : তিনি কালীতারা মদের আড্ডার প্রতিবেশী বলে।

একটু পরেই চাপরাশীটা এসে তাঁকে ডেকে নিয়ে গেল। লোহার একটা বন্ধ দরজার সম্মুখে দাঁড় করাল। লাল-সাদা বৈদ্যুতিক আলোকবিন্দুর কী সব সংকেত লক্ষ্য করে একটা বোতাম টিপে দিল। অল্প পরে লোহার দরজাটা খুলে গেল। একটা খাঁচায় উঠে দাঁড়ালেন দুজন। খাঁচাটা উপরের কোন এক তলায় গিয়ে থামল। আলোকোজ্জ্বল একটা সরু গলিপথ অতিক্রম করে আবার একটি বন্ধ দ্বারের সম্মুখে তাঁকে অপেক্ষা করতে বলে চাপরাশীটা দ্বার ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল। পণ্ডিত লক্ষ্য করে দেখেন, দরজার উপর একটি কাচের ফলকে লেখা আছে—'ম্যানেজিং ডাইরেক্টার'। তার নিচে আর একটি ফলকে লেখা, ডঃ জে, সাধুখাঁ ; এবং তারপর অনেকগুলি ইংরাজি অক্ষর। মাঝে ব্র্যাকেট-বন্ধনীযোগে লেখা 'লণ্ডন,' 'শিকাগো'। যতীন যে লেখাপড়া-জানা লোক এটা জানা ছিল পণ্ডিতের, কিন্তু সে যে এতখানি বিদ্বান তা জানা ছিল না।

একটু পরেই ডাক পড়ল ভিতরে। পালিশ-করা কাঠের পাল্লাটা খুলে ঘরে প্রবেশ করলেন। দরজাটা নিঃশব্দে আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। ঘরের ভিতরটা রীতিমত ঠাণ্ডা। ফ্যান ঘুরছে না কিন্তু।

যতীন একটা রেডিও-মত যন্ত্রের সামনে মুখ রেখে কার সঙ্গে কথা বলছিল। টেলিফোন নয় কিন্তু। বাঁ-হাতে তার পাইপটা ধরা আছে, ডান-হাতে একটা লাল-নীল পেনসিল। বৈদ্যুতিক যন্ত্রটাকে বোতাম টিপে থামিয়ে দিয়ে এবার যতীন মুখ তুলে তাকিয়ে দেখেন, বলেন, ইয়েস, কী চান ?

পণ্ডিতকে যতীন বসতে বলেননি ; নিজে থেকেও পণ্ডিত বসেননি সম্মুখস্থ চেয়ারে। কেমন যেন বিহ্বল বোধ করেন। যতীন তাঁকে কি এখনও চিনতে পারছে না ? আমতা আমতা করে বলেন, আমি কলকাতায় থাকব না স্থির করেছি।

—সুক হিয়ার মিস্টার ভট্‌চারিয়া ! এই কথা জানাতেই কি এখানে এসেছেন ? আপনি কোথায় থাকবেন তার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক ?

—আজ্ঞে না। আপনি বলেছিলেন, সাঁওতাল পরগণার কাছে আপনার কী একটা কারবার আছে, সেখানে আপনার একজন লোকের দরকার—

—আই সী ! চাকরী চান ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—মাপ করবেন। অফিসের বাইরেই তো নোটিশ টাঙানো আছে, নো ভেকেন্সি। এমনিতেই এখন মার্কেট খুব 'ডাল' ; কোথায় লোক ছাঁটাই করব ভাবছি—

হঠাৎ ঝন্‌ঝন্‌ করে টেলিফোনটা বেজে উঠল।

মাঝপথে কথা থামিয়ে যন্ত্রটা তুলে নিলেন যতীন, ইয়েস ?

অদূরভাষিণীর কথা অল্প কিছুক্ষণ শুনে নিয়ে বলেন, লুক হিয়ার ক্লারা! এ ভদ্রলোক আবার কী চান ভাল করে জেনে নিয়ে তারপরে আমার কাছে পাঠিও ! ক্রমাগত চাকরির উমেদার পাঠিও না। আমাকেও কিছু কাজকর্ম করতে দাও ! এ্যাঁ ? কী বললে ? না, 'প্রাইভেট' লিখলে সেটা 'এ্যাক্সেপ্ট' করবে না। অফিসে আমি প্রাইভেট কাজ করতে আসিনি। তুমি যদি আমার সাক্ষাৎ-প্রার্থীদের ঠিকমত 'স্ক্রীনিং' করতে না পার, তাহলে বাধ্য হয়ে তোমাকে 'আউট-ডোরে' পাঠাতে হবে।

ঝনাৎ করে টেলিফোনটা রেখে মুখ তুলে পণ্ডিতকে দেখতে পান, বলেন, আপনি এখনও দাঁড়িয়ে আছেন ?

পণ্ডিত জবাব দেন না। যতীন পাইপটা তুলে নিলেন, আগুনটা বোধহয় নিবে গিয়েছিল। লাইটার জ্বেলে তামাকটায় আগুন ধরাতে ধরাতে বিকৃত উচ্চারণে বলেন, আর কিছু বলার আছে আপনার ?

পণ্ডিতের মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে ততক্ষণে। ঠোঁট দুটো কাঁপতে থাকে। বাক্যস্ফূর্তি হয় না।

—আর কিছু বক্তব্য না থাকলে আপনি যেতে পারেন, আমি বড় ব্যস্ত।

—যাচ্ছি। একটা শুধু প্রশ্ন ছিল !

পণ্ডিত ফতুয়ার পকেটের ভিতর হাত চালিয়ে কী একটা খুঁজতে থাকেন।

যতীন যে ওঁকে চিনতে পেরেছেন, এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তাই যতীন আর ওঁর চোখে চোখে তাকাতে পারছেন না, তাই একটা ফাইলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বলেন, অনুগ্রহ করে সেটা তাড়াতাড়ি বলে ফেললে সুখী হতাম।

—আপনি আমার মেয়েকে একটা কাঠের পুতুল কিনে দিয়েছিলেন সেটার দাম কত ?

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠেন যতীন সাধুখাঁ, প্রবল-প্রতাপান্বিত ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। পাইপটা দরজার দিকে নির্দেশ করে গর্জন করে ওঠেন, গো ! গো ! গেট আউট !

পণ্ডিত থরথর করে কাঁপছেন তখন।

কাঁপা হাতেই ফতুয়ার পকেট থেকে বার করে আনেন ধূলিমলিন একটা একটাকার নোট। হাতের মুঠোয় সেটাকে দলা পাকিয়ে হঠাৎ ছুঁড়ে মারেন যতীনের মুখে।

তারপর কাঁপতে কাঁপতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান।

পরের দিন বিস্মিত হবার পালা চন্দ্রবাবুর।

স্কুল ছুটির পর পণ্ডিতমশাই তাঁকে জনান্তিকে ডেকে বললেন, চন্দ্রকান্তবাবু, একটা কথা ছিল।

—বলুন বলুন।

আশপাশে একবার দেখে নিয়ে পণ্ডিত বলেন, অনেক বিবেচনা করে সিদ্ধান্তে এসেছি—আপনার নির্দেশিত পথে গমন করা ভিন্ন আমার গত্যন্তর নাই।

চন্দ্রবাবু খুশি হয়ে বলেন, আমি জানতাম। ইচ্ছা করেই তাড়াহুড়া করিনি, আমার বিশ্বাস ছিল, আপনি নিজে থেকেই প্রস্তাবটা তুলবেন। মেয়েটিকে আজ কোথায় রেখে এলেন?

—আমার এক প্রতিবেশীর নিকট। বঙ্কিমবাবুর কাছে—

—ঐ কালীতারা রেস্তোরাঁর মালিক?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ওটা তো একটা মদের দোকান!

পণ্ডিতের মুখটা করুণ হয়ে ওঠে, বলেন দিবাভাগে নয়; এ ভিন্ন আর কী করতে পারতাম বলুন?

—না না, এ ঠিক হচ্ছে না। ঐ সব পরিবেশে গিয়ে কতকগুলো অশ্লীল গালাগাল শিখবে শুধু। শিশু মনে পরিবেশের বিষময় প্রতিক্রিয়া কীভাবে হয় আপনি তো জানেনই সব।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পণ্ডিত বলেন, উপায় কী বলুন?

—উপায় তো আগেই বলেছি; এতদিনে আপনি রাজীও হলেন। পাত্রী আমি স্থির করেই রেখেছি; আপনি দিনচারেকের ছুটি নিয়ে আমার সঙ্গে চলুন।

—কোথায় যেতে হবে?

—বর্ধমানে। দেবীপুর স্টেশনে নেমে মাইলতিনেক আমাদের যেতে হবে। চণ্ডীগড় বলে একটা গ্রামে।

—আপনি কি ইতিপূর্বেই সমস্ত স্থির করে রেখেছেন? পাত্রী যথেষ্ট বয়স্থা তো? আমার বৃত্তান্ত পাত্রীর অভিভাবককে আদ্যন্ত বিবৃত করেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। পাত্রী আপনাকে দেখেছে, তার অভিভাবকও আপনাকে ভালভাবে চেনেন। চণ্ডীগড়ের কৃষ্ণসহায় বাগচিকে আপনার মনে আছে?

—আজ্ঞে না। কে তিনি?

—প্রতিমা, মানে আপনার স্ত্রীর সম্পর্কে কাকা হন। তাঁর ছয়টি কন্যা, চারটিকে পার করেছেন। এটি পঞ্চম। আপনার বিবাহের সময় এসেছিল, তখন তার বয়স বারো। এতদিনে উনিশ-কুড়ি হয়েছে। প্রতিমার মত একেবারে অশিক্ষিতা নয়। গত বৎসর হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা দিয়েছিল, পাশ করতে পারেনি—এবারেও পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

পণ্ডিত কুণ্ঠিত স্বরে বলেন, কিন্তু অতটুকু মেয়েকে—

—অতটুকু কী মশাই? কুড়ি বছর বয়স কম হল? শান্তি আপনাকে দেখেছে, আপত্তি নেই, আগ্রহ আছে। বস্তুত প্রতিমার মৃত্যুসংবাদ পেয়েই

তাঁরা আমাকে পত্রাঘাত করেছেন, এ বিবাহ হতে পারে কিনা জানতে চেয়েছেন।

পণ্ডিত কোন প্রত্যুত্তর করতে পারেন না। মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো নাকি পাপ। কৃষ্ণসহায়বাবু, তাঁর স্ত্রী অথবা তাঁর কন্যাকে তিনি স্মরণ করতে পারলেন না। তাঁদের তিনি জানেন না, চেনেন না। কিন্তু তাঁরা প্রতিমার আত্মীয়। কৃষ্ণসহায়বাবু ভ্রাতুষ্পুত্রীর মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া মাত্র পত্র লিখেছেন। পাছে পাত্রটি হাতছাড়া হয়ে যায়। ওঁরা কি আশঙ্কা করেছিলেন যে, পাষণ্ড পণ্ডিত প্রথমা স্ত্রীর চিতার আগুন থেকেই দেশলাই-কাঠির খরচ বাঁচাতে দ্বিতীয়া স্ত্রীর বিবাহযজ্ঞে অগ্নি-সংযোগ করবেন? কিন্তু অন্যায়ই বা কী করেছেন তাঁরা? পক্ষকালও অতিক্রান্ত হয়নি, এই তো তিনি আজ নিজেই চন্দ্রবাবুর দ্বারস্থ হয়েছেন—

নিরতিশয় গ্লানিতে ভরে গেল মনটা। বললেন, আচ্ছা ভেবে দেখি—

—না, না মশাই, ভাবনা-চিন্তার সময় আর নেই। একদিন ডবল-ডেকারের তলা থেকে ফিরে এসেছে, একদিন পুকুরের জলে ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেছে। মেয়েটাকে মোর ফেলার আগেই আপনার চিন্তাভাবনা শেষ হওয়া ভাল নয় কি?

পণ্ডিত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

খুকু প্রশ্ন করে, যতীনকাকা আর আসে না কেন বাবা?

—কী জানি রে!

—মা কবে আসবে বাবা?

—শীঘ্রই আসবেন তিনি, মা-মণি। তুমি লক্ষ্মী হয়ে থেক। তা হলেই নাতিবিলম্বে তিনি আসবেন।

—'নাতিবিলম্ব' কী বাবা?

—খুব শীঘ্র।

—জান বাবা, বঙ্কুদা আমাকে বিস্কুট খেতে দিয়েছিল, আমি খাইনি।

—উত্তম করেছ মা-মণি। লোভকে সর্বদা জয় করতে হবে। ভগবান শ্রীশ্রীভগবৎগীতায় বলেছেন, লোভ করা পাপ। গীতা বলছেন, বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠাতা, অর্থাৎ কিনা—

বাধা দিয়ে খুকু বলে, না বাবা, গীতাদি বিস্কুট দিলেই খায়।

পণ্ডিত বলেন, সে গীতার কথা আমি বলি নাই, মা মণি। এ অন্য গীতা।

বাপের সঙ্গে খুকুর মনের কথা ভাল রকম জমে না। বাবার কথাগুলোই কেমন যেন,—বোঝা যায় না। খুকুর ভারি মুশ্‌কিল—বাবার সঙ্গে কথা বলে আরাম পায় না। বুচু আর ছোটনকে সর্বদা এড়িয়ে চলতে হয়; তারা সুযোগ পেলেই চিমটি কাটে, কান মলে দেয়। কেন, তা কিছুতেই বুঝতে পারে না খুকু। যতীনকাকুর কথাও সব সময় বোঝা যায় না। তা হোক, সে তবু

খেলায় যোগ দেয়। তা আজ ক'দিন তো যতীনকাকুও আসছে না। গীতাদিকেও খুকুর পছন্দ হয় না। গীতাদি বলে, ন্যাকা! বঙ্কুদা তখন বিস্কুট দিল, তুই নিলি না কেন?

খুকু প্রতিবাদ করে, কেউ দিলেই বুঝি নিতে হয়? লোকে হ্যাংলা বলবে না?

—ঈশ্! হ্যাংলা বললেই হল? মুখে নুড়ো জ্বেলে দেব না? তুই না হয় নিজে না-ই খেতি, আমাকে দিয়ে দিলেই পারতি?

খুকু সমস্যাটা বুঝিয়ে দিতে পারে না গীতাকে। খাবার ইচ্ছে যে তার ষোল আনাই আছে। খিদেও থাকে তার। কিন্তু কোনদিন কারও কাছে কিছু হাত পেতে নেয়নি, মা যে বারণ করত। তাই হাত পাতার অভ্যাসটা তার হয়নি, এখন সে বদভ্যাস ছাড়বে কেমন করে? লজ্জার মাথা খেয়ে হাতখানাই যদি সে কোনক্রমে পাততে পারে, তবে সেটা খাওয়ার জন্য গীতার সাহায্যে তার প্রয়োজন নেই। বলে, মা যে বকে—

খিলখিল করে হেসে ওঠে গীতা। বলে, তোর কি ধারণা এখনও তোর মা মাগী ডাঁটিতে আসবে? সে তো মরে ভূত!

খুকু অবাক হয়ে শোনে। ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারে না।

পণ্ডিত বলেন, মা-মণি, তোমার মায়ের পরিবর্তে আমি যদি অন্য একজন মা নিয়ে আসি, তাহলে কেমন হয়?

—অন্য মা কেন বাবা? মা কি আসবে না?

—আসবেন মা-মণি, কিন্তু তাঁর বিলম্ব হবে। স্বর্গের দেবতারা তাঁকে অনতিবিলম্বে পাঠাতে পারছেন না। এ-ক্ষেত্রে যদি অন্য একজন জননীকে নিয়ে আসি, তুমি কি সন্তুষ্ট হবে?

খুকু একটু ভেবে নিয়ে বলে, অন্য মা মারবে না?

—'মারবে না' বলা অনুচিত মা-মণি, বলতে হয় 'মারবেন না'। না, মারবেন কেন? কত আদর করবেন, কাছে নিয়ে শয়ন করবেন!

খুকু সেকথার জবাব না দিয়ে হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়; বলে, আচ্ছা বাবা, 'মাগী' মানে কী?

—কী! কে তোমাকে ঐরূপ অশ্লীল কথা শেখাচ্ছে? কে বলেছে? কে বলেছে একথা?

ভয়ে খুকু একেবারে কুঁকড়ে যায়।

—না, নীরব থাকলে চলবে না। সত্য কথা বল!

খুকু গীতাদির নামটা করবে কিনা বুঝে উঠতে পারে না।

দুরন্ত ক্রোধে পণ্ডিত হাতটা তোলেন। তারপর নিজেই সেটা টেনে নেন। না, অপরাধ খুকুর নয়। সে শিশু, সে যা শোনে তাই বলে। অর্থ না বুঝেই

বলে। সে তো জানে না কোনটা শ্লীল আর কোনটা অশ্লীল। আর জানে না বলেই তো সে শব্দটার অর্থ জানতে চেয়েছে। ও জিজ্ঞাসু, ও অর্থী, ও ছাত্রী—ভালমন্দ তৌল করতে চায়। পণ্ডিত আত্মসংবরণ করে বলেন, ঐ শব্দটা অত্যন্ত অশ্লীল, মা-মণি—ওর অর্থ হল স্ত্রীলোক। কিন্তু 'স্ত্রীলোক' শব্দটার অনেক প্রতিশব্দ আছে ;—রমণী, মহিলা, যোষিত, নারী। ঐ প্রাকৃত শব্দটার প্রয়োগ না করেও আমরা স্ত্রী-জাতীয়কে বিজ্ঞাপিত করতে পারি। এবং তাই আমাদের করা উচিত। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন,—'ভাল বলিবে, মন্দ বলিবে কিন্তু অশ্লীল কখনও বলিবে না।'

খুকু মাথা ঝাঁকিয়ে প্রতিবাদ করে, না বাবা, বঙ্কুদাই সেদিন কাতুপিসিকে 'মাগী' বলেছিল !

—আবার ঐ শব্দ উচ্চারণ করছ ? না.। আমি ঐ কালীতারা কেবিনের বঙ্কিমচন্দ্রের কথাটা বলি নাই। ইনি অন্য বঙ্কিমচন্দ্র।

একটিমাত্র বরযাত্রী নিয়ে পণ্ডিত প্রশান্ত ভট্টাচার্য একদিন মধ্যাহ্নে হাওড়া স্টেশনে এসে বর্ধমান লোকালে উঠে বসলেন। চন্দ্রবাবুর হাতে পাতলা কাগজে মোড়ানো একটি শোলার টোপর, অপর হাতে মোষের শিঙের বাঁধানো একটি সৌখিন ছড়ি। ওরই মধ্যে একটু সাজগোজ করেছেন তিনি। পাটভাঙা সিল্কের পাঞ্জাবি। পায়ের পাম্প-শু-টায় আজ সদ্য কালি পড়েছে। হাতে ঘড়ি, কাঁধে শাল। বরকর্তার উপযুক্ত সাজ বলা চলে। সে তুলনায় বর বরং নিষ্প্রভ। তাঁর পাঞ্জাবিটা লং ক্লথের এবং সেটা পাটভাঙা নয়। পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। ধুতিটাও মাপে ছোট ; এবং সবচেয়ে বড় কথা, পণ্ডিত আজ সকালে ক্ষৌরকর্ম করেননি। টোপরটা মাথায় বসিয়ে নেবার জন্য চন্দ্রবাবু পণ্ডিতকে অনুরোধ করেননি। কলকাতার ছেলের দলকে চিনতে তো আর তাঁর বাকী নেই ! শেষে পণ্ডিতের কাছা ধরে এমন টানাটানি করবে, যে, দেবীপুর পর্যন্ত পৌঁছানোই হয়তো অসম্ভব হয়ে পড়বে। ট্রেনের দু-চারজন লোক চন্দ্রবাবুর দিকে তাকানোতে উনি ভয় পাচ্ছেন না ; বেশ বুঝে নিয়েছেন, তারা ভাবছে টোপর ও পুরোহিত নিয়ে তিনি কলকাতা থেকে কোনও মফঃস্বলে যাচ্ছেন।

স্কুলে কেউ কিছু জানে না। গুরু নানকের জন্মদিনের ছুটি রবিবারের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় বেশ লম্বা ছুটি পাওয়া গেছে। এ এক দুর্লভ সুযোগ। কাকপক্ষীতে টের পাবে না, এ আশ্বাস চন্দ্রবাবু পণ্ডিতকে বারে বারে দিয়েছেন। তিন দিনই যথেষ্ট। বিবাহ আর কুশণ্ডিকা চণ্ডীগড়েই হবে। দ্বিতীয় দিন ফিরে আসবেন। ফুলশয্যার কোন আয়োজন পণ্ডিত আদৌ করছেন না। পাকস্পর্শ একটা সামাজিক অনুষ্ঠান। না করে উপায় নেই। সেদিন পণ্ডিত একটিমাত্র ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করবেন : চন্দ্রবাবুকে। নববধূর স্বহস্তপক্ক অন্ন

দুই বন্ধুতে পাশাপাশি বসে আহার করবেন। নববধূর সামাজিক স্বীকৃতি তাতেই হবে।

পণ্ডিতের মনে বস্তুত তিনটি সংশয় ছিল। আশ্চর্য যোগাযোগ! তাঁর আপত্তির কারণগুলি আপনা থেকেই দূরীভূত হয়ে গেল। প্রথমতঃ মা-মণি প্রতিবাদ করবে ভেবেছিলেন। কিন্তু তা সে করল না। খুশি মনেই সে মেনে নিল এই প্রস্তাব। তার মায়ের পরিবর্তে আপাতত অন্য একজন মা। বোধ করি ঐ নির্জন গৃহে সঙ্গীর অভাবে তার শিশু মন হাঁপিয়ে উঠেছিল। কিম্বা কে বলতে পারে, সে হয়তো তার নিজ বুদ্ধি-বিবেচনামত বাপের অসহায় অবস্থা খানিকটা বুঝে নিয়েছিল। অথবা হয়তো এ ব্যবস্থার গুরুত্ব সে আদৌ বুঝতে পারেনি। আপন মনে পুতুল খেলতে খেলতে সে "হুঁ" বলে সায় দিয়েছে বাবার কথায়। মোট কথা তার কোন আপত্তি নেই। দিন দু'য়েকের জন্য চন্দ্রবাবুর স্ত্রী খুকুর দায়িত্ব নিয়েছেন। চন্দ্রবাবুর ছেলেমেয়েদের কাছে সে ভালই থাকবে আশা করা যায়। ঘরে তালা দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বেরিয়ে পড়তে পেরেছেন। কাতুবুড়ির সঙ্গে ক'দিন দেখা হয়নি। তাকে কিছু বলে আসা হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ সংশয় জেগেছিল পাত্রীটির সম্বন্ধে। প্রশান্ত পণ্ডিত আর প্রৌঢ় নন, তিনি বস্তুত বৃদ্ধ। পাঁচ বছর আগে তাঁর দেহ-মনে বিবাহের প্রস্তুতি তবু কিছুটা ছিল। আজ তিনি একেবারে ভেঙে পড়েছেন। কামনা-বাসনার কত স্বপ্নই তো থাকে! ন্যায়-শাস্ত্র আর উপনিষদে আকণ্ঠ নিমজ্জিত প্রশান্ত পণ্ডিতকে কাব্যও কিছু কিছু পড়তে হয়েছে বৈকি! আহা! মেয়েটির তিনি কী সর্বনাশ করতে যাচ্ছেন! এ জন্যও ইতস্ততঃ করছিলেন তিনি। কিন্তু সেদিক থেকেও চন্দ্রবাবু তাঁকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত করেছেন। কন্যা, কী যেন তার নাম, সে পণ্ডিতকে দেখেছে। তাঁর প্রথম বিবাহ রাত্রে। তখন সে ত্রয়োদশ-বর্ষীয়া বালিকামাত্র। তা হোক, বর্তমানে সে সাবালিকা, বয়ঃপ্রাপ্তা। সে নিশ্চয় অনায়াসেই বুঝে নিয়েছে যে, এই কয় বৎসরে সে যেমন কৈশোর থেকে ধীরপদে যৌবনের সিংহদ্বারে এসে উপনীত হয়েছে, তেমনি পণ্ডিতও প্রৌঢ়ত্বের সীমান্ত থেকে বার্ধক্যের ক্রোড়ে ঢলে পড়েছেন। আর যাই হোক, প্রথমবার তিনি দোজবরে ছিলেন না। এখন তিনি একটি কন্যার জনক। চন্দ্রবাবু ওঁকে বার বার আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে, মেয়েটি এ সব কথাই জানে। তার কাছে প্রশান্ত পণ্ডিতের কন্যাটি সতীনের মেয়ে নয়, বোনঝি। মা-হারা ঐ মেয়েটিকে বুকে তুলে নিতেই সে আসতে চায় পণ্ডিতের সংসারে। কৃষ্ণসহায়বাবু কন্যাকে কোন রকম পীড়াপীড়ি করেননি, মেয়েটি নাকি নিজেই বলেছে, পুরুষের পৌরুষ তার বয়সে নয়, তার জ্ঞান-গরিমায়, তার পাণ্ডিত্যে। পণ্ডিত প্রশান্ত ভট্টাচার্য ন্যায়রত্নের গৃহিণী হওয়াকে সে সৌভাগ্যসূচক মনে করে।

পণ্ডিত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

তৃতীয়তঃ সংশয় ছিল নিজের দিক থেকে। আত্মা অবিনশ্বর, এ বিশ্বাস তাঁর আছে। প্রতিমা তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ উপর থেকে দেখতে পাচ্ছে। প্রতিমার মনের কথা তিনি কোনদিনই বুঝতে পারেননি। যতীন বলেছিল, মৃত্যু নাকি তাকে পণ্ডিতের কবল থেকে মুক্তি এনে দিয়েছিল। পণ্ডিত জানেন না, একথাটা সত্য কিনা। সত্য বলে মনে করতে মন সরে না, অসত্য বলে উড়িয়ে দেবারই বা মনের জোর কই? আশ্চর্য চাপা মেয়ে ছিল প্রতিমা। মুখরার মত ঝগড়া করা তো দূরের কথা, পণ্ডিতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনদিন সে প্রতিবাদ পর্যন্ত করেনি। নিরলস সেবার মাধ্যমে সে পেতে চেয়েছিল স্বামীকে। একনিষ্ঠা বৈষ্ণবীর মত। পণ্ডিত তাই ভাবছিলেন, সে কি ক্ষমা করবে, যদি তিনি এত শীঘ্র দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে ছোটেন? পণ্ডিতের সে সংশয়ও বড় অদ্ভুতভাবে মিটিয়ে দিয়ে গেল প্রতিমা। স্বপ্নের মধ্যে সে এসেছিল তাঁর কাছে। পণ্ডিতের শিয়রের কাছে এসে বসেছিল নতমুখী মেয়েটি। খুকুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেছিল, আপনি আর অমত করবেন না। খুকুকে তার মাসীর হাতেই তুলে দিন।

ঘুম ভেঙে পণ্ডিত চুপ করে বসেছিলেন অনেকক্ষণ, ঐ এক-পায়ে খাড়া গ্যাস বাতিটার দিকে তাকিয়ে। মনে মনে বার বার বলেছিলেন, তোমাকে আমি চিনতে পারিনি প্রতিমা, তোমার অভাবেই আজ তোমাকে চিনতে পারছি! তুমি মহীয়সী!

দেবীপুর স্টেশনে নেমে পড়লেন দুজনে। তখন পড়ন্ত বেলা। সূর্য এখন বৃশ্চিক রাশিতে। সূর্যের তেজ কমে এসেছে। স্টেশন গেটে টিকিট দাখিল করে বাইরে বেরিয়ে আসতেই একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, কিছু মনে করবেন না, আপনারা কি চণ্ডীগড়ে যাবেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনিই চন্দ্রকান্তবাবু?

—হ্যাঁ। আপনি?

—আমি কৃষ্ণসহায়বাবুর জ্ঞাতি ভ্রাতা। আমার নাম সুবলচন্দ্র বাগচি। আপনাদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতে এসেছি। আসুন আসুন পণ্ডিত-মশাই!

স্টেশনের বাইরে খোয়া-বাঁধানো সড়কটার উপর একটি গো-যান। টাপর তোলা আছে। প্রৌঢ় হাঁক পাড়েন, মকবুল, চ' বাবা, আর দেরি করিস না। একটু খেদিয়ে চ'।

মকবুল হাত বাড়িয়ে টোপরটা নিতে চায়। চন্দ্রবাবু বলেন, থাক, এটা এমন কিছু ভারি নয়।

প্রশান্ত পণ্ডিত আর চন্দ্রবাবু এগিয়ে আসেন গো-যানের দিকে। চন্দ্রবাবু বলেন, আসুন সুবলবাবু, আপনিও আসুন!

—না না। আপনারা বরং হাত-পা মেলে আরাম করে বসুন। আমার সাইকেল আছে।

বলদজোড়া শীর্ণকায়, হাড়-পাঁজরা বার করা। ছাড়া পেয়ে এতক্ষণ তারা রেলের নয়ানজুলিতে নেমে পড়েছিল সবুজ ঘাসের লোভে। মকবুল তাদের তাড়িয়ে এনে গাড়িতে জোতে। চন্দ্রবাবু সুবলচন্দ্রকে জনান্তিকে ডেকে বলেন, ইয়ে, লোকজন বেশি হবে না তো?

সুবলচন্দ্র একেবারে জিব বার করে ফেলেন, কী যে বলেন! আপনার নির্দেশ আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। দাদার পরিবারের ক'জন, আমি, আমার স্ত্রী, পুরোহিত আর নাপিত। ব্যস। কুল্লে আট দশজন কন্যাযাত্রী। আর আপনারা দুজন। দাদার তিন মেয়ে, বৌদি আর আমার খোকার মা, এই হল গিয়ে পাঁচ এয়ো—মুখে মুখে হিসাব। এ ছাড়া কাক-পক্ষীতে টের পায়নি।

চন্দ্রবাবু একটা কাঁচি সিগারেট ধরিয়ে বলেন, না, মানে ইয়ে—আমরা কিছু চুরি-জোচ্চুরি করতে যাচ্ছি না। শাস্ত্রমতে বিবাহ দিতেই যাচ্ছি। তবে ব্যাপারটা তো বুঝতেই পারেন। এঁর বয়স হয়েছে তো। তাই স্বতই সংকোচ—

—সে আর বলতে হবে না, দাদা। উনি যে শান্তিকে পায়ে ঠাঁই দিতে রাজী হয়েছেন এতেই আমরা কৃতার্থ। তবে এও বলি ন্যায়রত্ন মশাই, নিজের ভাইঝি বলেই বলছি না, এমন একটি মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি রূপ এবং স্বভাবে সে যে-কোন রাজার সংসারে ঠাঁই পেতে পারত।

পণ্ডিত ফস্ করে বলে বসেন, তাহলে সেই চেষ্টাই করুন না। আমার মত একটি বৃদ্ধের—

একেবারে হাঁ হাঁ করে ওঠেন সুবলচন্দ্র। ভদ্রলোক কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেননি, যে পণ্ডিতের কথায় কোন শ্লেষ ছিল না, কোনও অভিমান ছিল না—নিছক খোলা মনের প্রশ্নটাই পেশ করেছিলেন তিনি। যতই শুনছেন মেয়েটির কথা, ততই যেন পিছু হটতে ইচ্ছে করছে তাঁর।

চন্দ্রবাবু আলোচনাটা থামিয়ে দিয়ে বলেন, যাক, এবার রওনা দেওয়া যাক!

সুবলচন্দ্র একটু ইতস্ততঃ করে বলেন, ইয়ে একটা কথা বলছিলাম, কিছু মনে করবেন না। স্টেশনমাস্টার আমার বন্ধুলোক। তাঁকে সব কথাই বলে রেখেছি। আমি বলছিলাম, উনি যদি মাস্টারমশাইয়ের ঘরে গিয়ে কপালে একটা চন্দনের ফোঁটা দিয়ে নিতেন—মানে বুঝতেই তো পারেন। হাজার হোক উনি বর!

চন্দ্রবাবু একটু বিচলিত হয়ে বলেন, আবার স্টেশনমাস্টার মশাইকে এসব কথা বলতে গেলেন কেন?

—না না, ভয়ের কিছু নেই। উনি অতি সজ্জন ব্যক্তি।

এতক্ষণে নজরে পড়ে রাস্তার ধারে পয়েন্টিং করা একখানা রেলওয়ে-কোয়ার্টার্স থেকে কয়েকজন মহিলা উঁকি-ঝুঁকি মারছেন।

চন্দ্রবাবু কিছু বলার আগেই রেলের কোট গায়ে একজন স্থূলকায় ভদ্রলোক কোটের বোতাম আঁটতে আঁটতে এগিয়ে এসে বলেন, নমিতা, মানে আমার মেয়েটি শান্তির সঙ্গে একক্লাসে পড়ত। এভাবে তো আপনাকে যেতে দেব না, পণ্ডিত-মশাই! সুবলচন্দ্রের কাছে সব কথা শুনে নমিতা চন্দন বেটে রেখেছে, ফুলের মালা গেঁথে রেখেছে। আমার বাড়ীতে আপনাদের একটু পদধূলি দিতেই হবে।

চন্দ্রবাবু বোধহয় আশঙ্কা করলেন, প্রতিবাদ করলে কৌতূহলী জনতার ভীড় জমে যাবে। সামনে চায়ের দোকানে, খাবারের দোকানে এবং স্টেশনে লোক বড় কম নেই। মনে মনে তিনি সুবলচন্দ্রের অদূরদর্শিতার জন্য কটূক্তি করলেন বটে, কিন্তু মুখে বলেন, সে আর বেশি কথা কি? চন্দনের একটি ফোঁটা বৈ তো নয়! চলুন—

গরুচোরের মত ন্যায়েরত্ন গুটি গুটি এগিয়ে যান ঐ বাড়িটার দিকে।

উঠানে পা দিয়েছেন কি দেননি, গগনবিদারী শঙ্খধ্বনিতে চমকে উঠলেন দুজনে।

একজন পা-ধোয়ার এক বালতি জল, ঘটি আর গামছা এনে দিল।

চন্দ্রবাবু বললেন, সংক্ষেপে সারবেন মশাই।

স্থূলকায় স্টেশনমাস্টারটি রসিক ব্যক্তি। হেসে বলেন, সে উপায় কি রেখেছেন নাকি? তাহলে বন্ধুকে অন্তত আজ ক্ষৌরকর্মটা করে আসতে বলা উচিত ছিল। আর অনভিজ্ঞতার দোহাই দিলে তো আমরা শুনব না! বিবাহের সম্বন্ধে ওঁর কিঞ্চিৎ ধারণাও তো আছে!

চন্দ্রবাবু ঢোক গিলে চুপ করে যান।

শেষ পর্যন্ত ক্ষৌরকর্মটাও করতে হল। মাস্টারমশাইয়ের সেফ্‌টি রেজারে নূতন ব্লেড চড়িয়ে একদিনের না-কামানো গালটাকে মেজেঘষে সাফ করতে হল। পনের-ষোল বছরের একটি চঞ্চলা মেয়ে এগিয়ে এল স্নো-পাউডার আর চন্দনের বাটি হাতে। হাসতে হাসতেই আসছিল, হঠাৎ পণ্ডিতকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। কেমন যেন অদ্ভুত দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকে পণ্ডিতের দিকে। পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে ওঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে।

ওর ঐ ক্ষণিক বিহ্বল দৃষ্টিটাতে মরমে মরে গেলেন পণ্ডিত। কী জানি হয়তো শুভদৃষ্টির সময়ে ঐ মেয়েটিও, কী যেন নাম তার, সেও অমনভাবে তাকিয়ে দেখবে তাঁর দিকে। এ কী করতে চলেছেন তিনি!

মেয়েটি প্রসাধনের উপক্রম করতেই যেন আর্তনাদ করে ওঠেন, না না! আমাকে মাপ কর মা! শুধু একটি চন্দনের ফোঁটা!

পাশ থেকে খিল খিল করে হেসে ওঠে আর একটি মেয়ে। বছর বাইশ-চব্বিশ। সধবা। সম্ভবত নমিতার দিদি। হাসতে হাসতেই বলে, 'মা' কেন পণ্ডিতমশাই? ও তো আপনার শালী। মধুর সম্বন্ধ হতে চলেছে যে ওর সঙ্গে!

সমর্থন পেয়ে নমিতা এক খাবলা গ্লো তুলে নেয়। প্রতিবাদের জন্য হাতটি তুলেছিলেন পণ্ডিত। মেয়েটি যেন খেলা পেয়েছে, বললে, সেজদি, ধর তো ওঁর হাত দুটো চেপে। আঁচল দিয়ে বেঁধে ফেল।

পণ্ডিত বুঝতে পারেন প্রতিবাদ নিষ্ফল। প্রাণচঞ্চলা দুটি তরুণীর হাতে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করলেন। ফেনোচ্ছল দুটি পার্বত্য ঝরণার নৃত্যছন্দ যেমন নির্লিপ্ত উদাসীনতায় উপেক্ষা করে উদাস দৃষ্টি মেলা ধ্যান-স্তিমিত পর্বত, তেমনিভাবে চুপ করে থাকেন। কিশোরীতরুণী মেয়ে দুটি যেন পাথরের শিবলিঙ্গকে চন্দন-চর্চিত করছে। পণ্ডিতের মনটা হু-হু করে ওঠে। যাঁকে বিবাহ করতে চলেছেন সেই মেয়েটি এই কিশোরী নমিতারই সহপাঠিনী, এরই সখী—হয়তো এরই মত প্রগলভা, এরই মত কৌতুকময়ী! বান্ধবীর বর বলেই এর চোখেমুখে এত কথা, এত কৌতুক! কিন্তু পণ্ডিত কিছুতেই ভুলতে পারেন না—প্রথম দৃষ্টিতে সে কেমন অদ্ভুতভাবে তাকিয়েছিল। ঐ স্টেশনমাস্টারমশাই যদি পণ্ডিতের মত এক বৃদ্ধ দোজবরকে কাল নিয়ে এসে দাঁড় করিয়ে দেন ছাঁদনাতলায়, তখনও কি ও অমনি ভাবে খিলখিল করে হাসতে পারবে? প্রশান্ত পণ্ডিতের প্রসন্নতা ব্যাহত হয়ে গেল—ইচ্ছে হল ফুলের মালাটা ছিঁড়ে ফেলে এই নাগপাশ থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে। রেল-লাইন ধরে সিধে ঐ পশ্চিম-মুখো ছুটতে—ঐ যেখানে অস্তমান দিনান্তের সূর্য লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে!

কিন্তু কার্যত সেসব কিছুই করলেন না। ক্লান্ত অবসন্ন চিত্তে ফুলের মালা গলায়, টোপর মাথায়, চন্দনের ফোঁটা কেটে গিয়ে বসলেন গো-যানে। মনে মনে বললেন, হে হৃষিকেশ! তুমি আমার অন্তরে বসে আমাকে যেভাবে চালনা করবে, সেই পথেই চলব আমি। আমাকে শক্তি দাও। আমি যেন দুঃখে অনুদ্বিগ্ন আর সুখে বিগতস্পৃহ থাকতে পারি!

চন্দ্রবাবু বোধহয় পণ্ডিতের অবস্থাটা অনুধাবন করেছেন। কী একটা সান্ত্বনার কথা তিনি বলতে গেলেন; এবং সেকথাটা চাপা দিতেই পণ্ডিত প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন, বললেন, চন্দ্রকান্তবাবু, আপনি ধূমপান করে থাকেন? ইতিপূর্বে তো কখনও দেখি নাই?

—করে থাকি নয় মশাই। আজ সখ করে করছি। হাজার হোক আজ আমি বরকর্তা!

পরমুহূর্তে কিন্তু পণ্ডিত নিজেই ফিরে এলেন আজকের প্রসঙ্গে। বন্ধু-বরের কাছে জনান্তিকে একটু সান্ত্বনা-বাক্য প্রত্যাশা করছিলেন বোধহয়, বলে

ওঠেন, এ কী বিড়ম্বনা দেখুন তো! এই বয়সে কি এইসব পুষ্পমাল্য, চন্দনশোভা শোভন?

চন্দ্রবাবু দ্বিতীয় আর একটি সিগারেট ধরিয়ে বলেন, দেখুন ন্যায়রত্নমশাই, একটা কথা আজ আপনাকে বলব। কিছু মনে করবেন না, আপনার চেয়ে আমার সাংসারিক জ্ঞান বেশি। আমার এখন মনে হচ্ছে বন্ধু হিসাবে আপনাকে একথাটা বলার প্রয়োজন হয়েছে।

পণ্ডিত ভয়ে ভয়ে বলেন, বলুন, বলুন!

—আপনি নিতান্ত দায়ে পড়ে দ্বিতীয়বার বিবাহ করছেন। দাম্পত্য-জীবনের প্রতি বর্তমানে আপনার কোন মোহ নেই, আকর্ষণ নেই—তা আপনিও বুঝতে পারছেন, আমিও বুঝছি। আপনার প্রয়োজন এখন জীবনসঙ্গিনী নয়,—আপনার মা-হারা মেয়েটির একটি অভিভাবিকা। কিন্তু সেটাই তো শেষ কথা নয়? এ নাটকে আপনি ছাড়া আরও একটি প্রধান চরিত্র আছে, যার কথা আপনি ন্যায়ত ভুলতে পারেন না। সে হচ্ছে শান্তি। আপনার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। যে আপনার সংসার করতে আসছে; হয়তো নিতান্ত দায়ে পড়েই সে বাপ-মাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করতে এ বিবাহে সম্মতি দিয়েছে। না, না, পণ্ডিতমশাই—আপনি আমাকে বাধা দেবেন না, আমার বক্তব্যটা বলতে দিন! আমি জানি, আপনি কী বলতে চাইছেন! হ্যাঁ, একথা আমি ইতিপূর্বেই বলেছি যে, তার উপর কোন পীড়াপীড়ি করা হয়নি। সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সম্মতি দিয়েছে; কিন্তু বাংলাদেশের মেয়েদের সম্বন্ধে একটি বাঙলা প্রবচন আছে, আপনি নিশ্চয় শুনে থাকবেন—'তাদের বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না'; শান্তি সর্বান্তঃকরণে এ বিবাহে সম্মতি দিয়েছে; কিন্তু পণ্ডিতমশাই, নিজের সম্পূর্ণ অন্তঃকরণটাকেই কি আমরা জানি? চিনি? বুঝতে পারি?

পণ্ডিত কী জবাব দেবেন ভেবে পান না। পশ্চিম দিগন্তের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে বসেছিলেন তিনি। সূর্যটা পালিয়ে বেঁচেছে। তার পলায়নের চিহ্ন কিছু কিছু লেগে আছে মেঘের চূড়ায় চূড়ায়—রক্তিম স্বাক্ষরে। গো-যান চলেছে ধীর মন্থর গতিতে—যেন আর বইতে পারছে না যাত্রিদের। তৈল-তৃষিত তার চাকায় চাকায় মর্মভেদী আর্তনাদ সান্ধ্য আকাশকে বিদীর্ণ করেছে। যেন সে কেঁদে কেঁদে মিনতি করে বলছে, আর পারছি না গো, এবার মুক্তি দাও আমাকে!

চন্দ্রবাবু পুনরায় বলেন, আমি জানি, শান্তির সমস্ত দাবী মিটিয়ে দেবার ক্ষমতা আজ আর আপনার অবশিষ্ট নেই। না থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে তার প্রতি তো আপনি কাঠের পুতুলের মত ব্যবহার করতে পারেন না! আজ এই ফুলের মালার কাঁটা বিঁধছে আপনার বুকে—চন্দনের ফোঁটায় কপাল চড়চড় করছে;—কিন্তু এই তো সবে শুরু হল ন্যায়রত্নমশাই। এর

পর যে অনেক স্নেহের অত্যাচার সহ্য করতে হবে আপনাকে। যে অমৃতে অরুচি জন্মেছে আপনার, শান্তি যে এখনও তার স্বাদই পায়নি। আপনি বিচক্ষণ, আপনাকে বেশি বলা নিষ্প্রয়োজন। তবু আপনাকে তো চিনি। তাই বলছি, মনটাকে প্রস্তুত করুন। এ নূতন দাম্পত্যজীবনে হয়তো অনেক কিছুই আপনার কাছে বিরক্তিকর লাগবে। তবু ভাল না লাগলেও আপনাকে ভাললাগার অভিনয় করে যেতে হবে—

বিস্ময়াহত পণ্ডিত শুধু বললেন, অভিনয়?

—হ্যাঁ, অভিনয়! সামাজিক জীব হিসাবে অভিনয় কি করেন না? রামগোপালের গালে টেনে চড় মারবার ইচ্ছে যখন মনে মনে জাগে, তখন সৌজন্যের অভিনয় করে হেঁ-হেঁ হাসি হাসেন না?

পণ্ডিত গম্ভীর হয়ে বলেন, দুলালের সংস্কৃত-শিক্ষার দায়িত্ব আমি ত্যাগ করেছি।

—সে কী! টিউশানি ছেড়ে দিয়েছেন?

—হ্যাঁ।

—কাজটা ভাল করেননি! নতুন বিবাহ করছেন, অনেক খরচ বাড়বে আপনার—

পণ্ডিত বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন, কেন? তিনটি প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা ছিল—তাই থাকবে। ব্যয় বর্ধিত হবে কেন?

চন্দ্রবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন শুধু।

দেড় ক্রোশ পথ অতিক্রম করে গো-যানটা যখনটা নির্দিষ্ট বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল, তখন চন্দ্রবাবু নিজেই একটু অবাক হলেন। গোপনেই আয়োজন করতে বলেছিলেন তিনি; কিন্তু তাই বলে একটি হ্যাসাক-বাতিও জ্বলবে না, দ্বারের পাশে একজোড়া কলাগাছও দেখতে পাবেন না, এতটা উনিও আশংকা করেননি। গো-শকট এসে দাঁড়াবার আগেই সাইকেল চেপে সুবলচন্দ্র অকুস্থলে এসে পৌঁচেছিলেন। তবু গোরুর গাড়ি এসে পৌঁছাতে কোন হুলুধ্বনি শোনা গেল না অন্দরমহল থেকে, মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠল না। কৃষ্ণসহায়বাবু থেলো হুঁকাটা নামিয়ে রেখে দাওয়া থেকে নেমে আসেন। পণ্ডিতের হাতটা টেনে নিয়ে বলেন, আসুন, আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক!

এবং পরমুহূর্তেই পণ্ডিতকে সুবলচন্দ্রের জিম্মায় সমর্পণ করে চন্দ্রবাবুকে একটু জনান্তিকে টেনে নিয়ে গেলেন।

—কী ব্যাপার কৃষ্ণসহায়বাবু? আপনাকে কিঞ্চিৎ বিচলিত মনে হচ্ছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! একটু বিচলিত হয়ে পড়েছি। একটু আগে কয়েকজন ছোকরা সাইকেলে চেপে এসেছিল। আমি তাদের কাউকে চিনি না। এ গাঁয়ের ছেলে নয়। শুনলাম, তারা শান্তির স্কুলে পড়ে। জানেন নিশ্চয়, শান্তি দেবীপুরের স্কুলে পড়তে যায়—

বাধা দিয়ে চন্দ্রবাবু বলেন, ওদের স্কুলে কি কো-এডুকেশন ?

—না, ঠিক কো-এডুকেশন নয়। সকালে মেয়েদের ক্লাস হয়, দুপুরে ছেলেদের। তা সে যাই হোক, ওরা দল বেঁধে সাইকেল চেপে এসেছিল, উড়ো খবর পেয়ে। আমাকে বললে, আপনি নাকি শান্তির সঙ্গে একটা বিয়ে-পাগলা দোজবরে বুড়োর বিয়ে স্থির করেছেন ? আমি তো সম্পূর্ণ অস্বীকার করে গিয়েছি। ওরা আমার কথায় বিশ্বাস করেনি, বললে, আমরা শান্তির সঙ্গে দেখা করে সত্যি কথাটা জানতে চাই। তাতে আমি প্রবল আপত্তি করেছিলাম। শান্তি কেন ওদের সঙ্গে কথা বলবে ?

—তারপর ?

—ওরা তৈরি হয়েই এসেছিল। একটি মেয়েকেও নিয়ে এসেছিল, সে বুঝি শান্তির সঙ্গে পড়ে। বললে, আমরা কেউ যাব না—এই মেয়েটি শান্তির সঙ্গে কথা বলে আসবে। কিন্তু সেখানে আপনারা কেউ থাকতে পারবেন না।

চন্দ্রবাবু ঢোঁক গিলে পুনরুক্তি করেন, তারপর ?

—রাজী হতে হল আমাকে। দুই বন্ধুতে দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ কী কথাবার্তা হল। তারপর সেই মেয়েটি বেরিয়ে এসে ছেলেদের বললে, না, গুজবটা মিথ্যা। তখন ওরা চলে গেল।

—শান্তিকে পরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সে তো বলছে, বান্ধবীকে কিছু বলেনি।

চন্দ্রবাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন, বাইরে থেকে ওরা এসে বিশেষ কিছু সুবিধা করতে পারবে না। গাঁয়ের ছেলেরা কী বলে ? তাদের কোন ক্লাব-ট্যাব নেই ? ফোকটে তো মেয়ের বিয়ে সারছেন, ঐ ক্লাবের ছেলেদের ডেকে একটা ডোনেশান-ফোনেশান অফার করুন না !

কৃষ্ণসহায়বাবু আমতা আমতা করে বলেন, ক্লাব তো আছে—'যুবসঙ্ঘ' ; কিন্তু আপনিই তো কাকপক্ষীকে জানাতে বারণ করেছিলেন ! এই শেষ মুহূর্তে তাদের ডেকে পাঠালে হিতে বিপরীত হবে না তো ? বেটারা এখন আমাদের বাগে পেয়ে মোটা টাকা চেয়ে বসবে।

—তবে থাক। তার চেয়ে তাড়াতাড়ি দুহাত এক করে দিন ! হিন্দুর বিয়ে একবার হয়ে গেলে আর কে কী করতে পারে ?

—স্ত্রী-আচার-ফাচারগুলো তাহলে বাদ দিই, কেমন ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আবার বলতে ! ওসব, কী বলে ভাল, ঐ অষ্টমঙ্গলার সময় করবেন বরং। সোজা পণ্ডিতমশাইকে সম্প্রদানের ওখানে নিয়ে যান। মেয়েকে আনুন। পুরুত আছেন তো ?

—তা আছেন। অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক।

—ব্যস ব্যস, তবে আর কী ! শুভস্য শীঘ্রম্ !

কিন্তু শুভকার্য নির্বিঘ্নে হওয়া কি এতই সহজ ? ন্যায়রত্নমশাই ছাঁদনা-

তলায় গিয়ে সবে দাঁড়িয়েছেন। হঠাৎ বাইরের দ্বারের কাছে একটা প্রচণ্ড কোলাহল শোনা গেল। কারা যেন ভিতরে আসতে চাইছে। চন্দ্রবাবু, সুবলচন্দ্র আর কৃষ্ণসহায় চীৎকার করে ওঠেন, দরজাটা বন্ধ করে দাও!

কিন্তু তার আগেই হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল একগাদা জোয়ান ছেলে—বহিরাগত হিতৈষীর সঙ্গে স্থানীয় যুবশক্তি। অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে এসেছে তারা। সামাজিক অন্যায়। হাতে তাদের হকি স্টিক। প্রথম বাড়িটা পড়ল বৃদ্ধ পুরোহিতের পিঠের উপর। 'বাবাগো' বলে তিনি সেই এক ঘায়েই ধরশোয়ী হলেন। আর উঠলেন না। কৃষ্ণসহায় একখানা চেলির জোড় পরে সম্প্রদানে বসেছিলেন, উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, এ কী? এসব কী হচ্ছে?

কথাটা তাঁর শেষ হয় না। একজন এগিয়ে এসে চুলের মুঠি চেপে ধরে বলে, এ শালাই না মেয়ের বাপ?

কৃষ্ণসহায় আত্মপরিচয় দেবার আর সুযোগ পাননি। তার আগেই কে একজন প্রচণ্ড ধাক্কায় তাঁকে মাটিতে পেড়ে ফেলল। সম্প্রদানের মাটির ঘটটা বিদীর্ণ হয়ে গেল তাঁর দেহভারে।

চন্দ্রবাবু বিহ্বলভাবে চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিলেন। তারপর অতি সন্তর্পণে বাঁ-পকেটে গোঁজা কোঁচাটাকে মালকোঁচা করে নিলেন এবং হঠাৎ বিদ্যুদ্‌গতিতে ছুটে বেরিয়ে গেলেন খিড়কির দরজা দিয়ে। খিড়কির পরেই একটা কচুঝোপ, তারপর গোয়াল। একটা গোবরের গাদায় তাঁর একটা পা আ-হাঁটু ডুবে গেল। চন্দ্রবাবু ভ্রূক্ষেপ করলেন না। একপাটি পাম্প-শু সেখানে গচ্ছিত রেখে, বাবলা কাঁটা এবং কচুঝোপ অগ্রাহ্য করে উল্কার গতিতে তিনি ছুটে বেরিয়ে গেলেন জোনাক-জ্বলা অন্ধকারের মধ্যে।

পিঁড়ির একটা পাশ হঠাৎ নিরলম্ব হয়ে যাওয়ায় হতচকিত তিন জামাইবাবু সামলাতে সামলাতে সালংকারা নববধূ ভারসাম্য হারাল। হাত বাড়িয়ে সে সুবলচন্দ্রকে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিল—ঠিক সেই সময়েই আর একটি হকি স্টিক নামল সুবলচন্দ্রের ব্রহ্মতালুতে। তিনিও পড়লেন, নববধূও উবুড় হয়ে পড়ল প্রশান্ত পণ্ডিতের পায়ের উপর।

শুধু পাষণ্ড-পণ্ডিত বিহ্বলের মত দাঁড়িয়ে আছেন আলপনা দেওয়া পিঁড়ির উপর। যেন কী হচ্ছে তা তিনি বুঝতেই পারছেন না। যেন তিনি এ নাটকের অন্যতম চরিত্র নন, তিনি দর্শকমাত্র! চোখের উপর দক্ষযজ্ঞের একটি দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে।

নগ্নগাত্রে, টোপরমাথায়, চন্দনের ফোঁটায় সজ্জিত হয়ে, ফুলের মালা গলায় অচঞ্চল দীপশিখার মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। একজন বলিষ্ঠদর্শন যুবক এতক্ষণে এগিয়ে এসে চেপে ধরল তাঁর সামবেদী পৈতাটা।

ব্রাহ্মণ বললেন, এঁদের অপরাধ কী? অপরাধ যদি কারও হয়ে থাকে, তবে হয়েছে আমাদের, বস্তুত আমার!

—তা তো বটেই ! তা তোকেই যে রেহাই দেব, তা ভাবছিস কেন রে ?

ঠাস্ করে একটা প্রচণ্ড চড় মারে সে ন্যায়রত্নের চন্দনচর্চিত বামগণ্ডে।

একবারমাত্র টলে উঠেই আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন পণ্ডিত। একটি হাতও উঠালেন না আত্মরক্ষার্থে, বললেন, তোমার পদতলে নববধূ পিষ্ট হচ্ছেন !

ছেলেটি নিজের পায়ের দিকে তাকায়। উত্তেজনায় কিসের উপর দাঁড়িয়ে আছে তা তার খেয়াল ছিল না। বধূ নিশ্চয় অজ্ঞান হয়ে গেছে, না হলে তার পিঠের উপর এভাবে দাঁড়ানোতে সে নিশ্চয় আর্তনাদ করে উঠত !

পাশের থেকে আর একজন বললে, শালা বিয়ে-পাগলা বুড়োর জ্ঞান টনটনে ! শালার নজর এখনও 'নববধূর' দিকে ! শালা !

প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারল সে পণ্ডিতের চিবুকে। ন্যায়রত্নের মুখটা উঁচু হয়ে গেল—আকাশের দিকে উঠে গেল। নিচের একটা দাঁত নড়ছিলই ক'দিন থেকে। এ আঘাতে ভেঙে বেরিয়ে এল সেটা। দরদর করে রক্ত পড়তে শুরু করল। শ্বেতকরবীর মালাটা লালে লাল হয়ে গেল। তবু আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা করলেন না তিনি। ঊর্ধ্ব আকাশের দিক থেকে মুখটা নামিয়ে এনে আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। পরমুহূর্তেই প্রথম ছোকরা ওঁর তলপেটে একটা প্রচণ্ড লাথি মারল। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। মাথার মধ্যে টলে উঠল। জ্ঞান হারিয়ে নববধূর উপরেই উবুড় হয়ে পড়লেন ন্যায়রত্ন।

জ্ঞান যখন ফিরে এল তখন কত রাত হয়েছে বুঝতে পারলেন না। নিজেকে আবিষ্কার করলের কালকাসুন্দির একটা ঝোপে। সর্বাঙ্গে অসম্ভব যন্ত্রণা। চোয়ালে, পেটে এবং মাথায়। রক্তে ভেসে গেছে বুকটা। ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। একটা শেয়াল দূর থেকে তাঁকে লক্ষ্য করছিল ; ওঁকে উঠে বসতে দেখে জঙ্গলের মধ্যে ছুটে পালাল। শুক্লা দ্বাদশী তিথি। জ্যোৎস্নায় গ্রাম্যপথ আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। উঠে দাঁড়ালেন। ব্রহ্মতালুতে এত যন্ত্রণা কেন ? মাথায় তো তিনি আঘাত পাননি ! হাতটা মাথায় উঠে গেল। এবার অনুভব করলেন কারণটা। তাঁর শিখাটি মস্তকচ্যুত হয়েছে। না, কাঁচি দিয়ে কেটে নেওয়া হয়নি, উপড়ে ফেলা হয়েছে। তাই মাথায় এত যন্ত্রণা। কে জানে, হয়তো ঐ শিখার মুঠি চেপে ধরেই তাঁকে সেই বিবাহ-বাসর থেকে এই বনপথে টেনে হিঁচড়ে আনা হয়েছিল। অজ্ঞান অবস্থায় তিনি জানতে পারেননি।

অস্ফুটে ব্রাহ্মণ বলতে গেলেন, বাসুদেব ! তুমিই সত্য !

পারলেন না। জিবটা বিশ্রীভাবে কেটে গেছে।

পায়ের চটিজোড়া কোথায় পড়ে গেছে। তা যাক, নগ্নপদে চলাফেরায় তিনি অভ্যস্ত। পথটা তিনি চিনতে পেরেছেন। স্টেশনে যাবার রাস্তাটা।

এই পথেই কয়েক ঘণ্টা আগে চন্দনচর্চিত পণ্ডিত গো-যানে করে এসেছিলেন না? আর সেই সময় ফুলের মালাটা ছিঁড়ে ফেলে ছুটে পালাবার একটা ইচ্ছা জেগেছিল না তাঁর?

না, ছুটে পালাবার আর প্রয়োজন নেই। সে ক্ষমতাও নেই। সর্বাঙ্গে অসহ্য বেদনা। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তিনি দেবীপুর স্টেশনের দিকেই চলতে থাকেন।

স্টেশনে এসে দেখা হল চন্দ্রবাবুর সঙ্গে। তাঁর খুব কিছু ক্ষতি হয়নি। পাঞ্জাবিটা ছিঁড়েছে, আর জুতোজোড়া গেছে। ন্যায়রত্নকে দেখে বলেন, ঈশ্! এ কী চেহারা হয়েছে আপনার? একেবারে চেনাই যায় না যে?

পণ্ডিত জবাবে কী একটা কথা বলতে গেলেন, পারলেন না। মুখটা এমন ফুলেছে আর জিবটা এমন বিশ্রীভাবে কেটে গেছে যে, একটা 'গো'-'গো' শব্দ মাত্র বার হল তাঁর রক্তাক্ত মুখ দিয়ে।

—আসুন, স্টেশানমাস্টারমশায়ের কাছে নিশ্চয় টিঞ্চার আইওডিন পাওয়া যাবে!

পণ্ডিত হাত দুটি জোড় করলেন শুধু।

—না না, এ কি চক্ষুলজ্জা করার সময়? সেপ্‌টিক হয়ে যেতে পারে!

কিন্তু ন্যায়রত্ন তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। কিছুতেই তিনি স্টেশনমাস্টারমশায়ের বাসায় যেতে রাজী হলেন না। সেই দুটি নাতনির বয়সী কৌতুকময়ী তরুণীর সম্মুখে এই অবস্থায় তিনি কিছুতেই যাবেন না। অগত্যা স্টেশনের কলে নিয়ে গিয়ে চন্দ্রবাবু পণ্ডিতের রক্তধারা ধুইয়ে দিলেন।

মুখ-হাত ধুয়ে পণ্ডিত চন্দ্রবাবুর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালেন। বীভৎস-ভাবে ফুলে উঠেছে মুখটা। বাঁ-চোখটা একেবারে ঢেকে গেছে। একটা দাঁত পড়ে যাওয়ায় মুখটা ফোকলা হয়ে গেছে। ঐ অবস্থাতেই অদ্ভুতভাবে হাসলেন পণ্ডিত। চন্দ্রবাবুর মনে হল, ন্যায়রত্ন কোন সংস্কৃত নাটকে বিদূষকের পার্ট করছেন। কোনক্রমে হাসি চেপে বললেন, কিছু বলবেন?

পণ্ডিত ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন, 'এ্যাও এ্যাও' করে কী যেন বলবার চেষ্টাও করলেন। মুখের হাসিটা তাঁর তখনও মিলিয়ে যায়নি, অথচ চোখ দুটি করুণ-মিনতি মাখা হয়ে উঠেছে।

চন্দ্রবাবু বলেন, এ অবস্থায় আর কথা বলার চেষ্টা করবেন না।

কিন্তু গরজ বড় বালাই! একগুঁয়ে মানুষটার জিদও অসম্ভব। কিছু একটা তিনি বলতে চান, এবং সেটা না বলতে পারা পর্যন্ত তাঁর প্রাণটা ঠাণ্ডা হবে না। অগত্যা চন্দ্রবাবু তাঁর কর্ণমূল ঐ বিকৃত মুখখানার কাছে বাড়িয়ে ধরেন। অনেক কষ্টে পণ্ডিত শুধু বলতে পারেন, একথা যেন কেউ জানতে না পারে!

—আরে এসব কী বলছেন আপনি? পাগল, একথা কি পাঁচ-কান

করবার? কাকপক্ষীতেও টের পাবে না। আমারই ভুল হয়েছে। বিবাহের আয়োজন কলকাতায় করা উচিত ছিল। আমার বাসা থেকে হলে এতক্ষণে আপনারা বাসরঘরে গিয়ে বসেছেন।...দেখতাম, কোন্ শালা আটকায়!

পণ্ডিত আবার 'এ্যাও-এ্যাও' করে কী যেন বললেন।

এবার বিন্দুমাত্র বুঝতে পারলেন না চন্দ্রবাবু। না পারাই স্বাভাবিক। তিনি কেমন করে আন্দাজ করবেন, পণ্ডিত ঐ অবস্থাতেও যা বলতে চাইছেন তা চন্দ্রবাবুর ঐ 'শালা' শব্দটির প্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ!

—এখন ভালয় ভালয় আপনাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারলে বাঁচি! নিন, আমার শালটা দিয়ে কান-মাথা ফেট্টি বেঁধে ফেলুন। না হলে মানুষজনের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণান্ত হবে। আমি এখানে এসেছি অনেকক্ষণ। আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। ফেলে রেখে তো আর যেতে পারি না!

চন্দ্রবাবু অবশ্য বাহুল্যবোধে আর বললেন না যে, ইতিমধ্যে কলকাতাগামী কোন ট্রেনও আর আসেনি।

বেদনার তাড়সে ছুটির দিন তো বটেই, তার পরের তিনটি দিনও পণ্ডিত বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলেন না। প্রচণ্ড জ্বর এসেছিল তাঁর। চন্দ্রবাবু বুদ্ধি করে খুকুকে আটকে রেখেছিলেন তাঁর বাসায়। বাপের ঐ বীভৎস মুখ দেখলে বেচারি ভয়ে আঁতকে উঠত। অহেতুক কতকগুলো কৈফিয়তের সম্মুখীন হতে হত পণ্ডিতকে। এ ক'দিন সন্ধ্যার পর চন্দ্রবাবু একবার করে খোঁজ নিয়ে গেছেন। শূন্য ঘরে চৌকিতে শুয়ে কাতরাতে কাতরাতে তাঁর এই নূতন জীবনের নিঃসঙ্গতাকে পণ্ডিত যেন নিবিড় করে অনুভব করলেন। স্বাস্থ্য তাঁর মোটামুটি ভালই—তবু সামান্য জ্বরজারি হলে প্রতিমা তাঁকে যেন একেবারে আড়াল করে রাখত। সারারাত বসে বসে হাওয়া করত, অথবা মাথায় হাত বুলাত। অবশ্য এ রকম প্রচণ্ডভাবে অসুস্থ তিনি কখনও হননি তাঁর সংক্ষিপ্ত সাত বছরের বিবাহিত জীবনে। এবার তিনি পারতপক্ষে ঘর ছেড়ে উঠে বাইরে যাননি। রাত থাকতেই কান-মাথা ঢেকে শৌচাগারের কাজ সেরে আসতেন। খুকু কেন নেই, পণ্ডিত কেন শুয়ে আছেন, সে প্রশ্ন অবশ্য কেউ জিজ্ঞাসা করতে এল না। এমনকি কাতুবুড়ি পর্যন্ত নয়। পুত্রবধূর শাসনের পরে সে খুকুর সম্বন্ধে যেন একটু নিস্পৃহ হয়ে পড়েছে। এবার অবশ্য শুধু সেই কারণে সে এমন নির্লিপ্ত হয়ে পড়েনি। পাশের ঘরের দু-একটা টুকরো কথা কানে এসেছিল পণ্ডিতের। কাতুবুড়ি পাশের ঘরে কাতরায়, আজ বিছানায় শুয়ে পড়েছি বলেই এতবড় কথাটা তুমি বললে বৌমা? বেশ, তাই যেন হয়! এ অসুখ যেন আমার না সারে। হেই ভগবান, বাঁসিমুখে জল দিইনি ঠাকুর, এবার তুমি দয়া কর, আমায় টেনে নাও তোমার কোলে। বেটাবউয়ের এ পিণ্ডি যেন আমাকে আর না গিলতে হয়।

পণ্ডিত বুঝে নিয়েছেন পাশের ঘরে কাতুবুড়িও শয্যাশায়ী। না হলে সে অন্তত একবার এসে দাঁড়াত, বলত—হ্যাঁরে, খুকুটা কই গেল? অথবা পণ্ডিতের চেহারাখানা দেখে আঁৎকে উঠে বলত—ওমা, এমন দশা তোর করল কোন্ শত্তুর?

চার-পাঁচ দিন জ্বরভোগের পর সেদিন সকালে পণ্ডিত উঠে বসেছেন। প্রতিমার একখানা ছোট কাঠের হাত-আয়না ছিল। ঐটে সামনে নিয়ে পণ্ডিত সপ্তাহে দু-তিন দিন দাড়ি কামাতেন। সেই ছোট আয়নাটায় একবার নিজের মুখখানা দেখলেন। না, মুখের ফোলাগুলো অনেকটা কমে গেছে। একমুখ দাড়ি গজিয়েছে একদিনে। তা হোক, ওটা থাক। আজ স্কুলে যেতে হবে। তিন দিন কামাই হয়ে গেল। দাড়ি কামালেই মুখের বিকৃতিটা আরও বেশি করে নজরে পড়বে। হয়তো কেউ প্রশ্ন করে বসতে পারে এ নিয়ে।

ক'দিন প্রায় অনাহারেই কেটে গেছে। চন্দ্রবাবুকে দিয়ে একছড়া পাকা কলা কিনে এনেছিলেন, তাতেই এক'দিন ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছেন। আজ উনানে আগুন দিলেন। যা হোক দুটি ফুটিয়ে মুখে দিতে হবে। আতপ চাল এখনও কিছুটা ঘরে আছে। বেতের টুকরিটায় গোটা চারেক আলুও পড়ে আছে। সিদ্ধ করে নিলেই হবে। স্কুল-ফেরত আজ খুকুকেও নিয়ে আসবেন, এবং তারপর ভাল করে বাজার করবেন। কাল বরং দু-একপদ তরকারি রাঁধবেন। দুধটা এ ক'দিন নেওয়া হয়নি। বিকালে ডিপোতে গিয়ে দুধও নিয়ে আসতে হবে।

ক'দিন সন্ধ্যাহ্নিক হয়নি। শুয়ে শুয়েই দশবার করে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করছেন। উপায় কী? আতুরে নিয়ম নাস্তি। আজ ভাল করে আহ্নিক করলেন। গঙ্গাজল ছিলই ঘরে। আহারাদি সেরে, উচ্ছিষ্ট ফেলে, বাসন ধুয়ে ছাতিটি মাথায় দিয়ে বেশ ক'দিন পর আজ থার্ড-পণ্ডিতমশাই স্কুলের দিকে রওনা দিলেন।

প্রথম ঘণ্টাতেই একাদশ শ্রেণীর সংস্কৃত ক্লাস। তার পূর্বে হেডমাস্টার-মশায়ের সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। চন্দ্রবাবু নিশ্চয় তাঁকে বলে রেখেছেন যে, পণ্ডিত অসুস্থ। তবু প্রথমেই হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার।

স্কুল বসতে তখনও মিনিটদশেক বাকি আছে। হেডমাস্টার মশাই জগদানন্দনবাবু বসে একখানা বাঙলা সংবাদপত্র পড়ছিলেন। পাশেই অক্ষয়বাবু। পণ্ডিত ঘরে ঢুকে হাত তুলে নমস্কার করতে বলেন, কী হয়েছিল ন্যায়রত্নমশাই? ইনফ্লুয়েঞ্জা?

পণ্ডিত হ্যাঁ-নার মধ্যে না গিয়ে বলেন, ক'দিন খুব ভুগে উঠলাম।

—নতুন ঠাণ্ডা পড়ছে তো, একটু সাবধানে থাকবেন।

সাবধান পণ্ডিত যথেষ্টই আছেন, তাই কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছিলেন,

হঠাৎ জগদানন্দবাবু বলে ওঠেন, আচ্ছা পণ্ডিতমশাই, ব্রাহ্মণদের মধ্যে কি 'কন্যাপণ' প্রথা প্রচলিত আছে? আমি তো জানতাম বরই বরং পণ দাবী করে।

হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন উঠল বুঝে উঠতে পারলেন না পণ্ডিত। তাঁর সেই অবাক দৃষ্টির প্রত্যুত্তরে জগদানন্দবাবু হাতের খবরের কাগজখানা ওঁর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলেন, পড়ে দেখুন!

চিহ্নিত অংশটা পড়তে গিয়ে পণ্ডিতের হাত-পা অবশ হয়ে এল।

বর্ধমানের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, সম্প্রতি দেবীপুর অঞ্চলে একটি কৌতুককর ঘটনা ঘটেছে। চণ্ডীগড় গ্রামে একজন সত্তর বছরের বিয়ে-পাগলা-বুড়ো স্থানীয় একটি অষ্টাদশীকে বিয়ে করতে এসেছিলেন। বিয়ে-পাগলা-বুড়োটি ব্রাহ্মণ এবং প্রচুর কন্যাপণের লোভ দেখিয়ে কনের পিতাকে এই অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত করেন। সংবাদদাতা আরও বলেছেন, বৃদ্ধের সন্তানাদি আছে, এবং তার শেষ পত্নীর মৃত্যু হয়েছে মাত্র পক্ষকাল পূর্বে। গ্রামের যুবশক্তি এই গোপন সংবাদ সংগ্রহ করে কন্যাটিকে উদ্ধার করে। বিয়ে-পাগলা বুড়োর লাঞ্ছনার আর অবধি থাকে না। প্রাণ নিয়ে সে কোনক্রমে পালিয়ে বাঁচে।

ন্যায়রত্ন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে থাকেন সেই অঘ্রাণের সকালে। জগদানন্দবাবু কি সব কথা জানতে পেরেছেন? কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব? চন্দ্রবাবু কিছুতেই এটা প্রকাশ হতে দেবেন না। তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাহলে?

খবরটা পড়তে যতক্ষণ লাগা উচিত তার পরেও পণ্ডিত মুখ তুলছেন না দেখে হেডমাস্টারমশাই বলেন, আমার ধারণা ছিল ব্রাহ্মণদের মধ্যে কন্যাপণ প্রচলিত নেই, বরং বরপণই দিতে হয়। তাই নয়?

পণ্ডিত কোনক্রমে বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাহলে এখানে কন্যাপণের কথা লিখেছে কেন?

পণ্ডিত নিরুত্তর।

জগদানন্দবাবু বলেন, এই বিংশ শতাব্দীতেও যে এমন কাণ্ড ঘটতে পারে এটা আমার বিশ্বাস হয় না। বৃদ্ধকে জীবিত ফিরতে দেওয়া উচিত হয়নি ওদের। সে হয়তো এতক্ষণে অন্য কোথাও বিয়ে করতে ছুটেছে!

অক্ষয়বাবু বলেন, একটা কথার কিন্তু উল্লেখ নেই। মেয়েটির কী হল! উৎসাহী যুবকদের মধ্যে কেউ যদি অগ্রসর হয়ে ঐ লগ্নেই মেয়েটিকে বিবাহ করত তাহলেই নাটকটাকে সর্বাঙ্গসুন্দর বলা চলত।

ঢং-ঢং করে ঘণ্টা পড়ে যাওয়ায় পণ্ডিত পালাবার একটা সুযোগ পেলেন। ঈশ্বর রক্ষা করেছেন। সংবাদটা ওঁরা জানেন না। সংবাদপত্রটা তাঁর কাছেই মেলে ধরাটা, ঐ যাকে বলে কাকতালীয় ঘটনা, তাই।

রেজিস্টার, চক আর ডাস্টার নিয়ে পণ্ডিতমশাই একাদশ শ্রেণীর দিকে রওনা দিলেন।

—বস বস তোমরা, আসন গ্রহণ করো।

বলতে বলতে তিনি গিয়ে বসলেন নিজ আসনে। রেজিস্টার খাতা খুলে নাম ডাকতে যাবেন, তার আগেই একটি ছেলে বলে ওঠে, আপনার অসুখ করেছিল স্যার?

—হ্যাঁ বাবা।

—কী অসুখ, স্যার?

—ওসব কথা থাক সুনীল। কুশলাদির প্রশ্ন ক্লাসের পরে হবে।

এরপর তিনি রোল-কলে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু বারে বারেই মনে হচ্ছে ছেলেদের মধ্যে একটা চাপা হাসির স্রোত বয়ে যাচ্ছে। যতবার উনি খাতায় দৃষ্টি নামিয়ে আনছেন, ততবারই ওরা চঞ্চল হয়ে উঠছে—আর মুখ তুললেই ভাল ছেলের মত চুপচাপ বসে থাকছে।

রোল-কল শেষ হল। পণ্ডিত বলেন, এস, এবার আমরা প্রার্থনা করি। যারা ব্রাহ্মণ এবং যাদের উপনয়ন হয়েছে তাঁরা 'ওঁ' বলবে, অপরাপর সকলে 'নমঃ' বলবে, নাও বল—

হাত দুটি জোড় করে পণ্ডিত উঠে দাঁড়ান, নিমীলিত নেত্রে বলেন,

—ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ—অর্থাৎ ব্রহ্ম আমাদের গুরুশিষ্য উভয়কে সমভাবে রক্ষা করুন, উভয়কে তুল্যভাবে বিদ্যাফল দান করুন—আমরা যেন উভয়ে সমানভাবে সামর্থ্য অর্জন করিতে সক্ষম হই। বল, 'তৈজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ।' অর্থ বুঝলে? নৌ+অবধীতম্ +অস্তু, হল গিয়ে নাবধীতমস্তু। অর্থাৎ কিনা, আমাদের উভয়ের অধীত বিদ্যা তেজস্বী হউক। এবং শেষ প্রার্থনা—'মা বিদ্বিষাবহৈ'; যার অর্থ আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি, আমরা যেন অসূয়ামুক্ত থাকতে পারি! বল, 'ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ!'

কোথাও কিছু নেই ক্লাসশুদ্ধ ছেলে হো হো করে অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে।

পণ্ডিত স্তম্ভিত হয়ে যান! এর মানে কী? মর্মান্তিক ক্রোধে গর্জন করে ওঠেন, হাস্য কিসের? কে হাসছে?

পিছনের বেঞ্চি থেকে মুখ লুকিয়ে একটি ছেলে বলে ওঠে, শান্তি কার নাম পণ্ডিতমশাই?

শান্তি কার নাম? এ-প্রশ্নের অর্থ? পণ্ডিতমশাই মনে করতে পারেন না। গত বৎসর শান্তিপ্রকাশ ঘোষ নামে একজন বি. টি. টিচার ক'মাস এই স্কুলে পড়িয়েছিলেন, এছাড়া শান্তি নামের আর কোন ভদ্রলোককে তো মনে পড়ছে না!

পণ্ডিতের ধমকে হাসিটা থেমেছে। কিন্তু চকখড়িটা হাতে নিয়ে যেই তিনি বোর্ডের দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছেন অমনি উচ্ছ্বসিত হাসির দমকে ছেলেরা আবার যেন ফেটে পড়ল। বোর্ডের দিকে তাকিয়ে পণ্ডিত বুঝতে পারেন, ওদের এই পৈশাচিক হাসির উৎস কোথায়!

কালো বোর্ডের সমস্তটা জুড়ে একটি ব্যঙ্গচিত্র আঁকা। তালগাছের মত দীর্ঘ শীর্ণকায় একটি বর এবং ক্ষুদ্রকায় একটি কনে। কনের মাথায় মুকুট, কিন্তু বরের টোপরটা হাতে ধরা আছে—না হলে চিত্রকরের অসুবিধা হত কদমফুল-ছাঁট চুলের উপর খাড়া হয়ে থাকা অর্কফলাটি আঁকতে। বরের পায়ে বিদ্যা-সাগরী চটি, ধুতি হাঁটু পর্যন্ত। ব্যঙ্গচিত্রের বক্তব্য বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না, তবু চিত্রকর বরের নিচে লিখেছে 'পাশণ্ড পণ্ডিত' এবং কনের নিচে লিখেছে 'ওঁ শান্তিঃ'।

পণ্ডিতের মুখটা ছেলেরা দেখতে পাচ্ছে না। তিনি আর ক্লাসের দিকে মুখ ফেরাননি। তাঁর পিঠের উপর তীক্ষ্ণ তীব্র হাসির শরাঘাত হয়ে চলেছে। পিতামহ ভীষ্মের মত সে শরাঘাতের যন্ত্রণা সহ্য করছেন পণ্ডিত। পৌত্রের বয়সী তাঁর শিষ্যকুল পৈশাচিক উল্লাসে আজ পিতামহ ভীষ্মকে শরশয্যায় শায়িত করতে চায়। কলিযুগের ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু নেই, না হলে ছাত্রদের দিকে তিনি আর মুখখানা ফেরাতেন না, ইচ্ছামৃত্যুকেই বরণ করে নিতেন। উনি মুখ ফেরাচ্ছেন না, আপত্তি জানাচ্ছেন না দেখে ছেলেরা সাহস পেয়ে দ্বিগুণ জোরে হেসে ওঠে, আপনার টিকি কে উপড়ে নিল, স্যার?

পাশের ঘরে ক্লাস নিচ্ছিলেন চন্দ্রবাবু। বিরক্ত হয়ে তিনি উঠে এলেন এ ঘরে, য়ু বয়েজ! অত হাসছ কেন তোমরা? ক্লাসে টীচার নেই?

বলেই তাঁর দৃষ্টি পড়ে কালো বোর্ডটার উপরে। নিজেও হেসে ফেলেন তিনি। তারপর বহু কষ্টে হাস্য সংবরণ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলেন পণ্ডিতকে। দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। এবারে এদিকে ফিরলেন। চন্দ্রবাবু লজ্জা পেলেন। পণ্ডিতের দু চোখে নেমেছে শ্রাবণের ধারা।

চন্দ্রবাবু বিবাহ-বাসর থেকে পালিয়ে এসেছিলেন, তিনি জানতে পারেননি—কিন্তু জগদীশ্বর জানেন, চণ্ডীগড়ে ছাদনাতলায় নির্মমভাবে দৈহিক নির্যাতন সহ্য করেছেন পণ্ডিত মাথা খাড়া রেখে। রক্ত ঝরেছে তাঁর মুখ দিয়ে, কিন্তু চোখ দিয়ে একফোঁটা জল ঝরেনি। সেই মানুষটা এখন ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। পুত্রসম ছাত্রদের কাছে এ অপমানে তাঁর এতদিনের স্বপ্নটাই যে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল! এইমাত্রই না তিনি বলেছেন, মা বিদ্বিষাবহৈ!

পাঞ্জাবির হাতায় চোখ দুটো মুছে নিয়ে ব্রাহ্মণ এবার একবার চন্দ্রবাবুর দিকে তাকালেন। চন্দ্রবাবু আপ্রাণ প্রচেষ্টাতেও হাস্য সংবরণ করতে পারলেন না। পণ্ডিতের ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল, কিন্তু দেবীগড় স্টেশনেও যেমন দৈহিক যন্ত্রণায় বাক্যস্ফূর্তি হয়নি, এবারও তেমনি কোন কথা বলতে পারলেন না মানসিক যন্ত্রণায়।

রেজিস্টার খাতাখানা তুলে নিয়ে পিরিয়ড শেষ না হতেই পণ্ডিত ক্লাস ছেড়ে চলে গেলেন। কিন্তু চৌকাঠের বাইরে পা দিয়েই আবার ফিরে এলেন।

এগিয়ে গেলেন বোর্ডের দিকে। না, ডাস্টার দিয়ে ছবিখানা মুছে দিতে তিনি যাননি। শুধু 'পাশণ্ড' শব্দটার 'শ'-টাকে কেটে লিখে দিলেন 'ষ'। তারপর মাথা নিচু করেই বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে।

অফিসঘরের সামনেই মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন জগদানন্দবাবু। মর্মান্তিক একটা দৃষ্টি ন্যায়রত্নের দিকে নিক্ষেপ করে বললেন, আপনিই? ছিঃ!

সোজা গিয়ে উঠলেন চন্দ্রবাবুর বাড়ি। খুকুকে নিয়ে কালীঘাটের সেই বস্তির ঘরখানাতে ফিরে এলেন। চন্দ্রবাবুই ছিলেন এই কলকাতা শহরে তাঁর একমাত্র বন্ধু। মর্মান্তিক অপমানের মধ্যে দিয়ে আজ তাঁকেও হারালেন। এ শহরের সঙ্গে আর কোন আন্তরিক বন্ধন রইল না। এদিক থেকে যতীন মাতাল বরং ভাল। সে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা মদের ঝোঁকে। সজ্ঞানে নয়। দিনের যতীন আর রাতের যতীন দুটি পৃথক সত্তা। কালীতারা কেবিনে সে ছুটে আসত শুধুমাত্র মদের আকর্ষণে নয়, ঐশ্বর্যের বিকর্ষণে। আর তাই সে কালীতারা কেবিনে ঠোকর খেয়ে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছাত খুকুর খেলাঘরে। পণ্ডিতের হেঁসেলে কাঁচকলা সিদ্ধ ভাতের প্রতি আগ্রহ ছিল তার। য়ুরোপখণ্ডের ঘরানা ঘরের ছেলেমেয়েরা একদিন মুখোসের আড়ালে আভিজাত্যকে অস্বীকার করে কার্নিভালে যোগ দিত—আপামর জনসাধারণের আনন্দ-বেদনার ভাগীদার হতে চাইত, যতীনও তেমনি মদের আড়ালে নিজেকে ডুবিয়ে দেবার জন্যই এ পাড়ায় আসত।

কিন্তু চন্দ্রবাবু তো সে জাতের মানুষ নন। তিনি পণ্ডিতকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা মদের ঝোঁকে নয়;—তিনি জানতেন এ-কথা প্রকাশ পাওয়ায় তাঁর বন্ধুর কী মর্মান্তিক পরিণাম হবে। শুধুমাত্র একটু কৌতুকের লোভে, একটু মজাদার গল্প রসিয়ে রসিয়ে বলতে পারার লোভে, তিনি ন্যায়রত্নের উঁচু মাথাটা পাঁকের মধ্যে চেপে ধরলেন! আদর্শ ছাত্র গড়ার স্বপ্নটা পরিণত হল একটা প্রকাণ্ড প্রহসনে। প্রশান্ত পণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত হলেন সত্যই পাষণ্ড-পণ্ডিত রূপে।

রাত্রে খুকুকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বৃদ্ধ বললেন, মা-মণি, তোর যতীন-কাকু ঠিকই বলত রে। এই কলকাতা শহরটার সর্বাবয়বে বিষাক্ত ঘা। এখানে থাকলে আমাদের দেহেও সে বিষক্রিয়া সংক্রামিত হবে। চল্ মা, আমরা এখান থেকে চলে যাই—

বড় বড় দুটি চোখ মেলে খুকু বলে, কোথায় যাব বাবা? মায়ের কাছে?

মায়ের কাছে? একথাটা তো এতদিন মনে হয়নি! তাহলে সব জ্বালা জুড়ায় বটে! কিন্তু না। তা তিনি মেনে নিতে পারেন না! তাহলে যে স্বীকার করে নিতে হয়, এই দীন-দুনিয়ার মালিকও একজন পাষণ্ড! স্বীকার করে নিতে হয়, তাঁর এই সৃষ্টি ব্যর্থ। তাই কি কখনও হয়? এই কলকাতা

শহরটাকে দিয়েই তিনি কেন বিচার করবেন অমন সর্বশক্তিমান বিশ্ব-নিয়ন্তার এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি? কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বিঃ! কাল অনন্ত, পৃথিবীও বিপুলা। এই দেশে, এই কালে তিনি উপহাসাস্পদ হয়েছেন—তাঁর স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেছে, কিন্তু এটাই কখনও শেষ কথা হতে পারে না। এখানে না হয় নাই হল—শান্তির রাজ্য নিশ্চয় কোথাও আছে। সেখানকার মানুষ এমন ভুল বিচার করবে না। তাঁর মূল সমস্যাটা সহানুভূতির সঙ্গে যাচাই করবে, তাঁকে পথের সন্ধান দেবে। হাত ধরে তাঁকে সাহায্য করতে যদি এগিয়ে আসতে না-ও পারে তবু উপহাস করবে না। এত সহজেই কেন পরাজয় মেনে নেবেন পণ্ডিত? তিনি তো দুঃখবাদী নন—তিনি যে আনন্দের অভিসারী! তিনি কাকে ভয় করবেন? দৈহিক পীড়নকে? অসম্মানকে? অপমানকে? না। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচ ন বিভেতি কুতশ্চন। তিনি যে সেই আনন্দস্বরূপকে মনে-প্রাণে স্বীকার করে নিয়েছেন! কার ভয়ে তিনি আত্মবিনাশের পথে যাবেন?

—বল না বাবা, মায়ের কাছে?

—না মা-মণি, আমরা স্বগ্রামে ফিরে যাব।

—সেটা কী বাবা?

—আমাদের দেশ। এই যে মা গঙ্গা আছেন না, ঐ মা গঙ্গা দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হয়ে অন্তিমে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছেন। সেদিকেই যাব আমরা। আমাদের গ্রামের নাম সোনার-গাঁ। সত্যিই সেটা সোনার দেশ, মা-মণি। এই রকম পূতিগন্ধময় শহর নয়। সেখানে দিগন্ত অনুসারী উদার প্রান্তর, কনকবর্ণ ধান্যক্ষেত্র, সেখানে কত রকম পাখী, কত পুষ্প, বৃক্ষের কত ফল! সেখানকার মানুষও উদার, সহৃদয়—

সব কথা খুকু বুঝতে পারে না, আর বাপের সব কথা কবেই বা বুঝেছে খুকু? তবু এটুকু বুঝতে পারে, সেটা এই বস্তির চেয়ে অনেক ভাল একটা জায়গা। সাগ্রহে বলে, কবে যাব বাবা?

—কল্য প্রভাতেই যাব রে। এ ঘর তালাবন্ধ করে রেখে যাব। ভবিষ্যতে কোন একদিন এসে যাবতীয় বিলি-ব্যবস্থা করে যাব।

হ্যাঁ, কাল সকালেই এই ঘিঞ্জি পচা শহরটা ত্যাগ করে যাবেন। এখানে আর নয়। আর একদিনও নয়। চন্দ্রবাবু অথবা অক্ষয়বাবুরা খোঁজ-খবর নিতে আসার আগেই যাবেন। সোনার-গাঁয়ে পৌঁছে এখানকার স্কুলে একটি পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিতে হবে। এ মাসের ঘরভাড়া দেওয়াই আছে। দরকার হলে পরের মাসের ভাড়া মনি-অর্ডারযোগে পাঠিয়ে দেবেন। আর সুযোগ-সুবিধা হলে এ মাসের মধ্যেই আর একদিন এসে সব বিলি-ব্যবস্থা করে যাবেন। থাকার মধ্যে তো আছে খানকয় পুঁথি আর গ্রন্থ। তা তো নিয়েই যাবেন, আর আছে কিছু তৈজস—তাও নিয়ে যেতে হবে। চৌকিটা দিয়ে

যাবেন কাতুবুড়িকে। আহা বেচারি, ঐ বাতে পঙ্গু দেহটা নিয়ে মাটিতে শোয়!

খুকু বলে, সেই বেশ ভাল হবে বাবা। এ জায়গাটা পচা!

—হ্যাঁ, আমারও এখানে ভাল লাগে না। এই বেশ ভাল হল। কল্য প্রাতেই আমরা স্বগ্রামে ফিরে যাব। এখন লক্ষ্মী মেয়ের মত ঘুমিয়ে পড়।

বাবার বুকে মুখ গুঁজে খুকু চুপ করে শোয়।

পণ্ডিতের মাথায় তখন নানান চিন্তা।

অনেকক্ষণ পরে আবার মুখ তুলে খুকু বলে, নতুন মা কেন এলেন না বাবা?

কী জবাব দেবেন ভেবে পান না। তারপর মৃদু হেসে বললেন, নতুন মা আমাকে পছন্দ করলেন না, মা-মণি!

—কেন বাবা? তুমি বুড়ো বলে?

—হ্যাঁ, মা-মণি! আমি বৃদ্ধ! সেই জন্য!

—বুড়ো হওয়া বুঝি দোষের?

—না, মা। জরা-বার্ধক্য মানুষের অনিবার্য পরিণাম। অপরাধ নয়।

—তাহলে তোমাকে ওরা অমন করে মারল কেন?

চমকে ওঠেন বৃদ্ধ, মারল? কে মারল? কাকে মারল!

খুকু হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলে। বাপের পাঁজরা-সর্বস্ব বুকে মুখ গুঁজে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, আমি জানি। সব জানি!

পণ্ডিত কেমন যেন অসাড় হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ পরে খুকুর কান্নার বেগ একটু কমে এলে বললেন, কে বলেছে তোমাকে?

—নেড়াদা!

নেড়া চন্দ্রবাবুর ছেলে। কেমন যেন কুঁকড়ে গেলেন পণ্ডিত। এবার কি তাঁকে মা-মণির কাছে উপহাসাস্পদ হতে হবে? ভয়ে ভয়ে বলেন, নেড়া কী বলেছে? আমাকে কেউ মেরেছে?

ঝাঁকড়াচুলো মাথাটা নেড়ে খুকু বলে, হুঁ!

—কে মেরেছে?

—নতুন মা'রা। আচ্ছা বাবা, 'ধোলাই' কাকে বলে?

পণ্ডিত বলতে যাচ্ছিলেন, 'কাপড়-কাচা'-কে; কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারেন, সে অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হতে শোনেনি খুকু।

তাঁকে নিরুত্তর দেখে খুকু অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়, বলে, বুড়ো হওয়া যদি দোষের নয়, তবে ওরা তোমার দাঁত কেন ভেঙে দিল? তোমার টিকি কেন ছিঁড়ে নিল?

উদ্গত অশ্রুকে দমন করে পণ্ডিত চুপ করে পড়ে থাকেন। কী জবাব দেবেন ঐ অবোধ আত্মজাকে? কেমন করে কন্যাকে বোঝাবেন, কোন্

অপরাধে তাঁকে এ-ভাবে নিগৃহীত হতে হয়েছে? কেমন করে স্বীকার করবেন সে লজ্জার কথা?

খুকু কুণ্ঠিতা স্বরে বললে, তুমি বুঝি দুষ্টুমি করেছিলে বাবা?

হঠাৎ হা-হা করে কেঁদে ফেলেন বৃদ্ধ। সবলে খুকুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন. না-রে, না! জ্ঞানতঃ ধর্মতঃ কোন দুষ্টামি আমি করি নাই! আজ তুই অনেক কথাই বুঝবি না, মা-মণি। বড় হয়ে যখন এ-সব কথা মনে পড়বে তখন এটুকু বিশ্বাস রাখিস, তোর পিতা জ্ঞানতঃ কোন অন্যায় করে নাই, পাপাচার করে নাই! তবে হ্যাঁ, তোর কাছে স্বীকার করছি, মা-রে, ভুল আমি করেছিলাম, হ্যাঁ ভুল! মর্মান্তিক ভ্রান্তি হয়েছিল আমার।

খুকু বোধকরি ঐ 'মা-রে' সম্বোধনটায় সত্যই মা হয়ে যায়। বাপের পাঁজর-সর্বস্ব আলিঙ্গন থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করে নেয়। তার ছোট্ট ফ্রকের একটি প্রান্ত দিয়ে বৃদ্ধ বাপের কোটরগত চোখ দুটি মুছিয়ে দিয়ে বলে, বুঝেছি! আর তাহলে কখন ভুলও কর না বাবা, কেমন?

বৃদ্ধ নৈয়ায়িক ঐ ছোট্ট মানবশিশুর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন, রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, ঠিক বলেছিস মা! না-রে, আর এ ভুল করব না কখনও!

সাক্ষী থাকল ভাঙা জানলা দিয়ে উঁকি-মারা ঐ উজ্জ্বল একটা তারা।

এরপর দীর্ঘ পাঁচ বছর কেটে গেছে। কালীঘাট বস্তির সেই এক-কামরা ঘরে এখন অন্য ভাড়াটিয়ার বাস। কালীতারা-কেবিনের চট-ফেলা আধো-অন্ধকারে ইটের উপর বসে মাটির ভাঁড়ে অমৃত-আস্বাদন করতে যতীন সাধুখাঁ আজও আসে কিনা জানা নেই। গোপাল-নেপাল এখনও আছে তাদের ঘর দু-খানায়—তবে কাতুবুড়ি অনেক দিন হল গঙ্গাযাত্রা করেছে। গোপাল-নেপালদের ঘরে খুঁজলে পাষণ্ড-পণ্ডিতের সেই চৌকিখানা আজও দেখতে পাওয়া যাবে—সেটায় এখন নেপাল সস্ত্রীক শোয়। দুর্ভাগ্য কাত্যায়নীর, জীবনের শেষ ক'টা দিনও তাকে মাটিতে শুতে হয়েছে। চৌকিখানা ওদের সংসারে এসে পড়ার পরেও। বুড়ি কাত্যায়নী চৌকিতে শোবে, আর তার রোজগেরে সোনার চাঁদ ছেলেরা মাটিতে পড়ে থাকবে, এত বড় অসৈরণ সহ্য হয়নি বুড়ির পুত্রবধূর। চৌকিটা ওদের সংসারে কেমন ভাবে এসেছিল সেকথা আজ আর কারও মনে নেই। ও পাড়ায় পাষণ্ড পণ্ডিতের নামও কেউ উচ্চারণ করে না। কালীঘাটের সেই খোলার বস্তিতে আজ পাষণ্ড-পণ্ডিতের চিহ্ন নিঃশেষে মুছে গেছে।

ভুলে গেছে চেতলা স্কুলের ছাত্ররাও। তা তো যাবেই! এখন যারা উঁচু ক্লাসে উঠেছে তারা নেহাত নাবালক ছিল তখন। তখন যারা পড়ত তারা কেউ কলেজে পড়ছে, কেউ চাকরি-বাকরি করে। তবে কখনও-সখনও টিচার্স-রুমে পণ্ডিতের নামটা উঠে পড়ে। মৌলভী সাহেব অবসর নিয়েছেন; তা

নিন—অক্ষয়বাবু, চন্দ্রবাবু, ড্রইং মাস্টারমশাই এবং জগদানন্দবাবু এখনও আছেন। অক্ষয়বাবু হয়তো বলে বসেন, যাই বলুন ছেলেরা কিন্তু ভট্টাচার্য-মশায়ের নামটা জবর দিয়েছিল! লোকটা ছিল সত্যই একটা পাষণ্ড!

জগদানন্দবাবু বলেন, চন্দ্রকান্তবাবুকেও সম্পূর্ণ নির্দোষ বলা যায় না। তিনিই তো বুড়োকে লোভ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন!

চন্দ্রবাবু বলেন, কী করব স্যার? পণ্ডিত যেভাবে আমার হাতে-পায়ে ধরে পড়েছিল, অস্বীকার করতে পারিনি।

দোষ চন্দ্রবাবুর নয়। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে পণ্ডিতের অনুপস্থিতিতে এ প্রসঙ্গ বার বার উঠেছে। আত্মপক্ষ সমর্থন করতে কোন্ সুদূর অতীতে ঐ মিথ্যা কৈফিয়ৎটুকুকে আঁকড়ে ধরেছিলেন, তা আজ তাঁর মনেই নেই। হয়তো প্রথমবার এমন জলজ্যান্ত মিথ্যা কথাটা বলতে সংকোচ হয়েছিল—তারপর বার বার একই মিথ্যা কৈফিয়ৎ দাখিল করতে করতে সেই সংকোচের বাধাটা মোলায়েম হয়ে এসেছে। এখন উনি নিজেই বিশ্বাস করেন এই কৈফিয়তে। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে যে মিথ্যার খাদ এককালে মিশিয়েছিলেন সেটা বেমালুম নিজেই ভুলে গেছেন। এমনিই হয়, বিবেককে তো আমরা এভাবেই তালিম দিই; আত্মপক্ষ সমর্থনে সওয়াল যখন করি তখন সজ্ঞানে মিথ্যা বলি না, নিজের গড়া মিথ্যাকে নিজেই বিশ্বাস করি।

জগদানন্দবাবু বলেন, যাক, শাস্তিও ভদ্রলোক বড় কম পাননি। মারধোর তো যথেষ্টই হয়েছিল—চাকরিটাও গেল! কেউ তাঁর খবর রাখেন? শুনেছিলাম জয়নগরের ওদিকে কোথায় যেন তাঁর দেশ। বেঁচে আছেন ভদ্রলোক?

অক্ষয়বাবু বলেন, না, ইদানীং আর কোন খবর পাইনি। মৌলভী সাহেবকে লেখা তাঁর সেই চিঠিখানার কথা তো জানেনই!

—হ্যাঁ, সে তো পাঁচ বছর আগেকার কথা!

—তারপর আর কোন খবর নেই।

চন্দ্রবাবু বলেন, যাই বলুন, লোকটা খাঁটি হিন্দু ছিল না। আমরা না হয় তুচ্ছ মানুষ; অন্তত হেডমাস্টার মশাইকেও চিঠিখানা লিখতে পারত সে। মৌলভী সাহেব হাজার হোক বিধর্মী!

অক্ষয়বাবু বলেন, শুধু আমাদের অপমান করতেই প্রশান্তবাবু মৌলভী সাহেবকে চিঠি লিখেছিলেন।

কিন্তু না। ঈশ্বর জানেন, পাষণ্ড-পণ্ডিত কাউকে অপমান করার জন্য মৌলভী সাহেবকে পত্র লেখেননি। কারও প্রতি কোন অসূয়া নিয়ে, বিদ্বেষ নিয়ে তিনি স্কুল ত্যাগ করে যাননি। এই স্কুল-বাড়িতে দীর্ঘ পনের বছর ধরে বহু জাতের প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন পণ্ডিত; কিন্তু তাঁর শেষ মন্ত্রটি ছিল,—মা বিদ্বিষাবহৈ।

সে-মন্ত্র তিনি অন্তর থেকে গ্রহণ করেছিলেন,—কারও প্রতি কোন বিদ্বেষ তিনি রাখেননি মনের কোণে। ঐ বিধর্মী সহকর্মীর কাছে কেন তিনি চিঠি লিখেছিলেন তাই যদি এঁরা বুঝতে পারবেন, তাহলে আর পণ্ডিতকে সব ছেড়ে চলে যেতে হবে কেন?

দীর্ঘ পাঁচ বছর আগে একজন পত্রবাহকের হাতে প্রশান্ত ভট্টাচার্য একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন চেতলা স্কুলের মৌলভী সাহেবকে। খামের ভিতর একটি চাবিও ছিল। প্রশান্তবাবু লিখেছিলেন ঃ

'মহিমার্ণবেষু,

মৌলভী সাহেব, বন্ধুত্বের দাবীতে কয়েকটি কার্যের দায়িত্ব আপনার উপর অর্পণ করিতেছি। কলিকাতার লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিতর কেন আপনাকেই এ কার্যের জন্য নিয়োজিত করিলাম, এ প্রশ্ন আপনার অন্তরে জাগিতে পারে। আপনাদের ঐ শহরে ঈশ্বরবিশ্বাসী ধর্মপরায়ণ খুব বেশী মনুষ্যের সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য আমার ঘটে নাই। আমি লক্ষ্য করিয়াছি আপনার অন্তঃকরণ আপনার শ্মশ্রুর মতই শুভ্র। প্রথমতঃ এই পত্রের সহিত একটি পদত্যাগপত্র পাঠাইতেছি। এটি স্কুল-কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিবেন। আমার সামান্য কিছু বেতন হয়তো প্রাপ্য আছে, সেটি দুঃস্থ ছাত্রদের জন্য আমরা যে সাহায্য-ভাণ্ডার খুলিয়াছিলাম সেই খাতে জমা দিবার ব্যবস্থা করিবেন। দ্বিতীয়তঃ যে কুঞ্চিকা পাঠাইলাম তাহা মদীয় কালীঘাট-বাটির। দ্বার উন্মোচন করিলে আমার গৃহে একটি চৌকি এবং একটি কম্বল দেখিতে পাইবেন। আমার প্রাক্তন প্রতিবেশী শ্রীমান গোপাল ও নেপালের জননী শ্রীযুক্তা কাত্যায়নী দেবীকে ঐ দুটি আমার নাম করিয়া দিবেন। গৃহে দু-একটি কলাইয়ের থালা, গ্লাস, কৌটা ইত্যাদি থাকিতে পারে। তাহা ঐ বস্তীর দীন-দুঃখীকে বিলাইয়া দিবেন। দ্বারের পার্শ্বে বালগোপালের একটি ফ্রেমে-বাঁধানো চিত্র দেখিতে পাইবেন। সেটি নেপাল অথবা গোপালকে খুলিয়া লইতে বলিবেন। তাহাও কাত্যায়নী দেবীকে দিবেন। আপনি নিজে চিত্রটি স্পর্শ করিবেন না। তৃতীয়তঃ ঐ গৃহের অধিকার বস্তীর মালিক শ্রীবৈকুণ্ঠ চৌধুরীকে বুঝাইয়া দিবেন। ভাড়া সম্পূর্ণ দেওয়া আছে। ঘরের তালাটি মজবুত। আমার স্বর্গগতা স্ত্রী সেটি সখ করিয়া ক্রয় করিয়াছিলেন। আপনি ঐটি গ্রহণ করিলে এবং ব্যবহার করিলে সুখী হইব। খোদাতালা আপনার মঙ্গল করুন। নমস্কারান্তে ইতি—

শুভার্থী

শ্রীপ্রশান্তকুমার দেবশর্মনঃ

মৌলভী সাহেব বন্ধুর প্রত্যেকটি অনুরোধ বর্ণে বর্ণে পালন করেছিলেন।

প্রশান্ত ভট্টাচার্য সোনার-গাঁয়েই আছেন। আরও বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। বাহান্ন বৎসর বয়স হল তাঁর। তা হোক, এখন তিনি সুখী। তিন কোঠার

ভিটে ছিল এক সময়। সম্মুখের উত্তরমুখী মণ্ডপটা তো আবার ছিল আটচালা। সেটা ভেঙে পড়েছিল পণ্ডিত ফিরে আসার পূর্বেই। পূবদুয়ারী ঘরখানা তো তার আগেই গেছে। অবশিষ্ট ছিল একমাত্র দক্ষিণদুয়ারী চালাখানা। গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় সেটাই আবার খাড়া করে তুলেছেন। চালটায় আর কিছু ছিল না; আবার নতুন করে ছাউনি করতে হল। দেওয়ালগুলি অবশ্য অক্ষতই ছিল। জানলার দু-একটি পাল্লাও তৈরি করাতে হল গ্রাম্য ছুতোরের সাহায্যে। আগাছার জঙ্গল সব সাফ করালেন। বেল আর নিমগাছ দুটো কাটেননি। বেশ বড় হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে। বেড়ার ধার দিয়ে কলা, পেঁপে আর নারকোলের গাছ লাগিয়েছেন। নারকোল এ অঞ্চলে ভালই হয়। এ বৎসরই প্রথম ফল ধরেছে গাছে। ভিটে সংলগ্ন জমিও কম নয়। বিঘে দেড়েক। এক হাতে খুরপি চালিয়ে এতখানি জমিকে কব্জা করা যায় না; অথচ লাঙল চালাতেও অসুবিধা। ঐ দেড় বিঘের মধ্যেই আছে ঘরটা, তুলসীমঞ্চ, কলমের গাছ,—ফলে, লাঙল ঘোরাতে অসুবিধা হয়। তাই মাঝে মাঝে জনমজুর লাগান। মাটি কোপাতে, নিড়েন দিতে—খরার সময় জল দিতেও। ফসল মন্দ হয় না। গত বৎসর তো তাঁর ফুলকপি স্থানীয় প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত পর্যন্ত হয়েছে। বি-ডি-ও অফিস থেকে সার নিয়ে আসেন, বীজ নিয়ে আসেন, পোকামাকড় মারার ঔষধও নিয়ে আসেন। সংসারের জন্য যেটুকু প্রয়োজন তা রেখে বাকিটা ঐ মুনিষকে দিয়ে হাটে পাঠান। পাইকার এসে নিয়ে যায়। চালান যায় কলকাতায়।

এ-ছাড়া পূবদুয়ারী ঘরের বারান্দাটাকে একটু বাড়িয়ে নিয়ে একটা পড়াশুনার আয়োজন করেছেন। রোদ-বৃষ্টি না থাকলে পড়াশুনাটা চলে নিছক গাছের ছায়ায়। ছাত্র নয়, এবার শুধু ছাত্রী। ছাত্রীসংখ্যা খুব বেশি নয়। দশ-বারোটি। ছাত্রীসংখ্যা খুব বেশি না হওয়ার কারণও আছে। প্রাইমারী স্কুল খোলা হয়েছে সোনার-গাঁয়ে। সরকারী ব্যবস্থাপনায় কর্তৃপক্ষ ন্যায়রত্নকে শিক্ষকতা করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। পণ্ডিতই স্বীকৃত হননি। না, পরের চাকরি তিনি আর করবেন না। অধ্যাপনা তাঁর কৌলিক বৃত্তি। পূর্বপুরুষের বৃত্তিকে তিনি ত্যাগ করবেন না; কিন্তু চাকরি আর নয়। প্রাইমারী স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে অধিকাংশ মেয়েই আর পড়াশুনা করতে পারে না। আগেকার কালে অল্প বয়সে তাদের বিবাহ হয়ে যেত। কৈশোরে পা দিয়েই মা সরস্বতীর কাছে বিদায় নিয়ে সংসারের যাঁতাকলে পড়ে যেত। এখন মেয়েদের বিবাহের বয়স গড়পড়তা বেড়ে গেছে। অথচ ঐ প্রাইমারী স্কুল ছাড়া গ্রামে মেয়েদের শিক্ষার আর কোন ব্যবস্থা নেই। নিকটতম হাইস্কুল গ্রাম থেকে সাত মাইল দূরে। ছেলেরা অধিকাংশই সাইকেলে চেপে পড়তে যায়। মেয়েদের পক্ষে অতটা দূরে গিয়ে মা সরস্বতীর আরাধনা করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। তারা পণ্ডিতের স্কুলে পড়তে আসে।

স্কুল ঠিক এটাকে বলা চলে না। এখানে একটিমাত্র শ্রেণী এবং একজন মাত্র শিক্ষক। অথচ ছাত্রীরা বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন পর্যায়ের। তাই বলে পাঠশালাও একে বলা চলে না—কারণ, পাঠশালা আর প্রাইমারী স্কুলের গণ্ডি পার হয়েই এখানে মেয়েরা পড়তে আসে। পনের-ষোল বছরের মেয়েরাও আসে। খুকুও এসে বসে। এমনকি মিত্রদের একটি বিধবা বধূও এসে বসে। পণ্ডিতের অধ্যাপন-পদ্ধতিটাও বিচিত্র। ছাত্রীর অভিভাবককে তিনি প্রথমেই স্পষ্ট ভাষায় বলে দেন, কন্যাকে যদি স্কুল-ফাইনাল অথবা হায়ার-সেকেণ্ডারি পাশ করাবার ইচ্ছা থাকে, ভবিষ্যতে তাকে দিয়ে যদি উপার্জন করানোর বাসনা থাকে, তবে আমার এই নব্য চতুষ্পাঠীতে প্রেরণ করবেন না! স্কুলে ভর্তি করুন। আমি নিজ বুদ্ধি-বিবেচনামত এখানে পাঠক্রম রচনা করি। ইংরাজি, অঙ্ক, বাঙলা এবং সংস্কৃত শিখাই ; এ-ছাড়া আছে গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, শিশুমঙ্গল, প্রসূতি-পরিচর্যা। অল্প ইতিহাস, সামান্য ভূগোল এবং দর্শনের মূল সূত্রগুলি। সমাজবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সামান্য কিছু পরিচয়ও মৌখিক জানাই।

ছাত্রীর অভিভাবক হয়তো সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন, তা মাইনে-পত্র কী রকম?

—কপর্দকমাত্র নয়। ছাত্রীকে কিছু কাগজ-পেনসিল কিনে দেবেন। কোন পাঠ্যপুস্তক ক্রয় করার প্রয়োজন নাই। সে দায়িত্ব আমার। তবে ইচ্ছানুসারে আপনি এই নব্য চতুষ্পাঠীতে কিছু গ্রন্থ দান করতে পারেন, ভবিষ্যৎ ছাত্রীদের জন্য।

ব্যুৎপত্তিগত অর্থটা মেলে না, আভিধানিক অর্থেও অসঙ্গতি, তবু ন্যায়রত্ন কি জানি কেন এটাকে তাঁর নব-পর্যায়ের চতুষ্পাঠী বলেই মনে করেন। ছাত্রীর অভিভাবকের কাছে কিছুমাত্র চান না। কিন্তু ছাত্রীকে অত সহজে রেহাই দেন না তিনি, ছাত্রীকে একটি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর দিতে হয়। এমন কিছু ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নয়। যেমন ধরা যাক, প্রথম প্রতিজ্ঞা 'নিজ সন্তান ভিন্ন অন্ততঃ তিনটি নিরক্ষরকে বিনা পারিশ্রমিকে আমার জীবদ্দশায় সাক্ষর করাইয়া দিব।' কিম্বা 'দিনান্তে যে কোন অবস্থায় অন্ততঃ একবার কোন মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আত্মশুদ্ধি করিবার প্রয়াস পাইব' অথবা 'সজ্ঞানে মিথ্যার আশ্রয় লইব না।'

অবশ্য এ প্রতিজ্ঞা ছাত্রী বাকী জীবনে মেনে চলবে কিনা তা পণ্ডিত দেখতে যাবেন না। সেটা ছাত্রীর কথার উপর নির্ভর করবে। এই অদ্ভুত ব্যবস্থায় সকলেই অবাক হয়। গ্রামের মাতব্বর শ্রেণীর কেউ কেউ এসে পণ্ডিতকে সুপরামর্শ দিতে কার্পণ্য করেননি, ন্যায়রত্নমশাই, এতে আপনার চলবে কী করে? আপনি নগদও কিছু নিন না!

ন্যায়রত্ন বলেন, কী প্রয়োজন? আমার সংসারযাত্রা তো নির্বাহ হয়ে যাচ্ছে!

মাতব্বর বলেন, এ একটা কথা হল? আপনাকে পারিশ্রমিক কিছু নিতে হবে।

এবার পণ্ডিত হাত দুটি জোড় করে বলেন, ও অনুরোধ করবেন না! এতদিন বিদ্যা বিক্রয় করেছি, তাই আমার সাধনা নিষ্ফল হয়ে গেছে। এবার আমাকে একবার শেষ চেষ্টা করতে দিন। বিক্রয় নয়, বিদ্যা দান করব এবার। দেখি, তাতে কিছু ফলোদয় হয় কিনা!

—কিন্তু শুধু ছাত্রী কেন? ছাত্রও নিন তাহলে?

—না। পুরুষ মানুষকে ব্যবহারিক জীবনে উপার্জনক্ষম হতে হবে। সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে অবিদ্যার উপাসনা না করলে অর্থোপার্জন সম্ভবপর নয়। আমার উদ্দেশ্য অর্থ লাভ নয়, অমৃত লাভ—বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে। তাই আমার প্রচেষ্টা শুধু মাত্র ছাত্রীদের ভিতর সীমিত রাখতে ইচ্ছুক! এমনকি যে সকল ছাত্রী উপার্জনক্ষম হতে চায়, তাদের আমি গ্রহণ করি না! আমি শুধুমাত্র সেই সব ছাত্রীকেই আমার নব্য চতুষ্পাঠীতে স্থান দিতে চাই, যারা শুধু মা হবে, সংসার করবে, ভবিষ্যৎ জাতিকে গঠন করবে। বঙ্গদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকের উপর স্ত্রীলোক, এবং তার শতকরা নব্বুই ভাগের জীবন সংসারের অনড় প্রাচীরে সীমাবদ্ধ। আমাদের জীবন তো শেষ হয়ে গেল। আগামী যুগের বঙ্গবাসীর জীবন নিয়ন্ত্রণ করবে ঐ আগামী দিনের জননীরাই। আমার সাধনা শুধুমাত্র তাদের নিয়ে।

কেউ কেউ হয়তো তা সত্ত্বেও প্রশ্ন তোলে, কিন্তু আপনি একা এই দশ-বারোটি ছাত্রী নিয়ে জাতির ভবিষ্যতে কী অবদান রেখে যাবেন?

—কিছুই নয়। আমি শুধুমাত্র একটি আদর্শকে, একটি সৎ চিন্তাধারাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই!

—তার চেয়ে আপনার পরিকল্পনার কথা সরকারকে বলুন না—এখন তো জাতীয় সরকার। একটা আন্দোলন গড়ে তুলুন!

পণ্ডিত আবার হাত দুটি জোড় করে বলেন, ইচ্ছা হয় আপনারা সে আন্দোলন করুন! আন্দোলনে আমার আস্থা নেই। আমি প্রাচীনপন্থী। আপনাদের ঐ ঝাণ্ডা, শোভাযাত্রা, বক্তৃতা ইত্যাদিতেও আমি বিশ্বাসী নই। আমাকে নিজ গৃহকোণে শুধুমাত্র এই একটি আদর্শের প্রদীপ-শিখা জ্বালিয়ে রাখতে দিন আপনারা।

নব্যপন্থী হয়তো তা সত্ত্বেও প্রতিবাদ করে, কী বলছেন আপনি? আন্দোলন ছাড়া কোন ভাল কাজ হয়? এই ডেমোক্রেসির যুগে—

পণ্ডিত আবার হাত দুটি জোড় করে প্রতিবাদ করেন, পূর্বেই বলেছি, আমি প্রাচীনপন্থী। সাম্যে আমার আস্থা আছে—কিন্তু সীমিত ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, ধন বণ্টনের ক্ষেত্রে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমি সাম্যবাদী নই। জ্ঞানের রাজ্যে আমি গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে অনুমোদন করি না। জ্ঞান বিতরণের রাষ্ট্রিক ব্যবস্থাপনা কী হবে সে বিষয়ে সহস্র কণ্ঠের চীৎকারের অপেক্ষা একজন বিদ্যাসাগর, একজন স্যার গুরুদাস

অথবা একজন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বরকে আমি বড় বলে মনে করি।

অদ্ভুত যুক্তি বুদ্ধের!

খুকু এখন অনেক বড় হয়ে গেছে। না খুকু আর সে নয়। বেণী-দোলানো নয়-দশ বৎসরের মেয়েটিকে গ্রামের সকলে এখন 'সবিতা' নামে ডাকে। স্বর্গগতা পত্নীর খাতিরেই বোধকরি প্রশান্ত পণ্ডিত এই একটি ব্যাকরণের অশুদ্ধিকে স্বীকার করে নিয়েছেন জীবনে। স্বয়ং যুধিষ্ঠির যদি 'ইতি গজ'কে মেনে নিতে পারেন, তবে প্রশান্ত পণ্ডিতই বা কেন পারবেন না ওটুকু মেনে নিতে? সবিতাও পণ্ডিতের ঐ নব্য-চতুষ্পাঠীর ছাত্রী। কলকাতা থেকে পালিয়ে এসে ভালই করেছিলেন ন্যায়রত্ন—আর কিছু নয়, গ্রামের মুক্ত বাতাসে প্রাণ ভরে খুকু নিঃশ্বাস নিয়ে বেঁচেছে! সোনার-গাঁ-বাসী অত অকরুণ নয়। অত উদাসীন নয়। তারা এই মা-হারা মেয়েটিকে কাছে টেনে নিয়েছে। এ-বাড়ির বউ তার চুলের জট ছাড়িয়ে দেয়, ও-বাড়ির বউ তাকে রান্না শেখায়, সে-বাড়ির মেয়ে তাকে শাড়ি পরানো শেখায়। প্রাণচঞ্চল মেয়েটি সমস্তদিন এবাড়ি-ওবাড়ি, এপাড়া-ওপাড়া করে বেড়ায়। নুন দিয়ে কচি আম চাখ্‌তে চাখ্‌তে সে হিজল গাছের গায়ে ঠেশ দিয়ে কাঠবিড়ালিদের ছোটাছুটি দেখে, বাপের সঙ্গে হাতে-হাতে বাগানে কাজ করে, বাসন মেজে আনে পুকুর থেকে, ছোট ঘড়ায় করে জল ভরে আনে। ঘর-দোর রোজ ঝাঁট দেয়, মাঝে মাঝে বিছানার চাদর, বালিসের অ'ড়, জামা-কাপড় ক্ষার দিয়ে কাচতে বসে। কে বলবে ন-দশ বছরের মেয়ে! তার সবচেয়ে ভাল লাগে হিজলদীঘির জলে উবুড় করা কলসীটা বুকের তলায় নিয়ে চুপচাপ ভেসে থাকতে। দীঘিতে পুরুষ এবং নারীর পৃথক ঘাট। দীঘির জলে নুয়ে-পড়া একটা খেজুর গাছের ঝাঁকড়া মাথা থেকে ওড়-কলমী আর নালতে পাতার জঙ্গলে দুটো ঘাটের মাঝখানে চমৎকার একটা প্রাকৃতিক পর্দা তৈরি হয়েছে! মেয়েদের ঘাটটা ও-পাশ থেকে দেখা যায় না। গাঁয়ের মেয়ে-বউ নিশ্চিন্তে গা-খুলে স্নান করে, সাবান মাখে। সবিতা একটা পিতলের ঘড়া তার বুকের তলায় নিয়ে পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে অনেক গভীর জলে চলে যায়। কায়েত-গিন্নী হয়তো ধমক দিয়ে ওঠে,—ওরে অ পোড়ারমুখী, অত গহির জলে যাসনি মা, ঘাটে বেটাছেলেরা কেউ নেই, কলসী উল্টে গেলে ডুবে মরবি অ'নে!

সবিতা হাত-পা ছোঁড়া বন্ধ রেখে মুখের জলটা কুলকুচি করে ছিটিয়ে দেয়। তারপর কায়েত-গিন্নীকে ওখান থেকেই চীৎকার করে বলে, ঠাক্‌মা, উচ্চারণ তোমার নির্ভুল হয় নাই। ও শব্দটা গহির নয়, গভীর; গ পূর্বক ভী ধাতু র!

মিত্তির বাড়ির ন'বউ ঘাটে বসে পায়ে ঝামা ঘসছিল। সে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে ওঠে, বলে, মরণ! মেয়ের রঙ্গ দেখ, ঠিক পণ্ডিতমশার নকল করছে!

সবিতা অস্বীকার করে না, আবার হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে বলে, বাপকো বেটি, সিপাহি কি ঘোড়ি, কুছ্ নেহি তো থোড়ি থোড়ি !

মোটামুটি রান্না শিখে নিয়েছে। পণ্ডিতমশাইকে আর উবুড় হয়ে উনানের ধারে বসতে হয় না। সবিতাই এখন সে দায়িত্বটা নিয়েছে। বাড়িতে গরু আছে। গো-সেবার দায়িত্বটা খুকুর। দুধ দুয়ে আনে নিজের হাতে। দিন দু'আড়াই সের দুধ দেয়। জ্বাল দিয়ে কখনও ঘন করে, কখনও বা লেবু দিয়ে কাটিয়ে ছানা করে। ডাক্তারদা বলেছেন বাবাকে রোজ একটু করে ছানা দিতে। মাছ-মাংস তো উনি খাবেন না, ছানাটা তাই খাওয়া দরকার। দই জমানোর কায়দাটা ঘোষপিসির কাছ থেকে ভাল করে শিখে নিতে হবে। ঘোষপিসির হাতে দইটা অদ্ভুতভাবে জমে। সেটা ঘোষপিসির কোন বিশেষ জাতের দুধবলের জন্য, না ধমে-রাখার কায়দায়, অথবা কোন তুক্‌তাক, ঠিক জানে না সবিতা। তবে পটিয়ে-পাটিয়ে ঘোষপিসির কাছ থেকে কায়দাটা সে শিখে নেবে।

যতীনকাকুর দেওয়া সেই কাঠের পুতুলটাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কবে, কেমন করে যে সেটা হারিয়ে গেছে খুকু জানে না, যেমন জানে না কবে, কেমন করে সে ঐ পুতুল খেলার যুগটা পার হয়ে এল ! গোটা সংসারটাই যে এখন ওর পুতুলের সংসার ! কাঠের পুতুল দিয়ে আর কী হবে ? এখন সে যে রীতিমত একটা জ্যান্ত পুতুল পেয়েছে ! যতীনকাকুর দেওয়া সেই কাঠের পুতুলটার মতই এই জ্যান্ত পুতুলটা নিতান্ত অসহায়—খেতে দিলে খায়, শুইয়ে দিলে ঘুমায়। না, কাঠের পুতুলের মত চুপচাপ পড়ে থাকতে জানে না। খুকু লক্ষ্য করে দেখেছে, মধ্যরাত্রে ওর জ্যান্ত পুতুলটা চৌকির ওপর উঠে বসে আপন মনে বিড়বিড় করে কী যেন বকে যায়। তা হোক, মানুষটা পুতুলের মতই অসহায়—কপালের উপর চশমাটা তুলে সারা বাড়ি চশমা খুঁজে বেড়ায় ; খাবার সামনে ধরে দিয়ে এলেও খেতে ভুলে যায়। বসে থেকে খুকুকে দেখে নিতে হয়, বাবা খেল কি না !

অনেক অনেক দিন পরে বেদনার সমুদ্র মন্থন করে প্রশান্ত পণ্ডিত আজ এই জীবনের সায়াহ্নে অমৃতের সন্ধান পেয়েছেন। এইটুকুই চেয়েছিলেন তিনি। ছোট একটা ঘর, নিজের হাতে গড়া বাগান, কয়েকটি অনুসন্ধিৎসু ছাত্রছাত্রী পড়ুয়া আর তাঁর খুকুর নিরাপত্তা। ব্যস, আর কিছু নয়। সবই এখানে এসে পেয়েছেন। মন তাঁর কানায়-কানায় ভরে গেছে। এখানে এই মৃত পুরুষের ভিটাতেই যদি শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে পারেন, তবে আর কোন খেদ থাকবে না তাঁর। এই ভদ্রাসনেই একদিন তারক-ব্রহ্ম স্মরণ করেছিলেন গদাধর তর্করত্ন, পেয়েছিলেন সুদর্শন তর্কপঞ্চানন। এই তো তাঁর কাশী, এই তো তাঁর বৃন্দাবন। একটু দুঃখ হয় প্রতিভার জন্য। আহা, সে বেচারি এই পুণ্যি-পীঠের সন্ধান পেল না। না পাক, সে গেছে, বেশ গেছে,—না,

কোন অনুশোচনা রাখবেন না পণ্ডিত তাঁর মনের কোণে। শুধু শেষ-নিঃশ্বাস ফেলার আগে যদি ঐ মা-হারা একফোঁটা মেয়েটাকে কোন সুপাত্রের হাতে দিয়ে যেতে পারেন, তাহলে তাঁর আর কোন বাসনা অচরিতার্থ থাকবে না। কিন্তু তা কি হবে ?

প্রশান্ত ভট্টাচার্য নিতান্তই টুলো পণ্ডিত ; কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারা রীতিমত প্রগতিশীল। মুখে তিনি বলেন যে, তিনি প্রাচীনপন্থী —কিন্তু সেটা ঠিক নয়। তাঁর চরিত্রে এদিক থেকে অদ্ভুত একটা বৈপরীত্য আছে। তাতে অবশ্য বিস্মিত হবার কিছু নেই। মদনমোহন তর্কালংকার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরমশাইও তো টুলো পণ্ডিত ছিলেন। তাঁদের চরিত্রেও ঐ আপাত-বৈপরীত্য লক্ষ্য করা গেছে। প্রশান্ত পণ্ডিত বাল্য-বিবাহের বিরোধী। মা-মণির বিবাহের কথা তাই তিনি এখন চিন্তা করেন না। এই প্রগতিশীল চিন্তাধারা না থাকলে তিনি তাঁর পাঠক্রমের মধ্যে সমাজ-বিজ্ঞান অথবা রাষ্ট্রনীতিকে অন্তর্ভুক্ত করতেন না নিশ্চয়। তিনি বলতেন, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যোতির্বিজ্ঞানের মত এ দুটিকে বাদ দিয়ে গ্রামের মেয়েদের জীবন স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারত ; কিন্তু তোমাদের স্বাধীন ভারতবর্ষ যে আবার প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের দিয়েছে নির্বাচনের অধিকার !

মোট কথা পণ্ডিত এখন সুখী। না, ভুল হল ; —সুখী নয়, তিনি আনন্দময়।

কলকাতা শহরটাকে একদিন ত্যাগ করে এসেছিলেন ভারাক্রান্ত হৃদয়ে। একটা প্রচণ্ড বেদনাবোধকে অন্তরে বহন করেই যে সেদিন গ্রামের পথে রওনা হয়েছিলেন, একথা অনস্বীকার্য। বলা চলে, গ্রাম-বাঙলার আকর্ষণে নয়, নাগরিক-জীবনের বিকর্ষণেই কেন্দ্রাতীগ বেগে ঐ পাপচক্র থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছিলেন সেদিন। সে বেদনাও আত্মনেপদী ধাতুতে গড়া নয়, তাও পরস্মৈপদী। নিজের অপমানের জন্য ততটা বেদনাহত হননি, যতটা হয়েছিলেন তাঁর আন্তরিক প্রার্থনামন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায়। কী করেছেন এতদিন ? অতগুলি ছাত্রকে শুধু পরীক্ষা-সমুদ্রই পার করিয়েছেন—একটাও মানুষ গড়ে তুলতে পারেননি। সেদিন ক্লাসের একটা ছেলেও উঠে দাঁড়িয়ে বলেনি—পণ্ডিতমশাই আমাদের পিতৃস্থানীয়, তাঁকে নিয়ে এভাবে ব্যঙ্গ করা অশোভন, অনুচিত, পাপ। হেডমাস্টারমশাই, অক্ষয়বাবু, চন্দ্রবাবু—এঁরা সকলেই উচ্চ-শিক্ষিত, ভদ্র—এঁরা সকলেই জাতি-গঠনের পবিত্র দায় মাথা পেতে নিয়েছেন। পণ্ডিতের সমস্যাটাকে মানবিক বোধ দিয়ে কেউই দেখলেন না। সহানুভূতি নয়, সহৃদয়তা নয়,—শুধু ব্যঙ্গ করেই কর্তব্য শেষ করলেন !

তা হোক, তবু অন্তঃকরণে তিনি ওঁদের মার্জনা করে চলে এসেছিলেন।

মনে আছে, আলীপুর স্টেশনে মা-মণির হাত ধরে যেদিন ট্রেনে চেপে

বসেছিলেন, সেদিনটার কথা। গাড়ি যখন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে এল, তখন শহর কলকাতার উদ্দেশ্যে তিনি আন্তরিক প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন ঃ

যদিহ ঘোরং যদিহ ক্রূরং যদিহ পানং

তচ্ছান্তং তচ্ছিবং সর্বমেব শমস্তু নঃ !

বলেছিলেন, পৃথিবীর সমস্ত পাপ-তাপ, ক্লেশ-ক্লেদ, অন্যায়-অকল্যাণ নিঃশেষে বিদূরিত হয়ে যাক। জগতে অখণ্ড শান্তি, অবিমিশ্র কল্যাণ, এবং অমলিন আনন্দ চিরবিরাজ করুক !

ওঁ শান্তিঃ ! ওঁ শান্তিঃ ! ওঁ শান্তিঃ !

খুকু এসে খবর দিল, বাবা, ডাক্তারদা এসেছেন।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ গ্রন্থখানা সরিয়ে রেখে বৃদ্ধ ন্যায়রত্ন উঠে দাঁড়ান। খড়ম জোড়া পায়ে দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন দাওয়ায়। অন্ধকার থেকে আলোতে এসে চোখ দুটো একটু ধাঁধিয়ে যায়। চশমাটা কপালে তুলে দেখেন, ডাক্তার নবজীবন সান্যাল দাঁড়িয়ে আছে।

—এস, এস ডাক্তার ! বস—ওরে মা-মণি, তোর ডাক্তারদার জন্য একটা কাষ্ঠাসন দিয়ে যা !

—কাষ্ঠাসনের আবশ্যক নেই পণ্ডিতমশাই, আমি এই মাদুরেই বসছি।

—না না, ওতে তোমার অসুবিধে হবে। তোমার ঐ পোশাক এবম্প্রকার আসনের উপযুক্ত নয়, অথবা বলা যায় এ আসন ঐ বিজাতীয় পোশাকের উপযুক্ত নয়।

ডাক্তার জুতোর ফিতা খুলতে খুলতে হেসে বলে, পণ্ডিতমশাই আমি কিন্তু 'পাত্রাধার তৈল অথবা তৈলাধার পাত্র' এ সমস্যা সমাধানের জন্য আদৌ আসিনি !

হা-হা করে অট্টহাস্য করেন পণ্ডিত, ডাক্তারের কথাগুলো বেশ।

ইতিমধ্যে খুকু একটা বেতের মোড়া রেখে যায়। ডাক্তার জুতো খুলে দাওয়ায় উঠে আসে। পণ্ডিত মাদুরেই বসেছিলেন, ডাক্তার মোড়াটাকে একপাশে সরিয়ে মাদুরেরই অপর প্রান্তে এসে পা-মুড়ে বসে পড়ে। বলে, ডাক্তারখানা থেকে সোজা আসছি, তাই এই প্যাণ্ট-শার্ট—না হলে আপনার কাছে ভারতীয় পোশাক পরেই আসতাম।

পণ্ডিত বলেন, তাতে কী ? পোশাকটা লজ্জা নিবারণের জন্য, এবং সেটা বৃত্তি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়—বিশেষ, তোমাকে সাইকেলে চেপে গ্রামান্তরে যেতে হয়। ধুতি-পাঞ্জাবি সাইকেল-আরোহীর উপযুক্ত পোশাক নহে।

ডাক্তার বলে, আপনার এই মডার্ন আউটলুক আছে বলেই আপনাকে এত ভাল লাগে।

পণ্ডিত হেসে বলেন, কিন্তু এবার যে কথাটা বলব, সেটা তোমার ভাল লাগবে না।

—কী কথা ?

—বিদেশী পোশাকটাকে অনুমোদন করেছি আমি, কিন্তু তোমার বিদেশী শব্দ প্রয়োগটাকে আমি অনুমোদন করছি না। 'মডার্ন' আউটলুক' শব্দগুলির পরিবর্তে তুমি অনায়াসে 'আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি' বলতে পারতে!

ডাক্তার ঘাড় নেড়ে বলে, ঠিক কথা! বাঙলা বাক্যালাপে অহেতুক ইংরাজি শব্দের প্রয়োগ অবাঞ্ছনীয়। যাক, কাজের কথাটা প্রথমেই বলে নিই। আমার স্ত্রী অনন্ত চতুর্দশী ব্রত করেছেন। উদ্দেশ্যটা অত্যন্ত স্বার্থপরের মত; অর্থাৎ আমাকে হাত পুড়িয়ে বৃদ্ধ বয়সে রান্না করে খেতে হবে, অনেকটা এই আপনারই মত। তা সে যাই হোক, ব্রত অন্তে তিনি একজন সদ্-ব্রাহ্মণকে সেবা করতে চান। ব্রাহ্মণ-ভোজনের দায়িত্বটা অত্যন্ত গুরুতর, সেটি আপনাকে নিতে হবে—

পণ্ডিত হেসে বলেন, 'গুরু' বিশেষণটা কার গুণবাচক? দায়িত্বের, না ভোজনের?

ডাক্তার হেসে বলেন, সেটা আমার জানার কথা নয়। আমি দূত মাত্র। আমি ভেবে দেখলাম, এই সূত্রে একদিন আমার কোয়ার্টার্সে, মানে আবাসে, আপনার পদধূলি পড়তে পারে। এ গ্রামে আপনার চেয়ে নিষ্ঠাবান সদ্-ব্রাহ্মণ—

ন্যায়রত্ন দুহাতে নিজের কান চাপা দিয়ে বলেন, অমন কথা ব'ল না ডাক্তার! এখনও শিরোমণিমশাই, ন্যায়াধীশমশাই জীবিত। তাঁরা আমার শ্রদ্ধাস্পদ, বয়োজ্যেষ্ঠ, গুরুস্থানীয়—

ডাক্তার হাত দুটি জোড় করে বলে, অন্য কেউ হলে তর্ক করতাম না; কিন্তু আপনার 'আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি'র কথা জানা থাকায় একটু তর্ক করব। আপনি মীমাংসা করে আমার ভ্রম প্রতিপন্ন করুন।

পণ্ডিত হেসে বলেন, কর তর্ক!

—আমার বক্তব্য—আমি অথবা আমার স্ত্রী কাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলে মনে করি, এটা আমাদের দুজনের ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার। সে বিচারে আপনার মতামত বাহুল্য। বাসুদেবের দাদা ছিলেন বলরাম, গুরুও ছিলেন সন্দীপন পাঠশালার গুরুমশাই। আপনি তাহলে বাসুদেবের উপাসনা করেন কেন? তাঁর শ্রদ্ধাস্পদ গুরুস্থানীয়দের ছেড়ে?

পণ্ডিত স্মিত হেসে বলেন, তোমাকেও একটা উপাধি দান করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ডাক্তার নবজীবন তর্কচঞ্চু! বেশ, কী বলছিলে বল!

—আপনি জানেন আমরা নৈকষ্যকুলীন। আমার স্ত্রী নিরামিষ আহার করেন; প্রত্যহ জপ-আহ্নিকও করে থাকেন। তিনি মন্ত্রদীক্ষাও নিয়েছেন। এখন বলুন, আপনার জন্য কি স্বপাক আয়োজন করতে হবে?

—না না না! এ কী কথা? তোমার স্ত্রী আমার মায়ের মত। তাঁর স্বহস্তে পাক করা অন্নগ্রহণে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই।

—মাছ, মাংস, পেঁয়াজ, রসুন আপনি খান না জানি। আমাদের বাড়িতে ওসব আসেও না। আমার স্ত্রীও ওসব খান না। আর কোন বাধা-নিষেধ আছে?

—আম আমি ইষ্টদেবতাকে সমর্পণ করেছি। ওটা বাদ।

—উত্তম! উত্তম!

ডাক্তার উঠে পড়েছিলেন, হঠাৎ কী ভেবে বলেন, একটা কথা পণ্ডিতমশাই। দীর্ঘ দিন পূর্বে আপনি কী জন্য গ্রাম ত্যাগ করে গিয়েছিলেন; তা আমি শুনেছি। কিন্তু আপনি আবার গ্রামে ফিরে এসেছিলেন কেন, সেটা আমি জানি না।

পণ্ডিত ম্লান হেসে বলেন, কলিকাতা আমার সহ্য হল না ডাক্তার! একদিন তোমাকে সবিস্তারে সমস্ত ঘটনা বলব। আমাদের দিন তো সমাপ্ত হয়ে এল, দেখ, তোমরা যদি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিটা কিছু পরিবর্তন করতে পার! আমি কলকাতা ত্যাগ করেছিলাম অত্যন্ত রূঢ় আঘাতে, নিদারুণ অপমান এবং দৈহিক পীড়ন সহ্য করে—

—দৈহিক পীড়ন?

—হ্যাঁ ডাক্তার! মুষ্ট্যাঘাতে আমার একটি দন্ত স্বস্থানচ্যুত হয়েছিল, আমার শিখা সমূলে উৎপাটিত হয়েছিল—

ডাক্তার অনেকক্ষণ কোন জবাব দেয় না, তারপর বলে, কী হয়েছিল বলুন তো?

—আজ নয় ডাক্তার। অন্য একদিন বলব।

—আপনি কি তাদের ক্ষমা করে এসেছিলেন?

—হ্যাঁ, সর্বান্তঃকরণে।

আবার কিছুটা চুপচাপ।

পণ্ডিতই আবার বলেন, দেখ ডাক্তার, প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে তার ব্যক্তিগত সমস্যা আসে, আমরা আমাদের পূর্বনির্ধারিত সামাজিক বোধের সংস্কারে তার যথোচিত বিচার করি না, বা ভ্রান্তিপূর্ণ বিচার করি। চোর কেন চৌর্যকার্যে প্রবৃত্ত হয়, নারী কেন পতিতাবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য হন, তা আমরা বিচার করতে চাই না। তস্কর এবং পতিতাকে ঘৃণা করি, তার শাস্তি-বিধানের ব্যবস্থা করেই আমরা সামাজিক কর্তব্য সমাপন করি। আমার জীবনে আমি একটি ভ্রষ্টা বন্ধ্যা রমণীকে জেনেছিলাম—কিন্তু তাঁকে তো কই ঘৃণা করতে পারি নাই? সমাজে সে অবহেলিতা, তবু তার অন্তরাত্মার ক্রন্দন আমি আমার অন্তরে অনুভব করেছিলাম। যা আমরা চর্মচক্ষে দেখি, শুধু সেইটুকুই সত্য নয়, সত্য তদপেক্ষা ব্যাপক, তদপেক্ষা বৃহৎ—এবং সেই সত্যের জয় অবধারিত।

ডাক্তার বলে, কিন্তু মনে হচ্ছে, আপনার ক্ষেত্রে অসত্যেরই জয় হয়েছিল?

—না। আমি সাময়িকভাবে আহত হয়েছিলাম। সত্য সূর্যের মত, মেঘালোকে সে সাময়িকভাবে আচ্ছাদিত হলেও তার মেঘমুক্তি অনস্বীকার্য।

ডাক্তার বলে, অর্থাৎ আপনি বিশ্বাস করেন, 'সত্যমেব জয়তে'।

পণ্ডিত মৃদু হাসলেন।

এ হাসিকে ডাক্তার চেনে। বলে, মনে হচ্ছে আপনার কিছু আপত্তি আছে?

—তা আছে।

—বলেন কী? ঐ 'সত্যমেব জয়তে' উদ্ধৃতিটায়?

—ঠিক তাই।

—এটা কিন্তু আমাদের জাতীয় সরকারের প্রতীক বাণী!

—আমি জ্ঞাত আছি।

—আপনার আপত্তিটা কোথায়?

—আপত্তিটা বৈয়াকরণিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। ঐ উদ্ধৃতিটা একটি শ্লোকের একটি চরণের ভগ্নাংশ। পূর্ণ চরণটা হচ্ছে 'সত্যমেব জয়তি নানৃতম্' অথবা পাঠান্তরে 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্'। আমার প্রথম আপত্তি, এই দ্বিবিধ পাঠের ভিতর আত্মনেপদী রূপটি চয়নে। 'সত্য' স্বীয় মহিমায় জয়যুক্ত হয় এই কথার ভিতর কি লুক্কাইত আছে একটি মনোভাব—'সুতরাং সত্যকে জয়যুক্ত করায় আমাদের সচেষ্ট হইতে হইবে না'? 'জয়তি' পাঠে এ ভ্রান্তির অবকাশ নাই। দ্বিতীয়তঃ 'নানৃতম্' শব্দটিকে ত্যাগ করা হল কোন্ মনোভাব থেকে? 'অসত্য' যে জয়যুক্ত হতে পারে না, একথাটা স্বীকার করায় দ্বিধা কোথায়? নাকি ওটা অনুক্ত আছে শুধুমাত্র অনুচ্চকণ্ঠে ইতি-গজর মত বলতে 'অনৃতমেব'?

ডাক্তার উঠে পড়ে বলে, এবার আমার স্থানত্যাগ করাই বোধহয় ভাল!

পণ্ডিত হাসলেন। ডাক্তার বিদায় নিয়ে চলে গেল।

এই ডাক্তার নবজীবন সান্যালকে সত্যই স্নেহ করেন পণ্ডিত। অল্পদিন হল সে এ গ্রামে এসেছে। সরকারী গ্রাম্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক হয়ে। বছর ত্রিশ বয়স। প্রাণোচ্ছল যুবক। অটুট স্বাস্থ্য, আর সবচেয়ে বড় কথা—মনটা উদার। গ্রামের সকলেরই সে প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে অল্প কয়েক মাসে। পাশ করে বের হবার পরে এই তার প্রথম চাকরি। বছরকয়েক হল বিবাহ করেছে। একটি পুত্র-সন্তানও নাকি হয়েছে তার। পণ্ডিত ওদের বাড়িতে কোনদিন যাননি! সরকারী ডাক্তারখানা থেকে মা-মণির জন্য ঔষধ আনতে গিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর আলাপ। ডাক্তার অবশ্য অনেকবারই এসেছে তাঁর ভিটায়।

পরদিন আহ্নিক সেরে ছাতা মাথায় দিয়ে সকাল সকালই হাজির হলেন

ডাক্তারের সরকারী আবাসে। তিন-কামরার পাকা বাড়ি। হাসপাতাল সংলগ্ন। ডাক্তার ওকে আপ্যায়ন করে বসায়। ইলেকট্রিক নেই, একটা হাতপাখা এনে বাতাস করবার উপক্রম করতেই পণ্ডিত বলেন, পাখাটা আমাকে দাও, না হলে বড় অস্বস্তি হয় আমার।

ডাক্তার প্রতিবাদ করে, তাই কি হয়? আমার অতিথি-ধর্মের ব্যত্যয় হবে তাহলে।

পণ্ডিত মাথা নেড়ে বলেন, উঁহু। বাক্য-প্রয়োগটা তোমার নির্ভুল হয় নাই তর্কচঞ্চু। অত্ ধাতু ইথি (তৃ) অতিথি। তুমি অতিথি-ধর্ম পালন করছ না, করছ আতিথ্যধর্ম; আতিথেয়তা। অতিথি ত্রয় বিশেষ্যে 'তা'। সুতরাং ভ্রমাত্মক শব্দ প্রয়োগের শাস্তিস্বরূপ পাখা আমাকে সমর্পণ কর।

শব্দের ভুল প্রয়োগ যে পণ্ডিতমশাই সহ্য করেন না, একথা জানা ছিল ডাক্তারের। শাস্তি সে মাথা পেতে নেয়, পাখাটা পণ্ডিতের হাতে দেয়।

একটু পরেই চাকর এসে খবর দিয়ে যায়, ভিতরে ঠাঁই করা হয়েছে।

হস্তপদাদি প্রক্ষালন করে পণ্ডিত এসে বসলেন একটি ফুলকাটা পশমের আসনে। পাশেই একটি পাথরের গ্লাসে একটি পাথরের ঢাকা। সম্ভবত পানীয় জল আছে তাতে। আসনের সম্মুখস্থ স্থানটুকুতে জল ছিটানোই ছিল। ডাক্তারের স্ত্রী এসে নতজানু হয়ে পণ্ডিতের পদধূলি নিলেন গলায় আঁচল দিয়ে। পণ্ডিত অস্ফুটে বললেন, কল্যাণমস্তু।

তারপর স্বহস্তে অন্নব্যঞ্জনের পাত্রটি নিয়ে এসে ব্রাহ্মণের সম্মুখে রাখলেন। পণ্ডিত ডাক্তারকে বলেন, তুমি বসবে না?

—না পণ্ডিতমশাই, আমাকে আবার একবার হাসপাতালে যেতে হবে। তারপর ফিরে এসে স্নান করে খাব।

—ও!

পঞ্চ-দেবতাকে নিবেদন করে ব্রাহ্মণ আহারে মনোনিবেশ করেন।

একটু পরে ডাক্তার বলে, রান্নাবান্না কেমন হয়েছে?

পণ্ডিত জবাব দিলেন না, মৃদু হাসলেন।

ডাক্তার-গিন্নি একটা হাতপাখা নিয়ে পাশেই বসেছিলেন। কোন সংকোচ না করে স্বামীকে স্পষ্টই বলেন, ওঁকে বিরক্ত ক'র না। খেতে বসে উনি কথা বলেন না, বুঝতে পারছ না?

—ও! আয়াম সরি! মানে, দুঃখিত! আমি বরং এই ফাঁকে একবার হাসপাতালে ঘুরে আসি! উনি যখন কথা বলবেন না, তখন অহেতুক সঙের মত দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে?

পণ্ডিত হেসে সায় দিলেন।

প্রশ্ন না করেও পণ্ডিতমশায়ের আহারকার্য লক্ষ্য করে মেয়েটি একে একে খাদ্যদ্রব্য যোগান দিতে থাকে। পণ্ডিত যখন নিতান্ত ব্যাঘ্রঝম্পনে বাধা দিতে

শুরু করলেন, তখন মেয়েটি বললে, না পারেন পাতে থাক না! আপনার প্রসাদ তো আমিও খাব, সবিতাও খাবে।

তবু হাতের বাঁধন মুক্ত করলেন না প্রশান্ত পণ্ডিত।

—অন্ততঃ ক্ষীরটুকু ফেলে রাখবেন না! আর মিষ্টান্ন সমস্ত আমার নিজে হাতে করা—

পণ্ডিত তৃপ্তির হাসি হাসলেন শুধু।

আহারান্তে মুখ প্রক্ষালন করে পণ্ডিত একটা ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ারে এসে বসলেন। পাথরের রেকাবিতে করে কয়েক টুকরা হরিতকী এনে ডাক্তারের স্ত্রী বলেন, উনি যখন এ গ্রামে চাকরি পেয়ে এলেন তখনও আমি জানতাম না, এটা আপনার গ্রাম; অথবা আপনি এখানে থাকেন! তারপর ওঁর মুখে আপনার নাম শুনে বুঝতে পারলাম।

পণ্ডিত একটু অবাক হয়ে এতক্ষণে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেন। এ পর্যন্ত তার পায়ের দিকে নজর রেখেই কথাবার্তা বলেছেন। স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী মেয়েটির বয়স কত হবে? বছর পঁচিশ। কোলে একটি শিশু, মাথায় আধো-ঘোমটা, কপালে একটি সিঁদুরের টিপ।

পণ্ডিত বলেন, আমি কি তোমার পূর্ব-পরিচিত, মা?

মেয়েটি মাথা নিচু করে বললে, আমি শান্তি।

শান্তি? কোন শান্তি? ন্যায়রত্নমশাই সমস্ত অতীত জীবনটা তোলপাড় করেও কোন শান্তিনাম্নীর কথা স্মরণ করতে পারলেন না। এমনিতে স্মৃতি-শক্তি তাঁর অত্যন্ত প্রখর, কিন্তু মানুষের নাম তাঁর মনে থাকে না, বিশেষ স্ত্রী-জাতীয় লোকের নাম। স্বীকার করলেন সেকথা, বললেন, আমি তো মা তোমাকে ঠিক সনাক্ত করতে পারলাম না—

—বর্ধমান জেলায় চণ্ডীগড়ে আমাদের বাড়ি। দেবপুর স্টেশনে নেমে যেতে হয়। আমার বাবার নাম শ্রীকৃষ্ণসহায় বাগচি।

অবাক বিস্ময়ে পণ্ডিত অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন মেয়েটির দিকে। তাঁর বিস্ময় ক্রমে রূপান্তরিত হয় অপরূপ মাধুর্যরসে। অমলিন হাস্যরেখা ফুটে ওঠে তাঁর ওষ্ঠাধরে। হাত দুটি যুক্ত করে তিনি কাকে যেন প্রণাম করলেন।

শান্তি বলে, একথা কিন্তু উনি জানেন না।

—কোন কথা? ও! বুঝেছি, কিন্তু কেন? তাকে বলনি কেন, মা?

শান্তি জবাব দেয় না। মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টিতে চুপ করে অপেক্ষা করে।

পণ্ডিত হঠাৎ হো হো করে অট্টহাস্যে ফেটে পড়েন। বলেন, কেন? তোমার কি আশঙ্কা হয়েছে যে, আমার পরিচয় পেলে সে আমাকে দ্বৈরথ-সমরে আহ্বান করবে?

শান্তিও হেসে ফেলে, বলে, তা নয়, তবে আপনার কথা ভেবেই—

—দূর পাগলি! তুই আমার মেয়ের মত। দেখ্ দেখি কাণ্ড। কী হিমালয়ান্তিক ভ্রান্তির মধ্যেই পড়েছিলাম! ঈশ্বর মঙ্গলময়—তাই না আজ তোর সব হয়েছে! ঘর, বর, সন্তান! বাঃ বাঃ! ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া! ব্রহ্মকে লাভ করবার পথও যেরূপ ক্ষুরধার, তাঁর সৃষ্টি-রহস্যের মর্মোদ্ধারের পথও তেমনি ক্ষুরধার। কোন্ প্রচণ্ড অশনি আঘাতের পথে তাঁর আশীর্বাদ নেমে আসবে আমরা কিছুই বুঝি না!

বৃদ্ধের চোখে জল এসে গিয়েছিল। চশমাটা চোখ থেকে খুলে পাঞ্জাবির হাতায় চোখ দুটি মুছে নেন।

শান্তি গলায় আঁচল দিয়ে আবার প্রণাম করল তাঁকে। প্রাণভরে তাকে আশীর্বাদ করলেন পণ্ডিত। মনটা কানায়-কানায় ভরে গেছে তাঁর। বাড়ি ফেরার পথে বারে বারে মনে মনে প্রণাম করেছেন সেই অজ্ঞাত শক্তিকে। 'ন বিদ্ম ন বিজানীমো,' তাঁকে জানি না, তাঁর কথা কেমন করে জানতে হবে তাও জানি না। তবে এটুকু জানি যে, তিনি আছেন। তমসার ওপারে তাঁর অস্তিত্ব মর্মে-মর্মে অনুভব করেছেন বৈদিক ঋষির দল। নিজ মহিমা তিনি হিরণ্ময় পাত্র দিয়ে আবৃত করে রেখেছেন। তা হোক, তবু পণ্ডিতের কাতর আহ্বান তিনি শুনেছেন। 'ব্যূহ রশ্মিন্ সমূহ তেজঃ। যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি!' হে পূষণ! হে সূর্য! তোমার চোখ-ঝলসানো তেজরশ্মি অনাবৃত কর, তোমার কল্যাণময় স্বরূপ আমাকে উপলব্ধি করতে দাও, অনুভব করতে দাও!

এই তো তাঁর কল্যাণময় স্বরূপের প্রকাশ! চণ্ডীগড় গ্রামের অজ্ঞাত যুবক দলের হাতে বজ্র-বিদ্যুৎ দেখা দিয়েছিল বলেই না পর্জন্যদেব এমন করুণাবারি সিঞ্চন করতে পেরেছেন ঐ তরুণী মেয়েটির মাথায়! আর তাই না আজ সে ভাদ্রের ভরা গঙ্গার মত কানায়-কানায় ভরে উঠেছে!

বাঃ বাঃ! চমৎকার! বাসুদেব, তুমিই সত্য!

দিনসাতেক পরে সকালবেলায় লাউমাচাটা ঠিক করে কঞ্চি দিয়ে বেঁধে দিচ্ছিলেন পণ্ডিত; খুকু এসে খবর দিল, বাবা, তোমার সঙ্গে কয়েকজন দেখা করতে এসেছেন!

নারকেল-কাতা আর কাটারিখানা সরিয়ে রেখে নগ্নগাত্রেই পণ্ডিত এগিয়ে আসেন তাঁর দাওয়ার দিকে। খুকু ইতিমধ্যেই একটি মাদুর বিছিয়ে আগন্তুক-দের বসতে দিয়েছে, খানকতক হাতপাখা রেখে গেছে। অপরিচিত কেউ নন—সকলেই ন্যায়রত্নের পরিচিত। তিনজনেই গ্রামের মাতব্বর শ্রেণীর লোক, সমাজের মাথা। অর্থাৎ টাকা-পয়সাওয়ালা লোক। নরেশ দত্তের যথেষ্ট খাস জমি আছে; কিন্তু তাঁর উপার্জনের বড়-গঙ্গা তেজারতির খাতে। শুধু সোনার-গাঁ নয়, আশপাশের অনেকগুলি গ্রামে তাঁর তেজারতি কারবারের

খেপ্‌লা জাল পড়ে। বড় বড় রুই-কাতলারও সে জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবার উপায় থাকে না। এর জমি, ওর জল-কর, তার ভদ্রাসন ওঁর লাল-লাল খেড়োখাতায় নানান জাতের তমশুকসূত্রে বাঁধা পড়ে। নরেশ দত্ত সুতরাং গ্রামের একজন নমস্য ব্যক্তি!

দ্বিতীয়তঃ এসেছেন বৃদ্ধ ললিত চাটুজ্জেমশাই। ইনিও স্বনামখ্যাত। পূর্বাশ্রমে কলকাতায় সরকারী দপ্তরে উচ্চপদেই কাজ করতেন। উদ্বাস্তু-পুনর্বাসন বিভাগে। জনশ্রুতি, কী একটা তহবিল তছরূপ, না জাল ঋণপত্রের মামলায় তাঁর চাকরিটি যায়। বেশ কিছুদিন থানা-পুলিশ-কোর্ট-কাছারি করতে হয়েছে। আত্মসম্মান রক্ষার জন্যই মামলা লড়তে হয়েছে নাকি। সে সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে তাঁকে সর্বস্বান্ত হতে হয়েছিল। শোনা যায়, দীর্ঘ পাঁচ বছর মামলা চালিয়ে যখন তিনি একেবারে কপর্দকহীন, তখন হাকিম রায় দিয়ে বলেছিলেন—ললিত চাটুজ্জে বেকসুর খালাস! অনারেবলি এ্যাকুইটেড! মনের দুঃখে ললিত চাটুজ্জে কাঠগড়া থেকে নেমে সোজা হিমালয়ে তপস্যা করতে চলে যান। তারপর হিমালয়েই কোন এক মহাপুরুষ তাঁকে প্রত্যাদেশ করেন স্বগ্রামে ফিরে আসতে। ধুলো মুঠি তিনি সোনা মুঠি করতে পারতেন। তা সেই সোনামুঠি কিছু নিয়েই ললিত চাটুজ্জে আবার ফিরে আসেন সংসারাশ্রমে। বর্তমানে তিনি বেশ জাঁকিয়ে বসেছেন গ্রাম্যসমাজে। নূতন দালান তুলেছেন, জমি কিনেছেন, একটা গম-ভাঙানোর কলও করেছেন। সবই মহাপুরুষের আশীর্বাদ-ধন্য। কু-লোকে অবশ্য বলে থাকে—ও হিমালয়-টিমালয় কিছু নয়—চাটুজ্জেমশাই একবছর ঘানি টেনেছেন, এবং তাঁর অর্থের উৎসমূলে আছে ঐ তহবিল-তছরূপের ব্যাপারটা। তা সে যাই হোক, চাটুজ্জেমশাই বর্তমানে গ্রামের একটি মাথা।

আর এসেছে ভবেন চক্রবর্তী। এরই উপনয়নের প্রাক্কালে পণ্ডিত গ্রাম ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন প্রায় বিশ-পঁচিশ বছর পূর্বে।

পণ্ডিতকে নগ্নগাত্রে এগিয়ে আসতে দেখে ললিত চাটুজ্জেমশাই সাদর আহ্বান জানান, আসুন আসুন, ন্যায়রত্নমশাই। এই সাত-সকালেই আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি!

পণ্ডিত আসন গ্রহণ করে বলেন, বিলক্ষণ! বিরক্ত কিসের? বলুন, কী ব্যাপার?

—আপনার শরীর গতিক কেমন আছে বলুন?

পণ্ডিত হাস্যমুখে বলেন, না, আমার কোন অনুপপত্তি নাই।

তিনজনের কেউই অবশ্য এ রসিকতার মর্মোদ্ধার করতে পারেন না। বুনো রামনাথের জীবনী এঁরা কেউই পড়েননি।

ভবেন চক্রবর্তী বলেন, সরাসরি কাজের কথায় আসা যাক পণ্ডিতমশাই। আমরা তিনজন আজ আপনার দ্বারে প্রার্থী।

হাত দুটি জোড় করে সে।

পণ্ডিত হাস্যমুখে বলেন, বামনের দ্বারে বলিরাজা প্রার্থী ?

ললিত চাটুজ্জেমশাই হাজার হোক ব্রাহ্মণ। মহাকাব্যগুলি পড়া আছে তাঁর। তাই জবাবে বেশ বাগিয়ে নিয়ে বলেন, বিষয়টা যে সাত্ত্বিক। তাই সাত্ত্বিক বামনের দ্বারে আজ রাজসিক বলিরাজা এসেছেন। তামসিক আমরা দুজন সঙ্গীমাত্র। কী বল হে নরেশ ?

পণ্ডিত গম্ভীরভাবে বলেন, অবতরণিকা তো হল, এক্ষণে মূল বক্তব্যটা শুনি !

ভবেন ইতস্ততঃ করছে দেখে ললিত চাটুজ্জেই বলেন, ভবেনের ইচ্ছা তার স্বর্গত পিতৃদেবের নামে গাঁয়ে একটা মেয়েদের স্কুল খুলবে। গ্রামে মেয়েদের কোন স্কুল নেই ;—কিন্তু শিবহীন যজ্ঞ তো হতে পারে না, তাই আপনার দ্বারেই সর্বাগ্রে এসেছে। একা আসতে ওর সাহস হচ্ছিল না, তাই আমাদের দুজনকে জুটিয়ে এনেছে।

পণ্ডিত বলেন, কেন ? ভবানন্দের একাকী আসতেই বা আতঙ্কের কী কারণ থাকতে পারে ?

—যাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে ইস্কুলটা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তিনি আপনার সঙ্গে ঠিক সদ্ব্যবহার করেননি ; তাই ও কুণ্ঠিত হচ্ছিল—

পণ্ডিত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, আপনি ভ্রমাত্মক উক্তি করলেন ; কার স্মৃতিরক্ষার্থে প্রতিষ্ঠানটি তৈরি হতে চলেছে এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নাই—নিঃসংশয়ে এ কার্য সমর্থনযোগ্য। ভবেন যদি স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে মনোনিবেশ করতে ইচ্ছুক হয়, তবে তাকে আমি সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করছি। শুধু আশীর্বাদ নয়, সে আমার সক্রিয় সহানুভূতিও পাবে।

ললিত চাটুজ্জে উৎসাহের আতিশয্যে দত্তজার জানুতে প্রচণ্ড একটা চপেটাঘাত করে বসেন। নরেশ দত্ত প্রায় লাফিয়ে ওঠে। চাটুজ্জে বলেন, এ্যা—এ্যাই ! আমি তোমায় তখনই বলেছিলাম না ভবেন ? ন্যায়রত্নমশাই হচ্ছেন খাঁটি বামুন। উনি ঐসব ছেঁড়াছেঁড়ি, খেয়োখেয়ির মধ্যে নেই ! শাস্ত্রেই বলেছে না—'আনন্দং ব্রাহ্মনো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচনঃ !' অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ সত্যিকারের বিদ্বান-তাঁকে দেখে আনন্দ কর, তাঁকে অত ভয় করার কিছু নেই ! তুমি তো ভয়ে আসতেই চাইছিলে না !

বলেই নরেশভায়ার সদ্য-উন্মুখ নস্যদানী থেকে খপ্ করে এক খাবলা নস্য তুলে নেন।

পণ্ডিত হেসে বলেন, বড় সুন্দর ব্যাখ্যা করলেন তো ? এ ব্যাখ্যা কোথায় পেয়েছেন ? শাঙ্করভাষ্য, না দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থের ?

ললিত চাটুজ্জে নস্যের টিপটা সবেমাত্র নাসারন্ধ্রে চালাতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ থেমে পড়ে বলেন, কেন বলুন তো ? কিছু ভুল বললাম নাকি ?

—না, তেমন কিছু নয়। শ্লোকটার অর্থ, মানে আমি যা প্রণিধান করেছি—তা হচ্ছে, 'আনন্দকে যিনি জেনেছেন তিনি কখনও ভীত হন না।'

—ও তো একই কথা! এতক্ষণে সশব্দে নাসারন্ধ্রে পাচার করে দেন।

ভবেন এসব শাস্ত্র আলোচনায় মজা পাচ্ছিল না; তবু খুশি হয়েছে সে। পাষণ্ড-পণ্ডিতটাকে যে এত সহজেই কাবু করা যাবে, সেটা সে আন্দাজ করেনি।

উৎসাহের আতিশয্যে সে সিল্কের পাঞ্জাবির পাশ পকেট থেকে সিগারেট এবং দেশলাই বার করে। কিন্তু নরেশ দত্তের একটা মর্মান্তিক শিরশ্চালনে হঠাৎ খেয়াল হয় তার। থাক, দরকার নেই! শেষকালে সিগারেট খেতে দেখলে বুড়োটা না আবার বিগড়ে যায়! ধূমপানের অনুপানগুলো আবার পাঞ্জাবির পকেটেই পাচার করে। বেশ বিনীতভাবে বলে, ইস্কুলটা আমরা অবিলম্বেই খুলতে চাই, পণ্ডিতমশাই! আপাতত ক্লাস ফোর আর ফাইভ। ললিতকাকা ইংরাজি পড়াবেন ঠিক হয়েছে! নরেশদা ম্যাথমেটিক্স আর জিওগ্রাফী। এখন আপনি যদি ভার্ণাকুলার আর স্যাংস্কৃটটা—

—'ভার্ণাকুলার আর স্যাংস্কৃট' কেন বাবা? আমরা কেউই তো এখানে সাহেব নই! ও দুটো আপাতত বাঙলা আর সংস্কৃতই থাক না!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তাই থাক! তা ঐ বাঙলা আর সংস্কৃতটা যদি আপনি পড়ান—

—বিদ্যায়তনের গৃহ—

—আজ্ঞে আমি আমাদের কাছারি-ঘরের খানতিনেক ঘর ছেড়ে দিচ্ছি। জমিদারী যাবার পর থেকে আমলা-গোমস্তা-সেরেস্তাদারদের তো সব বিদায় দিয়েছি। ঘরগুলোয় এখন থাকে শুধু চামচিকা।

—বিদ্যায়তনের প্রধান শিক্ষক কে হবেন?

ললিত চাটুজ্জে এবার আগ বাড়িয়ে বলেন, সেই দায় উদ্ধারটা আপনাকে করে দিতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি, নরেশভায়া কলেজে কোনদিন পড়েনি। তবে অঙ্কটা ও ভালই জানে। আমিও ইংরাজিটা মোটামুটি জানি। কিন্তু শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা আমাদের কারও নেই। আপনি এই নিয়েই জীবন কাটিয়েছেন! আপনিই প্রধান শিক্ষক হবেন। তবে হ্যাঁ, প্রথম প্রথম কয়েক মাস আপনাকে কিছু বিবেচনা করতে হবে।

—বিবেচনার অর্থ?

—আজ্ঞে ঐ অর্থ বিষয়েই বিবেচনা! মানে, আপনাকে পুরো মর্যাদা প্রথমটায় ভবেন দিতে পারবে না! আপাতত মাসে পঞ্চাশটি মুদ্রা প্রণামী দেবে। আপনাকে কিন্তু কিছু বেশি টাকার রসিদে সই করে দিতে হবে।

পণ্ডিত অবাক হয়ে বলেন, সেকি? এমন কাণ্ড করার অর্থ?

—আজ্ঞে অর্থ নয়, অনর্থ! এখন সরকার আইন করেছেন শিক্ষকদের একটা ন্যূনতম বেতন দিতে হবে। না হলে এ্যাফিলিয়েশনের জন্য দরখাস্ত

গ্রাহ্য হবে না। সরকারী সাহায্যও পাওয়া যাবে না। কিন্তু ভবেনের আর্থিক সঙ্গতি এখন এমন নয় যে আমাদের তিনজনকেই সে পুরো মর্যাদা দিতে পারে!

—আপনারা দুইজনও কি ঐভাবে মাহিনা গ্রহণ করবেন?

—উপায় কী, বলুন?

—উপায় আছে। দেখুন, বিদ্যায়তন একটি পবিত্র স্থান; তার মূলেই এভাবে তঞ্চকতা থাকতে পারে না। তাহলে বিদ্যাদান আমাদের ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমি বরং বিকল্প প্রস্তাব রখছি,—আমি অবৈতনিক প্রধান শিক্ষক হিসাবে কর্মভার গ্রহণে স্বীকৃত; কিন্তু অন্যান্য সকলকে সরকার-নির্ধারিত ন্যূনতম বেতন দিতে হবে।

—কী দরকার ন্যায়রত্নমশাই, আমরা তো আধা-মাহিনা নিতেই রাজী আছি!

—কিন্তু প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক হিসেবে আমি যে তা প্রদান করতে স্বীকৃত নই!

নরেশবাবু এবং ললিত চাটুজ্জে দৃষ্টি-বিনিময় করেন। এ আবার কী নতুন বখেড়া!

পণ্ডিত আবার বলেন, তা ভিন্ন এত দ্রুততারই বা কী প্রয়োজন? আসুন না, আমরা সর্বপ্রথমে গ্রামে গ্রামে গিয়ে কিছু মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করি!

ললিত চাটুজ্জে বলেন, তাতে দুটো অসুবিধে আছে, পণ্ডিতমশাই। প্রথমতঃ পাঁচজনের কাছে চাঁদা নিলে ইস্কুলের নামকরণ বিষয়েও পাঁচজনের মতামত নিতে হবে। 'সুরেন্দ্রনাথ গার্লস্ স্কুল' প্রতিষ্ঠা করা হয়তো শেষ পর্যন্ত সম্ভবই হবে না

—না হয় নাই হল! নামটা 'সোনার গ্রাম বালিকা বিদ্যালয়' হলেই বা ক্ষতি কী?

—বাঃ! তাহলে ভবেনভায়া এর মধ্যে মাথা গলাবে কেন?

পণ্ডিত গম্ভীর হয়ে বলেন, বুঝলাম। এবং দ্বিতীয় অসুবিধাটা?

—ভবেন আগামী বছর এই কেন্দ্র থেকে এ্যাসেম্ব্লি ইলেকশানে দাঁড়াচ্ছে। তার আগেই স্কুলটা খুলতে পারলে একটা প্রপাগাণ্ডা হয়। ইলেকশান্ পার হয়ে গেলে সমস্ত দৌড়াদৌড়িটাই হবে পণ্ডশ্রম।

ন্যায়রত্ন গাত্রোত্থান করেন। মৃদু হেসে বলেন, এতক্ষণে আপনাদের প্রস্তাবটার নির্গলিতার্থ আমি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি। আচ্ছা, আসুন আপনারা। আমি এবম্প্রকার হঠকারিতার ভিতর নাই!

তিনজনেই চমকে ওঠেন। হঠাৎ এভাবে আলোচনায় যবনিকা নেমে আসতে পারে, এটা ওঁরা কেউ আশঙ্কা করেননি।

ললিত চাটুজ্জে অবাক হয়ে বলেন, এটা কী হল পণ্ডিতমশাই? আপনি এমন হঠাৎ মত পরিবর্তন করে বসলেন যে?

ম্লান হেসে পণ্ডিত বলেন, আজ্ঞে না। মত পরিবর্তন আমি করি নাই। আমার উপলব্ধিতে কিছু ভ্রান্তি থেকে গিয়েছিল। আপনাদের কাছে যা গৌণ আমার কাছে তাই ছিল মুখ্য, এবং আপনাদের কাছে যা নাকি ছিল মুখ্য আমার নিকট তাই মনে হয়েছে গৌণ! এইমাত্র!

—আপনি কী বলছেন তার মাথা-মুণ্ডু আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না।

—আরও পরিষ্কার করে বলব? আমার বিবেচনায় সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এমন কিছু প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি ছিলেন না যে, তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ থাকবে এবং শ্রীমান ভবানন্দের এমন কোন চরিত্রগুণে আমি মুগ্ধ হই নাই, যাতে সে এই কেন্দ্র থেকে আমাদের প্রতিনিধিত্ব করতে প্রেরিত না হলে আমি মর্মাহত হব। আমার নিকট ঐ স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের আয়োজনটাই ছিল একমাত্র আকর্ষণ, যা নাকি আপনাদের ভাষায় পণ্ডশ্রম!

ভবেন এবার আর নরেশ দত্তর দিকে তাকায় না; পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেট এবং দেশলাই বার করে একটি সিগারেট ধরায়। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, আমার সামনেই আপনি আমার বাবার সম্বন্ধে এত বড় কথাটা বললেন?

চাটুজ্জে বলেন, আহা, থাক না ভবেন, মাথাগরম করাটা কিছু নয়।

ভবেন গর্জন করে ওঠে, আপনি চুপ করুন। আপনাকে কে ফোঁপরদালালি করতে ডেকেছে? আমি প্রশান্তবাবুর কাছে কৈফিয়ৎ চেয়েছি।

প্রায় বিশ বছর আগেকার একটি দিনের কথা মনে পড়ে যায় বৃদ্ধ পণ্ডিতের। বলেন, কৈফিয়ৎ! কৈফিয়ৎ কিসের ভবানন্দ? সুরেন্দ্রনাথ তোমার পিতা, তিনি তোমার প্রণম্য; কিন্তু সত্যই কি তিনি প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি ছিলেন? এ অপ্রিয় সত্যের আলোচনায় কেন যেতে বাধ্য করছ আমাকে?

রাগে কাঁপতে কাঁপতে ভবেন বলে, আপনি কত বড় পণ্ডিত আমি দেখে নেব! আপনি ভুলে যাবেন না, আমার বাবাই আপনাকে ঘাড় ধরে গ্রামের বার করে দিয়েছিলেন, প্রয়োজন হলে আমিও আপনাকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করতে পারি! আমিও বামুনের ছেলে। আমিও ব্রহ্মশাপ দিতে পারি!

এবারও হেসে পণ্ডিত বলেন, কথাটা 'ব্রহ্মশাপ' নয়, 'ব্রহ্মশাপ'! তা, ও-উচ্চারণ তো তোমার জিহ্বাগ্রে আসবে না বাবা! কিন্তু ভবানন্দ—

তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে ভবেন বলে, বেশ, দেখা যাবে। আমিও দেখে নেব আপনি কত বড় পাষণ্ড পণ্ডিত।

পাষণ্ড পণ্ডিত! এ নামটা ভুলেই গিয়েছিলেন ন্যায়রত্ন। তাই তো, এ নামটা তো তাঁর আজও ঘুচল না!

খুকুর কণ্ঠস্বরে সম্বিত ফিরে পান আবার। দেখেন, আগন্তুকরা কখন

চলে গেছেন। খুকু বলছে, ভবাদাকে না চটালেই পারতে বাবা। ওর যা চণ্ডালে রাগ, একটা কুরুক্ষেত্তর কাণ্ড করবে।

পণ্ডিত খড়ম্ জোড়া পায়ে দিতে দিতে শুধু বলেন, কুরুক্ষেত্তর' বলিস কেন রে? কথাটা 'কুরুক্ষেত্র'।

খুকু কিছু ভুল বলেনি। ভবেন তার পিতার উপযুক্ত পুত্র হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে। জমিদারী তার নেই, কিন্তু জমিদারের মেজাজটা আছে। ক্ষমতাটাও। ভূম্যধিকারীর বংশানুক্রমিক ক্ষমতার দাপটে তার পিতামহ সমাজের মাথায় চড়ে বসে একদিন যথেচ্ছাচার করেছেন; দান করেছেন খেয়াল-খুশিতে, আদায়-উসুল করেছেন গলায় গামছা দিয়ে। খাজনা বাকি পড়ার দায়ে প্রজাকে বেঁধে রেখেছেন কাছারি বাড়ির থামের সঙ্গে। ভবেনের বাবা সুরেন্দ্রনাথের লাঠিয়াল মহেশ সর্দারকে না চেনে কে? যেমন ভয়াবহ ছিল তার আকৃতি, তেমনি নির্দয় ছিল তার অন্তঃকরণ। কর্তাদের হুকুমে রাতারাতি গ্রামকে গ্রাম আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে দিয়েছে। সেই মহেশ সর্দার অবশ্য এখন নেই—জমিদারী হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তাকেও বিদায় দেওয়া হয়েছে। তবু ভবেনের হুকুম তামিল করবার লোকের অভাব নেই। গ্রামের নওজয়ানদের হাতে রেখে সে শক্তি সঞ্চয় করেছে; সে জানে আর উত্তরাধিকারসূত্রে নয়, আপন অধিকারে তাকে সমাজের মাথায় চড়ে বসতে হবে। তাই সে এবার এই কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে দাঁড়াতে চায়। কোন পক্ষের টিকিট পাবে তা সে জানে না; সেটা বড় কথা নয়। নেহাৎ না হলে নির্দলীয় হয়ে দাঁড়াবে সে। দলে তো যোগ দিলেই হল। আসল কথা নির্বাচনে জয়ী হওয়া। বিধানসভায় গিয়ে বসবার অধিকার পাওয়া। তারপর কী করে কী করতে হয়, সেটা তার ভাল রকমই জানা আছে। ভবেনের অসুবিধা হয়েছে এই যে, তার কিছু বদনাম রটে গেছে এ অঞ্চলে। সকলেই জানে সে অত্যন্ত বেশি পরিমাণে মদ খায়। ম-কারান্ত আরও কিছু আনুষঙ্গিক দোষও তার আছে। তা থাক। সে তো অনেক মহাপুরুষেরই আছে। ভোটাররা তো আর তাকে জামাই করছে না। মোট কথা, আগামী বছর নির্বাচনে জয়ী হতে হলে তাকে সস্তায় কিছু ভাল কাজ এখন থেকেই করে যেতে হবে। ইউনিয়ন বোর্ডের সড়কটা পাকা করানোর জন্য সে উপর মহলে খুব লেখালেখি ছোটাছুটি করছে। গ্রাম্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য ছয় বিঘা ডাঙ্গা জমি সরকারকে দান করেছে। ওটা অবশ্য বন্ধ্যা ডাঙা জমি, ফলন হত না কিছু। আর তাছাড়া তার নামে খাস-জমি এত রাখাও যেত না। এ ভালই হয়েছে। এবারে সে চেয়েছিল মেয়েদের জন্য গ্রামে একটি স্কুল খুলতে। অন্ততঃ বছরখানেক চলেও যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলেও তার কার্যোদ্ধার হতে পারে। সে হিসাব করে দেখেছিল, এ কয় মাস স্কুলটা আধা-মাহিনায় চালালে তার এমন কিছু খরচ হত না। তারপর অর্থাভাবে নির্বাচনের পর স্কুল যদি উঠে যায় সে কী করতে পারে? গ্রামের মধ্যে পণ্ডিত

প্রশান্ত ভট্টাচার্যকে সবাই শ্রদ্ধা করে। তাঁর নামটা প্রধান-শিক্ষক হিসাবে দেখাতে পারলে কাজ হত ; কিন্তু বুড়ো কিছুতেই রাজী হল না। বেশ, সেও দেখে নেবে একহাত ! সেও বাপ কা বেটা !

দিনসাতেক পরের কথা। পণ্ডিত বসে বসে পুঁথি পড়ছিলেন, ডাক-পিওন একখানা চিঠি দিয়ে গেল তাঁকে। পণ্ডিত অবাক হলেন। চিঠিপত্র তাঁর নামে একবারেই আসে না। তিন কুলে তাঁর কেউ নেই। ছাত্র বা বন্ধুরাও কেউ পত্রালাপ করে না। আর বন্ধুই বা তাঁর আছে কোথায় ? বন্ধ খাম। উল্টেপাল্টে দেখলেন। গোটা-গোটা হরফে তাঁরই নাম লেখা আছে বটে। খুকু গরু দুইতে গোয়ালে গেছে। পণ্ডিত চিঠিখানি পড়লেন।

অবাক কাণ্ড ! মেয়েলি ছাঁদের হস্তাক্ষরে স্বাক্ষরহীনা এক রমণী তাঁকে লিখছে যে, সে অত্যন্ত কষ্টে দিনাতিপাত করছে। কুলীন ঘরের ব্রাহ্মণের মেয়ে ; তাই এই বাইশ বছর বয়সেও সে অবিবাহিতা। পিতামাতা গত হয়েছেন। ভাইয়ের সংসারে থাকত। সম্প্রতি ভাইও তার গ্রাসাচ্ছাদনের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেছে। তাই সে পণ্ডিতমশায়ের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করছে। লিখেছে, 'আপনি আমাকে চিনিতে পারিবেন না। আমাকে হয়তো দেখিয়া থাকিবেন। আমি এ গ্রামেরই মেয়ে। আপনি আমাকে শ্রীচরণে স্থান দিলে আমি আপনার পরিচারিকা হিসাবে থাকিতে পারি। তাহার বেশী দাবী করিবার সাহস আমার নাই।'

পণ্ডিত রীতিমত বিচলিত বোধ করেন। না হলে হয়তো কলমটা তুলে নিয়ে তখনই বর্ণাশুদ্ধিগুলি সংশোধন করতে বসতেন। পত্রখানি তিনি লুকিয়ে ফেলেন। কে এই রমণী ? প্রতিবেশীরা সকলেই তাঁর পরিচিত। কোন ব্রাহ্মণ-পরিবারে এ রকম একটি মেয়েকে দেখেছেন বলে তো মনে করতে পারেন না ! তিনি কী সাহায্য করতে পারেন ? তাঁর গৃহে ঐ মেয়েটিকে স্থান দেওয়া চলে না। অনাত্মীয়া ঐ বয়সের একটি মেয়েকে আশ্রয় দিলে সেটা দৃষ্টিকটু হবে। তিনি নিজেকে চেনেন, সেদিক থেকে অবশ্য মেয়েটির কোন বিপদের আশংকা নেই ; কিন্তু গ্রাম্য-সমাজ এটা সুনজরে দেখবে না। সেজন্য পণ্ডিত সমাজকে দোষও দেন না। তিনি তো সামান্য মরমানুষ, স্বয়ং সীতা দেবীও অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে সমাজের দাবী মিটিয়েছিলেন। তাছাড়া মেয়েটি পত্র-শেষে লিখেছে, 'আপনার অনুমতি পাইলে আপনার শ্রীচরণে প্রণাম করিতে যাইব।' কিন্তু অনুমতি তিনি দেবেন কাকে ? দেবেন কেমন করে ? একবার মনে হল মা-মণির সঙ্গে পরামর্শ করেন। কিন্তু সে বেচারি নিতান্ত শিশু। সে তাঁকে কী পরামর্শ দেবে ? একবার মনে হল ডাক্তারকে চিঠিখানা দেখান—কিন্তু তাতেও কেন যেন মন থেকে সায় পেলেন না। স্থির করলেন, এ বিষয়ে তাড়াহুড়া করা কিছু নয়, দু-চার দিন চিন্তা করে কী করণীয় তা স্থির করবেন।

কিন্তু চিন্তা করবার অবকাশ তিনি পেলেন না। তিন দিনের মাথায় ঐ

অপরিচিতা মেয়েটি আবার একখানি পত্রাঘাত করে বসল। এবার তার দাবী আরও চড়েছে। এবার রীতিমত প্রেমপত্র লিখেছে সে। খোলাখুলি লিখেছে, পণ্ডিত যদি তাকে পায়ে স্থান না দেন, তার নারীজন্ম ব্যর্থ করে দেন, তবে সে আত্মঘাতী হবে।

কী আশ্চর্য! মেয়েটি কি পাগল? নিজের নাম সে লেখেনি, ঠিকানা লেখেনি, তাহলে পত্রের উত্তর সে আশা করছে কেমন করে? সে কি ধরে নিয়েছে পণ্ডিত তাকে চিনতে পেরেছেন? এ তো মহা বিড়ম্বনায় পড়া গেল! পরিস্থিতি এখন এমন ঘনিয়ে উঠেছে যে, এ পত্র আর খুকুকে অথবা ডাক্তারকে দেখানো চলে না। অথচ কিছু একটা তো করতে হয়!

দুদিন পরের কথা। গামছা আর ঘড়া নিয়ে খুকু দীঘির দিকে চলে গেল। পণ্ডিত লাউ গাছটার গোড়া খুড়ে দিচ্ছিলেন। হঠাৎ একটি ছেলে এসে বেড়ার গায়ে সাইকেলটা ঠেকিয়ে রাখল। গেট খুলে ভিতরে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল পণ্ডিতকে। ছেলেটিকে উনি চিনতে পারলেন না, বললেন—কে বাবা তুমি? আমি তো ঠিক—

—না স্যার, আমাকে আপনি চেনেন না। কিছু কথা ছিল, ঘরে আসবেন কি?

একটু বিস্মিত হয়েই পণ্ডিত দাওয়ায় উঠে আসেন। ছেলেটি তার চোঙা প্যাণ্টের পকেটে হাত চালিয়ে একখানা বন্ধ খাম বার করে আনল, বললে, আপনার একখানা চিঠি আছে স্যার!

—কার চিঠি?

—খুলে পড়লেই বুঝতে পারবেন।

পণ্ডিত আন্দাজ করেছেন ব্যাপারটা। বলেন, সেটা প্রণিধান করেছি বাবা, কিন্তু তুমি এ পত্রখানি কোথায় পেলে?

—খুলেই দেখুন না স্যার! আমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছিনে!

পণ্ডিত আর বাক্যব্যয় না করে খামটা খুলে ফেলেন। হ্যাঁ, যা আশঙ্কা করেছিলেন, তাই। এবার মেয়েটি পত্র-শেষে নিজের নামও লিখেছে—'রত্না'। লিখেছে, 'আমার পত্রের জবাব না পাইয়া এই ছেলেটিকে পাঠাইলাম। আপনার মতামত এর মারফতে জানাইবেন।'

পণ্ডিত গম্ভীরভাবে বলেন, রত্না কে? তোমার কোন আত্মীয়া?

—হ্যাঁ স্যার, একরকম আত্মীয়াই। আমার দিদির মত।

—কোথায় থাকেন তিনি?

—এই কাছেই।

—তাঁর ঠিকানা কী?

—সবই বলব স্যার, তার আগে বলুন, আমার দিদিকে কি আপনার চরণে ঠাঁই দেবেন?

পণ্ডিত গম্ভীর হয়ে বলেন, তোমার দিদিকে বলবে বিকৃতমস্তিষ্কার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই !

ছেলেটি দাঁত দিয়ে নখ কাটতে কাটতে বলে, সেকথাটা আপনি নিজেই তাকে বললে ভাল হয় না স্যার ?

একটু ভেবে নিয়ে পণ্ডিত বলেন, ঠিক বলেছ তুমি। আমি নিজেই তাঁকে বুঝিয়ে বললে ভাল হত ; কিন্তু এস্থানে তাঁর আগমন বাঞ্ছনীয় নয়।

—না স্যার, এখানে ওসব ব্যাপার তো হতেই পারে না ! এখানে আপনার মেয়ে আছে। আপনি যদি অনুমতি দেন, আমি কাল এসে আপনাকে রত্নাদির বাড়ি নিয়ে যেতে পারি !

—আর কে আছেন সেখানে ?

—আর কে থাকবে ? রত্নাদি স্রেফ একাই থাকে। তিনকুলে তার কেউ নেই।

—তথাস্তু ! তাই যাব আমি। তবে তোমার দিদির সঙ্গে আমি যখন বাক্যালাপ করব তখন তোমাকেও সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে।

ছেলেটি ঘাড় চুলকাতে চুলকাতে লাজুক মুখে বললে, এ কী একটা কথা হল স্যার ? হাজার হ'ক আপনি আমার বাপের বয়সী ; আপনি যদি রত্নাদিকে দুটো মনের কথা বলেন, সেখানে আমার থাকাটা কি ভাল দেখায় ?

—কী শোভন আর কী অশোভন, তা আমাকেই স্থির করতে দাও। তোমার উপস্থিতিতেই আমি তোমার দিদিকে কয়েকটি উপদেশ দিতে চাই।

—বেশ, তাই হবে স্যার। কাল ঠিক সন্ধ্যাবেলায় আমি আসব।

—উত্তম !

পণ্ডিত স্থির করলেন এ ব্যাপারে একটা ফয়সালা করা দরকার। সমাজ কোথায় চলেছে ? ঐ মেয়েটি কেমন করে এভাবে নির্লজ্জের মত ক্রমাগত পত্র পাঠাচ্ছে ? দূত পাঠাচ্ছে ? ও কি কোন মনের অসুখে ভুগছে ? সে কি সত্যই বিকৃতমস্তিষ্কা ? না কি প্রয়োজনের তাগিদে ভালমন্দ লজ্জা-সরমের কোন বোধ আর ওর অবশিষ্ট নেই ? যাই হোক তিনি মেয়েটিকে সব কথা বুঝিয়ে বলবেন। হ্যাঁ, এক সময়ে পাঁচ বছরের একটি শিশুকে মানুষ করে তোলবার প্রয়োজনে তিনি দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু তাও আজ পাঁচ বছর আগেকার কথা। মা-মণি এখন আর শিশু নয় ; সে এখন যথেষ্ট বড় হয়ে উঠেছে। তার আর অভিভাবিকার প্রয়োজন নেই। সে নিজেই এখন জননী—ন্যায়রত্নই এখন তার অসহায় সন্তান। তাঁর জীবনে নারী-সঙ্গের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। সে প্রয়োজন অবশ্য কোন যুগেই অনুভব করেনাঁন। এ-ছাড়া থাকল সেই মেয়েটির প্রয়োজনের কথা। তার পূর্ণ পরিচয় জেনে নিতে হবে। কোন সুপাত্রের হাতে তাকে সমর্পণ করা যায় কিনা ভেবে দেখতে হবে। সেটা সম্ভব না হলে কোন ভদ্রলোকের পরিবারে

মেয়েটির মোটামুটি গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা যায় কিনা সে চেষ্টাও করে দেখবেন। মেয়েটির প্রতি যে তীব্র ঘৃণা প্রথমাবস্থায় জেগেছিল সেটা কমে এসেছে; সেটা বরং করুণায় রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছিল ক্রমশঃ। কত বড় প্রয়োজনের তাগিদে একটি বঙ্গরমণী এভাবে লজ্জা-সরম সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিতে পারে সেটাও তো ভেবে দেখতে হবে!

পরদিন ঠিক গোধূলি বেলায় ছেলেটি এসে হাজির হল। সাইকেলে চেপেই। হাতে তার একটি টর্চ। খুকু প্রশ্ন করে, কোথায় যাচ্ছ বাবা?

—একটু প্রয়োজন আছে, মা। তুমি দ্বার রুদ্ধ করে দাও!

সন্ধ্যার পর আজকাল আর সচরাচর বাইরে যান না। খুকু একটু বিস্মিত হল হয়তো; কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্ন করল না। দ্বার বন্ধ করে দিল ভিতর থেকে।

গ্রাম্য বনপথ দিয়ে টর্চ দেখিয়ে সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে ছেলেটি আগে-আগে চলেছে। পণ্ডিত নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করছেন। লোকালয়ের বাইরে এসে ছেলেটি বললে, একটা কথা স্যার, রত্নাদি মেয়েটা সত্যিই ভাল, বেহায়া নির্লজ্জ সে নয়; তাকে বকাবকি করবেন না তো?

প্রশান্ত পণ্ডিতের মনটা করুণ হয়ে ওঠে, না, তিরস্কার করব না। বুঝিয়ে বলব শুধু।

—ওকে আপনার চরণে ঠাঁই দেবেন তো স্যার?

—সে প্রসঙ্গে তোমার দিদির সঙ্গেই আলোচনা করব।

ছেলেটি আড়চোখে একবার বৃদ্ধের দিকে তাকায়। অন্ধকারে তাঁর মুখটা ভাল দেখা গেল না।

—এ কোথায় চলেছ তুমি?

—এই এসে গেছি স্যার; ঐ যে আলো দেখা যাচ্ছে!

গ্রামপ্রান্তে এখানে যে কতকগুলি কুটীর ছিল তা পণ্ডিতের জানাই ছিল না। সড়কের পাশেই খাপরার বস্তি। কতকগুলো লোক উবু হয়ে বসে জটলা করছে। একটা উৎকট গন্ধ নাকে গেল পণ্ডিতের। এ গন্ধ তাঁর চেনা। কালীতারা কেবিনে এ গন্ধ তিনি ইতিপূর্বেও পেয়েছেন। পেয়েছেন যতীনের গায়ে। পণ্ডিত বুঝতে পারেন এটা একটা মদের দোকান। পাড়াটা ভাল নয়। ঐ ছেলেটির ভগ্নী—কী যেন নাম তার—তার পক্ষে এ পাড়ায় এ রকম অরক্ষিতা একা থাকা ঠিক নয়। পণ্ডিত সেই অচেনা মেয়েটির জন্য আরো একটু উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন।

এ-পথ সে-পথ দিয়ে ছেলেটি এগিয়ে চলে। দু'একটি ঘরে বাতি জ্বলছে। একটি কুটীরের গায়ে দুটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। পণ্ডিতকে আসতে দেখে তারা দুজন হেসে এ-ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ল। আরও কাছাকাছি আসায় তারা দরজাটা বন্ধ করে দিল।

সাইকেলটা একটা ঘরের দেওয়ালে ঠেকিয়ে রেখে ছেলেটি অনুচ্চস্বরে ডাকল, রত্নাদি—

ঘরের ভিতরে আলো জ্বলছিল। এক ডাকেই সাড়া পাওয়া গেল। গৃহবাসিনী বোধহয় এই আহ্বানের প্রতীক্ষাতে বসেছিল এতক্ষণ। খুট করে দরজাটা খুলে গেল। প্রদীপ হাতে একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল খোলা দরজার ওপাশে।

—রত্নাদি, ইনিই পণ্ডিতমশাই।

মেয়েটি পথ দেখিয়ে বললে, আসুন!

যন্ত্রচালিতের মত পণ্ডিত পায়ে-পায়ে এগিয়ে এলেন।

মাটির ঘর। ঝকঝক তকতক করছে। নিপুণ হাতে গোবর দিয়ে নিকানো। ঘরে একটি চৌকি পাতা। ধপধপে সাদা চাদর বিছানো আছে। পাশাপাশি দুটি মাথার বালিশ—বেশ চওড়া চৌকিটা। ওপাশে একটা কুলুঙ্গিতে লক্ষ্মীর পট। কাল বৃহস্পতিবার গেছে। লক্ষ্মীর পটে গাঁদার মালাটা এখনও শুকিয়ে যায়নি। চৌকির মাথার কাছে একটা নিচু কাঠের টুল। তাতে একটি পিতলের রেকাবীতে কিছু জুঁই ফুল। তার সৌগন্ধ্যে মনটা স্নিগ্ধ হয়ে গেল পণ্ডিতের। ওপাশে একটি দড়ি টাঙানো আছে, তাতে খানকয় শাড়ি-সায়া ঝুলছে। ঘরের এ-প্রান্তে একটি হারমনিয়াম, ডুগি-তবলা।

মেয়েটি প্রদীপটাকে রাখল কুলুঙ্গির উপর। তারপর একখানা মাদুর বিছিয়ে বললে, বসুন!

পণ্ডিত চটিজোড়া ঘরের বাইরেই খুলে এসেছিলেন। মেয়েটির দিকে এখনও চোখ তুলে তাকিয়ে দেখেননি। প্রদীপের মৃদু আলোয় তিনি শুধু দেখছিলেন আলতা-রাঙা দুটি শুভ্র চরণ আর সেই চরণযুগলকে বেষ্টন করা একটা সোনালী জড়িপাড় শাড়ি।

পণ্ডিত পা মুড়ে মাদুরের উপর গিয়ে বসলেন।

মেয়েটিও বসল মাদুরের অপর প্রান্তে, বেশ দূরত্ব রেখে। সেখান থেকেই মৃদু হেসে বললে, আপনি যে শেষ পর্যন্ত আসবেন তা স্বপ্নেও ভাবিনি আমি!

এবার পণ্ডিত চোখ তুলে তাকালেন মেয়েটির মুখের দিকে এবং তৎক্ষণাৎ মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। আহা! এ যে সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী! এমন কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্র জুটছে না? দেশের মানুষ কি অন্ধ? টানা-টানা কাজলকালো দুটি দীর্ঘায়িত চোখ, কপালে একটি সিঁদুরের টিপ, গলায় একটি ঝুটো মুক্তোর মালা। আঁট করে বাঁধা খোঁপায় জড়ানো একছড়া বেলফুলের মালা।

পণ্ডিত এতদূর বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, খেয়াল করেননি তিনি ঘরে প্রবেশ করা মাত্র ঘরের একমাত্র দরজাটি বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আগন্তুক ছেলেটি আদৌ ঘরে প্রবেশ করেনি, সেটাও খেয়াল হল না বৃদ্ধের।

পরমুহূর্তেই পণ্ডিত দৃষ্টি নত করলেন। ক্ষীণ দীপালোকে ওর অলক্তকরঞ্জিত চরণযুগলের দিকে তাকিয়ে পণ্ডিত হঠাৎ এক নিঃশ্বাসে অনেক কথা বলে গেলেন, বললেন, মা-রে! কেন তুই এমন পাগলামি করছিস, মা? আমি বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত! তুই কি দর্পণে তোর নিজ প্রতিবিম্ব কোনদিন দেখিস্ নাই? তুই যে পূজার পুষ্প রে! তুই আমার বয়ঃকনিষ্ঠা, নচেৎ তোকে প্রণাম করতাম আমি। তোর ঐ রূপের মধ্যে আমি যে সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রীকে দেখতে পাচ্ছি, মা!

মেয়েটি কেমন যেন হতচকিত হয়ে যায়। বলে, আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না, আপনি···মানে···আপনিই প্রশান্ত ভট্টাচার্য তো?

—হ্যাঁ রে পাগলি! তুই আমাকেই চিঠি লিখেছিলি!

—কিন্তু আপনিই কি পাঁচ বছর আগে আমাদের ডাক্তারবাবুর স্ত্রীকে বিবাহ করতে গিয়েছিলেন?

হা হা করে হেসে ওঠেন বৃদ্ধ। বলেন, তুই তো অনেক সংবাদ রাখিস্ রে! হ্যাঁ, আমিই সে—

—তাহলে···আজ···মানে—

মেয়েটি মাঝপথেই থেমে যায়।

পণ্ডিত বলেন, শুনবি সেকথা? সে ভারি দুঃখের কথা। দুঃখের কিন্তু আনন্দের! কাউকে কখনও বলি নাই। আজ তোকে বলব। তুই যে আমার মা! মায়ের কাছে না বললে আর কাকে বলব? অ্যাঁ? আর তদ্ভিন্ন তোর এসব কথা জানাও দরকার—

অকপটে পণ্ডিত সব কথা বলে গেলেন দীর্ঘ সময় ধরে। কোন লজ্জা বোধ করলেন না, কোন সংকোচ বোধ করলেন না। কিসের লজ্জা-সংকোচ? ও মেয়েটি তো লজ্জা-সংকোচ বিসর্জন দিয়ে তার সমস্যার কথা পণ্ডিতকে অকপটে জানিয়েছে। তিনি ওকে 'মা' বলে ডেকেছেন। মায়ের কাছে লজ্জা কিসের? তাছাড়া পণ্ডিত ভেবেছিলেন ডাক্তারের স্ত্রীর জীবনকথা জানতে পারলে এই অসহায়া মেয়েটি মনে বল পাবে। যুক্তি যাই থাক, বলতে বলতে পণ্ডিত কিন্তু তন্ময় হয়ে গেলেন। বুঝলেন, মনের একটা কোণে দীর্ঘদিন একটা নিরুদ্ধ অভিমান পুঞ্জীভূত হয়েছিল—করেও কাছে মন খুলে বলতে পেরে মনটা ক্রমশঃ হাল্কা হয়ে যেতে থাকে। প্রতিমার মৃত্যুর কথা থেকে শুরু করে একে-একে সব কথাই বললেন। মা-মণিকে নিয়ে কিভাবে দ্বারে-দ্বারে আশ্রয় ভিক্ষা করে ফিরেছেন। কাতুবুড়ির নির্যাতন, দুলালের মায়ের লাঞ্ছনা। বললেন চন্দ্রবাবুর কথা, যতীন মাতালের কথা। শেষে বললেন চণ্ডীগড়ে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে যাবার কথা। দেবীপুরের স্টেশনে সেই দুটি মেয়ে তাঁকে কিভাবে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিয়েছিল, ফুলের মালা গলায় দিয়েছিল তাও বলতে ভুললেন না। তারপর সেই ছাঁদনাতলায় নির্মম প্রহার।

ওরা পণ্ডিতের দাঁত ভেঙে দিয়েছিল, সমূলে শিখা উৎপাটিত করেছিল। রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি কেমন করে ফিরে এসেছিলেন, তাও বললেন সবিস্তারে। এবং তারপর সেই পুত্রসম ছাত্রদল কেমন করে তাঁর উঁচু মাথাটা ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছিল!

এতদিন এ নিরুদ্ধ অন্তর্বেদনার কোন বহিঃপ্রকাশ হয়নি, আজ কী জানি কেন, তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সমস্ত নিরুদ্ধ বেদনাই মূর্ত হয়ে উঠল, বাঙ্ময় হয়ে উঠল। বৃদ্ধ জানতেও পারলেন না, তাঁর শীর্ণ গাল বেয়ে কতবার জলধারা নেমে এল। মেয়েটি কাঠের পুতুলের মত বসে আছে একেবারে নিঃশব্দে। স্তম্ভিত হয়ে গেছে সে! বোধ করি সে নিঃশ্বাস ফেলছে না, পাছে ধ্যানভঙ্গ হয়ে যায় অনুতপ্ত বৃদ্ধের। দীর্ঘ কাহিনী শেষ করে বৃদ্ধ বললেন, তবেই দেখ্ মা, সেই কৃষ্ণসহায়বাবুর কন্যাটির আজ সব হয়েছে, সে স্বামী পেয়েছে, সন্তান পেয়েছে, সংসার পেতেছে। তুই-ই বা এমন ভেঙে পড়ছিস কেন? আমি নিশ্চয় করে বলছি, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ, তোরও সব হবে, তোর এমন জগদ্ধাত্রীর মত রূপ—

হঠাৎ মুখ তুলে পণ্ডিত দেখেন তাঁর শ্রোতার দুই গালে নেমেছে শ্রাবণের ধারা। কী একটা কথা বলতে গেলেন তিনি, কিন্তু তার আগেই বাইরে একটা কোলাহল শোনা গেল।

প্রশান্ত পণ্ডিত সহসা বাস্তবে ফিরে আসেন। উঠে দাঁড়ান। বলেন, এত কোলাহল কিসের?

পরক্ষণেই দ্বার খুলে গেল। বিস্ময়াহত পণ্ডিত দেখেন, দ্বারের ও-প্রান্তে দু-তিনজন লোক টর্চ-লণ্ঠন নিয়ে দাঁড়িয়ে।

তাদের পুরোভাগে ভবেন চক্রবর্তী।

ওরা ঘরে প্রবেশ করে। ভবেন অশ্লীল ভঙ্গী করে বলে, বাঃ বাঃ বাঃ! তুমিও এসে জুটেছ এ পাড়ায়? এ্যাঁ? ন্যায়রত্ন! সিংকিং সিংকিং ড্রিংকিং ওয়াটার!

নরেশ দত্ত বলে, এর মানে কী? আপনাকে আমরা সচ্চরিত্র বলে জানতাম!

তৃতীয় একজন বলে, শেষকালে আপনি রত্নার ঘরে রাত কাটাতে এসেছেন? বুড়োমানুষ! ছি ছি ছি! শেষে ধরা পড়লেন একটা বেশ্যাপল্লীতে!

—কী! কী বললে? স্তম্ভিত হয়ে প্রশ্ন করেন পণ্ডিত।

ভবেন বলে, শালা ন্যাকা সাজছে!

—শালা পাষণ্ড পণ্ডিত।

ভট্টাচার্যমশাই মেয়েটির দিকে ঘুরে দাঁড়ান। তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চোখে-চোখ রেখে বলেন, তুমি···তুমি···

কথাটা তাঁর শেষ হয় না। তার আগেই ভবেন পিছন থেকে পণ্ডিতের

টিকিটা চেপে ধরেছে দৃঢ়মুষ্টিতে। বাগিয়ে একটা ঘুসি মারতে যাবে, তার আগেই রত্না ছুটে এসে ভবেনের গালে বসিয়ে দিল ঠাস্ করে এক চড়।

ভবেন মদ্যপান করে এসেছিল ; কিন্তু জ্ঞান তার টনটনে। মুঠিটা তার আপনা থেকেই আলগা হয়ে গেল। এবার সে রত্নার মুখোমুখি হয়ে বললে, এত বড় স্পর্ধা তোর। তুই আমার গায়ে হাত দিস্।

এক পা এগিয়ে আসে সে। চকিতে রত্না সরে যায় চৌকির ও-প্রান্তে। কিন্তু ভবেনের মাথায় তখন খুন চেপে গেছে। অস্ফুটে একটা অশ্লীল গালাগাল দিয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাতে সে এগিয়ে যায় রত্নার দিকে। রত্না সেখান থেকেই চিৎকার করে ওঠে, মহেশ।

মুহূর্তমধ্যে দ্বারের ও-প্রান্তে এসে দাঁড়ায় একজন মধ্যবয়স্ক লাঠিয়াল। বলিষ্ঠ গঠন তার, খালি গা, মাথায় একটা গামছা বাঁধা, গলায় একটা পিতলের চাকতি, হাতে তেলপাকা একটা লাঠি। সেখান থেকেই বজ্রগম্ভীর স্বরে বলে, মা ?

—এই লোকগুলোকে ঘাড় ধরে বার করে দাও !

মহেশ ঘরের ভিতর চলে আসে। বাঁ হাতটা কপালে ছুঁইয়ে ভবানন্দকে সেলাম করে বলে, ছোট কর্তা। একটি কথা লয়, বাইরে আয়েন।

ভবেন গর্জন করে ওঠে, মহেশ। তুই এমন নেমকহারামি করলি ?

মহেশ হা-হা করে ঠারে-ঠারে হাসল ; বললে, এটা কী কইলেন ছোট কর্তা ! এরে আপনি নিমকহারামি ক'ন ? যদ্দিন জমিদার সরকারের কাম কর্তাম, আপনের হুকুমে মানুষের মাথা নিছি। অখন এই দিদিমণিদের নিমক খাই— এঁদের হুকুমে আপনের মাথা নিবার পারি। আয়েন, বাইরে আয়েন।

ভবানন্দ বলে, তোকে আমি—

তার কথাটাও শেষ হয় না। মহেশ খপ করে বজ্রমুষ্টিতে ভবেনের কব্জিটা চেপে ধরে একটা হ্যাঁচকা টান মারে, বলে, ঘাড় ধরবার হুকুম হছিল, হাত ধরছি। আর একটি কথা কইলে ঘাড় ধরা বার করুম কিন্তুক।

ভবানন্দ মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। তার দুজন সঙ্গীও গেল পিছু-পিছু। মহেশ সর্দার গেল তাদের সঙ্গে।

রত্না পণ্ডিতমশাইয়ের দিকে ফিরে বলে, বাড়ি যান পণ্ডিতমশাই, কেউ আপনার গায়ে হাত দেবে না।

—কিন্তু মা, তুমি কি···তুমি কি···

—হ্যাঁ পণ্ডিতমশাই, আমি তাই। ভুল আপনার হয়েছিল, ভুল আমারও হয়েছিল। ওরা আমাকে বলেছিল, একজন বিয়ে-পাগলা বুড়োকে নিয়ে ওরা নির্দোষ মজা করতে চায়। আমি আপনার দুঃখের কথা কিছুই জানতাম না। আমি জানতাম না, ওরা আপনাকে অপদস্থ করতে এভাবে এখানে আনতে চায়।

বৃদ্ধ বলেন, ও। আচ্ছা। তবে যাই মা ?

—একটু দাঁড়ান। আপনাকে একবার প্রণাম করব আমি।

—থাক থাক, আবার প্রণাম কেন?

মেয়েটি এসে নতজানু হয়ে বসে তাঁর সম্মুখে। গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করতে গিয়েও হঠাৎ থেমে পড়ে। ঊর্ধ্বমুখে জলভরা দুটি চোখের দৃষ্টি পণ্ডিতের দিকে মেলে ধরে বলে, আপনাকে ছোঁব পণ্ডিতমশাই?

পণ্ডিত তাঁর শিরা-ওঠা দুটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে ওর বেলফুলের মালা-জড়ানো মাথাটা সস্নেহে স্পর্শ করেন।

হঠাৎ শিউরে ওঠে মেয়েটি। তার মাথা নেমে আসে ন্যায়রত্নের যুগ্মচরণের উপরে। পণ্ডিতের পায়ের পাতায় লাগে সিঁদুরের দাগ, আর চোখের জল। পণ্ডিত বলেন, কাঁদছিস্ কেন মা?

মেয়েটি মুখ তোলে, অস্ফুটে বলে, সে আপনি বুঝবেন না পণ্ডিতমশাই। আমি খারাপ মেয়েমানুষ। নিত্য দুবেলা আমি রূপের প্রশংসা শুনি। কিন্তু কিছুই না জেনে আজ আপনি আমাকে যে মর্যাদা দিয়েছেন, তা আমি জীবনেও পাইনি। জানি, এখন আর ও কথা বলবেন না আপনি; এখন সব জানার পর—

পণ্ডিত ওকে থামিয়ে বলেন, ভুল বললি মা। আমি অনৃতভাষণ করি না। আমি এখনও বলে যাচ্ছি, তোর মধ্যে আমি সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রীকে দেখে গেলাম। মঙ্গলময় তোকে শান্তি দিন। তোর কল্যাণ হোক।

পণ্ডিত বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। তিনি জানতেও পারলেন না, রুদ্ধদ্বারের ওপারে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ফুলে-ফুলে তখন কাঁদছিল রত্না। রূপোপজীবিনী রত্নাবাঈ।

জনবিরল গ্রাম্য পথ দিয়ে ফিরে আসছিলেন ন্যায়রত্ন। তিনি কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। সমস্তটাই তাহলে একটা বিরাট ষড়যন্ত্র? গ্রাম-সমাজে তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করতে, তাঁর উঁচু মাথাটা ধুলোয় লুটিয়ে দিতেই এভাবে ভবেন আজ একসপ্তাহ ধরে একটা ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করে চলেছে। মানুষ এত নীচ? তবে তো শহরের সঙ্গে গ্রামেরও কোন প্রভেদ নেই!

কিন্তু এত বড় দুনিয়ায় কি শান্তির রাজ্য কোথাও নেই, যেখানে তিনি তাঁর মা-হারা মামণিকে নিয়ে জীবনের বাকি ক'টা দিন শান্তিতে কাটিয়ে যেতে পারেন? যেখানে যতীনরা নেই, চন্দ্রকান্তবাবুরা নেই, ভবানন্দরা নেই?

পায়ে-পায়ে বাড়িতে এসে পৌঁছলেন একপ্রহর রাতে। কৃষ্ণাপঞ্চমীর চাঁদ তখন সবে উঁকি মারছে পূব আকাশে। ঘর অন্ধকার। মা-মণি আলো জ্বালেনি কেন? না কি সে ঘুমিয়ে পড়েছে? দাওয়ায় উঠে দাঁড়িয়েছেন কি দাঁড়াননি, হঠাৎ দ্বার খুলে ছুটে বেরিয়ে আসে খুকু। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ সবলে বাপকে জড়িয়ে ধরে হু-হু করে কেঁদে ফেলে। বৃদ্ধ পণ্ডিত সেই কৃষ্ণা পঞ্চমীর ম্লান জ্যোৎস্নালোকে তাঁর অপাপবিদ্ধা কিশোরী কন্যার মুখটি তুলে ধরে বলেন, কী হয়েছে রে, অমন করছিস কেন?

খুকু জবাব দেয় না। আবার মুখটা বাপের বুকের মধ্যে গুঁজে দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে।

পণ্ডিত ওকে বাধা দিলেন না। প্রাণভরে কেঁদে ওকে মনটা হালকা করতে দিলেন। তারপর বলেন, বলত মা, তোকে কি কেউ কোন কটুবাক্য বলেছে?

খুকু মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, হুঁ।

—কে বলেছে?

—আমি তাদের চিনি না। চার-পাঁচটা ছেলে এসেছিল একটু আগে। তোমার নাম করে ডাকতে আমি যেই দরজা খুলে বেরিয়েছি—

বুকের মধ্যে মুচড়ে ওঠে বৃদ্ধের। দাঁতে দাঁত চেপে বলেন, তোর গাত্র-স্পর্শ করেছিল?

আবার ডুকরে কেঁদে ওঠে খুকু।

পণ্ডিত ধীরে ধীরে বসে পড়েন দাওয়ায়। মনে পড়ে যায় অনেক দিন আগেকার কথা। সেদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে তিনি দেখেছিলেন রুদ্ধদ্বারে মাথা ঠুকতে ঠুকতে তাঁর পাঁচ বছরের মেয়ে মাকে ডাকছিল আর বলছিল—আর দুষ্টুমি করব না আমি। মা গো, তুমি ফিরে এস। আজ এতক্ষণ আলোকহীন কক্ষে খুকু কী করছিল তিনি জানেন না। সেদিনের মতই কি মাথা খুঁড়ছিল রুদ্ধদ্বারে? সেদিন সেই পাঁচ বছরের মেয়েটি তার লজ্জার কথা বাপের কাছে স্বীকার করতে পারেনি—সে ডেকে এনেছিল কাতুদিদিকে। আজ খুকু লজ্জার কথা কাকে বলবে?

খুকুও বসে পড়ে বাপের পাশে। তাঁর দুটি হাঁটুর মধ্যে মাথাটা গুঁজে দিয়ে বলে, জানো বাবা ওরা তোমার নামে খুব খারাপ কথা বলছিল, খু—ব খারাপ কথা। বলছিল, তুমি যেখানে গিয়েছ সেখানে নাকি···মানে তুমি নাকি···

খুকু কথাটা শেষ করতে পারে না।

কান্নায় আবার ভেঙে পড়ে সে।

বৃদ্ধ তাঁর বলিরেখাঙ্কিত দুটি হাত ওর মাথায় বুলাতে বুলাতে বলেন, শোন তুই যখন পঞ্চবর্ষীয়া বালিকামাত্র, তখন আমাকে কয়েকটি ছেলে প্রচণ্ড প্রহার করেছিল। মনে আছে তোর?

খুকুর কান্না থেমে যায়।

—তিন-চারদিন আমি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলাম। ওরা আমার একটি দন্ত উৎপাটিত করেছিল, আমার শিখা নির্মূল করেছিল, স্মরণ হয় না?

খুকু উঠে বসে। মুখ উঁচু করে বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকে।

পণ্ডিত আপন মনে বলেই যান, সেদিন তুই কিছুই প্রণিধান করতে পারতিস না। তবু আমাকে প্রশ্ন করেছিলি—বাবা, ওরা তোমাকে এমন করে প্রহার করল কেন? তুমি কি কিছু দুষ্টামি করেছিলে? আমি তোর কাছে জবাবদিহি

করেছিলাম, বলেছিলাম—না, মা-মণি, কোন দুষ্টামি আমি করি নাই। তবে ভুল করেছিলাম; কী, মনে পড়ে?

এবার খুকু মাথা নেড়ে সায় দেয়।

—সেদিন তুই তার উত্তরে কিছু না বুঝেই বলেছিলি—আর কখনও তাহলে ভুলও ক'র না বাবা। আমি প্রতিশ্রুত হয়েছিলাম, বলেছিলাম—না মা, আর কখনও এমন ভুল করব না। আমি আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করি নাই রে। সেবার একটা গ্লানিতে আমার অন্তঃকরণ পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এবার, না, এবার বিন্দুমাত্র গ্লানি অনুভব করছি না। হ্যাঁ, আমি বেশ্যাপল্লীতেই গিয়েছিলাম মা, সেখানে একজন দেবীকে দেখে এলাম!

—দেবী?

—হ্যাঁ, মা-মণি! সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী! তুই আর ছোট্টটি নস্। সমস্ত বৃত্তান্ত এবার তোকে সবিস্তারে বলব। আয়, ঘরে আয়!

রাত্রে খুকুকে পাশে নিয়ে শুয়েছিলেন পণ্ডিত। সমস্ত কথা খুলে বলেছেন তাকে। শান্তির কথা, রত্নার কথা। মনটা হাল্কা হয়ে গেছে তাঁর। রাত অনেক হয়েছে, তবু বুঝতে পারেন খুকু এখনও ঘুমায়নি। চুপ করে শুয়ে আছে। ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলেন, ভাবছিলাম, ওরা তো আমাদের ছাড়বে না। আমার দেহে এমন ক্ষমতা নেই যে, তোকে রক্ষা করি; অথচ স্থির-নিশ্চয় জানি, অতঃপর ওরা শুধু তোকেই আক্রমণ করবে। আমি পিতা, তোর ধর্মরক্ষা করা আমার কর্তব্য; কিন্তু আমি অথর্ব, আমি পঙ্গু।

খুকু উঠে বসে। বলে, চল বাবা, আমরা এখান থেকেও চলে যাই।

—আমিও সেই সিদ্ধান্তে এসেছি রে। আর একটি দিনমান এখানে থাকতে ভরসা হয় না। এরা মানুষ নয়, পিশাচ। যে কোন মুহূর্তে ওরা তোর চরম সর্বনাশ করতে পারে। ভবেন এই গ্রাম-সমাজের মধ্যমণি। তার বিরুদ্ধাচরণ করতে কেহই সাহসী হবে না। নাঃ!—কলকাতা শহরের মত এই গ্রামটাতেও বিষক্রিয়া শুরু হয়েছে। এও সংক্রামক ব্যাধিতে ভুগছে। কিন্তু মা, এমন তো হবার কথা নয়, এমন তো হতে পারে না!

—কেন হতে পারে না বাবা?

পণ্ডিত চুপ করে যান। কেমন করে তিনি বোঝাবেন তাঁর মা-মণিকে, তিনি যে বিশ্বাস করেন আনন্দাব্ধের খল্লিমানি ভূতানি জায়ন্তে। স্বর্গরাজ্য কোথাও না কোথাও নিশ্চয় আছে। এই দুনিয়াতেই আছে—যেখানে সবই আনন্দঘন; যেখানে বাতাস মধুর, যেখানে সমুদ্র মধুময়, যেখানে বনস্পতি-ওষধি-দিবারাত্রি-সূর্য সমস্তই মধুময়। শুধু কলকাতা শহর আর বাংলা দেশের একটা গ্রাম দেখেই তিনি কেন ভাবছেন যে সেই স্বর্গরাজ্যটা স্বপ্ন, মায়া,

মতিভ্রম? সে দেশ নিশ্চয় আছে কোথাও না কোথাও। ওঁরা ঠিকমত খুঁজে বার করতে পারছেন না। কিন্তু খুঁজে যে বার করতেই হবে।

—চল বাবা, কাল সকালেই আমরা চলে যাই। আতংকতাড়িত খুকু বলে বসল।

—তাই যাব। সমস্ত তালাবন্ধ করে যাব। ঠিক যেমন সেবার কলকাতা ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিলাম। শুধু প্রস্থানের পূর্বে মঙ্গলাকে পৌঁছে দিয়ে যাব ডাক্তারের বাড়ি।

—সেই ভাল বাবা। শান্তি মাসীর বাচ্চাটা একটু দুধ পাবে।

—এবার তাহলে ঘুমিয়ে পড়, মা।

খুকু চোখ বোঁজে। এবার আর খুকু ঘুমপাড়ানি গানের কথা বলে না। এবারেও কিন্তু জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখছিল সেই উজ্জ্বল তারাটা।

পরদিন সকালে দেখা গেল, বাপ-বেটি পোঁটলা কাঁধে নিয়ে রেল-লাইনের ধারে ধারে ডিস্ট্যান্ট সিগনালের পাশ দিয়ে কোথায় যেন হেঁটে চলেছে।

দুপাশে বাবলা আর ফণি-মনসার ঝোপ। পায়ের নিচে উবুড়োখাবড়া রেল-পাথরে বারে বারে চোট লাগছে। তবু চলেছে ওরা।

পূর্বদিগন্তে সূর্য উঠছে।